মঙ্গলকাব্যে লোক জীবন
ও
লোক ধর্মভাবনা

অমিতাভ গোস্বামী

সোপান পাবলিশার
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
২০০০

প্রকাশক
সোপান পাবলিশার
বি/৪১ গোষ্ঠতলা, নিউ স্কীম, গড়িয়া
কলকাতা ৭০০ ০৮৪

মুদ্রক
সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯/সি শিবনারায়ন দাস লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

আমার 'মা' — 'বাবা'

ও

স্বর্গীয় মিহিরেশ কুমার ভট্টাচার্য্যের নামে

প্রাক্কথন

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে ভিত্তি করে যেমন প্রচুর সাহিত্য রচিত হয়েছে, তেমনি সে সব সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে অনেক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। মধ্যযুগের বিশাল সময় সীমার মধ্যে রচিত সমস্ত সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করা দূরহ। তবে লক্ষণীয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয় অবলম্বনে অনেক চিন্তাচর্চা হয়েছে, এবং তার ফসলও আমরা পেয়েছি। তবু মধ্যযুগ আজও যেন আমাদেরকে নতুন করে ভাবায়। আর এই ভাবনার তাগিদে মধ্যযুগকে জানার আগ্রহ থেকেই এই গবেষণার চিন্তা ভাবনা।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. বেলা দাস আমাকে বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করেছেন। শুধু তাই নয়, উনার ব্যস্ততার মধ্যেও উনি আমার গবেষণার নির্দেশনার দায়িত্বও নেন। 'মঙ্গল কাব্যের লোকজীবন ও লোকধর্মভাবনা' নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত দূরহ, কারণ মধ্যযুগের বিশাল সময় সীমা জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টির ইতিহাস। তাই গবেষণার কাজের সুবিধার জন্য আমরা মূলত মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্যের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। মঙ্গলকাব্যের লোকজীবন ও লোকধর্মভাবনা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মধ্যযুগের লোকমানুষের মনের ভিতরে প্রবেশ করার সুযোগ যেমন হয়েছে তেমনি মঙ্গল কাব্যে তার প্রতিফলন কিভাবে হয়েছে তা জানার অভিজ্ঞতাও হয়েছে। তাই এই গবেষণা সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে মধ্যযুগের লোকমানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসবাদির প্রতিফলন কিভাবে হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমার এই গবেষণার কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ আমার শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া বেলা দাসের কাছে যিনি এই গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধায়িকাও। ম্যাডাম শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রয়োজনে আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন, মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন আর সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা অনুষদের অধ্যক্ষা শ্রদ্ধেয়া স্বপ্নাদেবীর কাছে। যিনি সবসময় আমাকে মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুবীরকর মহাশয় গবেষণা চলাকালিন সময়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, শিলচর রাধামাধব কলেজের গ্রন্থাগার থেকে বই সংগ্রহ করেছি, তাই এই প্রতিষ্ঠান গুলোর গ্রন্থাগারিকদের কাছেও আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার বাবা-মা যাদের সহানুভূতি-অনুপ্রেরণা ও শুভার্শীবাদ ছাড়া

এই কাজ কখনই সম্পন্ন হত না, তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম।আমি চিরকৃতজ্ঞ শ্রী মিহিরেশ কুমার ভট্টাচার্য্য (বর্তমানে প্রযাত) ও শ্রীযুক্তা ভারতী ভট্টাচার্য্যের কাজে। যারা নিদৃষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয় তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট বই পত্রও পেয়েছি। আমার স্ত্রী দেবশ্রী ও দুইকন্যা দেবস্মিতা ও পূর্বিতার সমমর্মিতা ছাড়া দীর্ঘদিন গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাকা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হত না। তাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাকে গবেষণার কাজে অগ্রসর হতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। আমার, অনুজ শ্রী জয়দ্বীপ গোস্বামী প্রুফ দেখতে আমাকে সাহায্য করেছে তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমি কৃতজ্ঞ সোপান পাবলিশারের কর্ণধার শ্রী জয়জীৎ মুখার্জীর কাছে, যিনি বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন তা ছাড়া প্রকাশনার কাজে অন্যযারা জড়িত আছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

সতর্কতা সত্ত্বেও বইটি প্রকাশনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকলে পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

অমিতাভ গোস্বামী

—সূচীপত্র—

ভূমিকা

মঙ্গলকাব্য হল মঙ্গল সূচক কাব্য। যা মঙ্গল সূচিত করে, বা কল্যাণ দান করে। মঙ্গল শব্দের আভিধানিক অর্থ হল কল্যাণ। তাই বলা যায় যে কাব্য পাঠ করলে বা পাঠ শুনলে সবধরণের অমঙ্গল দূর হয় তা ই মঙ্গল কাব্য।

এই ধরণের নামকরণের অবশ্য একটা তাৎপর্য রয়েছে, বলা বাহুল্য তা ঐতিহাসিক তাৎপর্য। তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো, তাই মঙ্গল কবিরা এই বিপর্যঃ থেকে মুক্তি লাভ কল্পে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য লিখতে লাগলেন। প্রচলিত ধারণা ছিল যে এই আরাধ্য বা আরাধ্যা দেব-দেবীর পূজা করলে বা তাঁদের মহিমা বর্ণিত কাব্য পাঠ করলে মঙ্গল হয় । জনশ্রুতি ছিল যে, এই কাব্য পাঠ শুনলে কিংবা গান করলেও মঙ্গল হয। এমন কি বিশ্বাস করা হত যে এই ধরণের গ্রন্থ ঘরে রাখলেও লোকের কল্যাণ সাধন হয়। আর যদি তা না করা হয় তাহলে গৃহস্থের অমঙ্গল হতে পারে। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> '' খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম-বিষয়ক আখ্যান কাব্য প্রচলিত ছিল তাহাই বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত।''১

তাই মঙ্গল কাব্য মূলত বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। এখানে উল্লেখ্য যে এই লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যই এই আলোচনার অর্ন্তভুক্ত।

বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলো মূলত রচিত হয়েছিলো খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। মঙ্গলকাব্য গুলো নিঃসন্দেহে ধর্ম বিষয়ক আখ্যান কাব্য। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এগুলো রচিত হয়েছিল, কিন্তু কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস থেকে এগুলো রচিত হয়নি। বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েই বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্য গুলি তারই পরিচয় বহন করে। তাই বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার, প্রথা-পদ্ধতি ও ধর্ম বিশ্বাসের উপরই মঙ্গলকাব্যের প্রতিষ্ঠা। মঙ্গলকাব্যের উৎস মূলত অনুমানের উপর নির্ভর করেই নির্দেশ করা হয়েছে। তবে কারো কারো ধারণা আর্যরা এদেশে আসার আগেই এখানকার আদি জনগণ তাদের নিজস্ব চিন্তা চেতনা দিয়ে তাদের আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বিভিন্ন

উপাদানের পরিকল্পনা করতে পেরেছিল, সুতরাং সেই সময় দেবদেবীর পরিকল্পনাও করে নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। মনে করা হয় পরবর্তি সময়ে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে অনার্য লোকসমাজের এসব আদিম দেব পরিকল্পনা ও ধর্ম বিশ্বাস ভাবে ও রূপে বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু মূল কাঠামোটি পরিবর্তিত হয়নি। ক্রমে সকল দেবদেবীর মহিমা গাথা পাঁচালি এবং মুখে মুখে প্রচলিত গাল গল্প থেকেই মঙ্গলকাব্যের বিকাশ লাভ ঘটেছে। এবার মঙ্গলকাব্য গুলো রচনার পেছনে যে সামাজিক তাগিদটা ছিলো সেদিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। আমরা জানি বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো এবং এই দুটি ধর্মই বৈদিক আর্যাচার ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কারের বিরোধী ছিলো। তাই এদের সাথে অনায়াসেই এদেশের অনার্য বাঙালি সমাজের আত্মার সংযোগ সাধিত হয়েছিলো। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের লোকমুখীনতা তাদের মনকে স্পর্শ করেছিলো। ফলে লৌকিক ধর্মাচরণে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। অপরদিকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আর্বিভাব হয়েছিলো বৈদিক আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির বাহক হয়ে। বৌদ্ধ ধর্ম যেখানে ছিল লোকমুখী, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেখানে তার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ লোকবিমুখ। তাই সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করতে পারে নি, তবে মাত্র রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের অভিজাত বর্গের মধ্যে এই ধর্ম সক্রিয় ছিল।

বাংলাদেশে ঠিক এরকম পরিস্থিতিতেই তুর্কি আক্রমণ সংঘটিত হয়, ফলে পরাজয় হয় রাজ শক্তির, তুর্কিদের পর ক্রমান্বয়ে শাসন ক্ষমতা চলে যায় হুসেন শাহী-ইলিয়াস শাহী-হাবসী-শূরী-কররানী বংশ হয়ে মোঘলদের হাতে। ফলে রাষ্ট্রিক পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সবকিছুতেই পরিবর্তন সাধন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় সমাজের সার্বিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষাকল্পে বাঙালি সমাজের উচ্চনীচ নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, কিন্তু বাঙালি সেদিন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছিল। তাই তাদের দ্বারস্থ হতে হলো দৈবী শক্তির। পরিস্থিতির শিকার হয়েই সেদিন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তথাকথিত কর্ণধাররা বুঝতে পারলেন যে সমাজের সেইসব লোকদের, যাদের এতদিন তারা দূরে সরিয়ে রেখে ছিলেন, সেই অনার্য বাঙালিদের কাছে না টানলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। তাই তাদের সংস্কার, বিশ্বাস এমন কি দেবদেবীকে পর্যন্ত আর্য আভিজাত্য দান করলেন। এভাবেই আর্য-অনার্যের মেলবন্ধন হল, ধনপতি যেমন চণ্ডীর পাশে দেখলেন শিবকে, ঠিক তেমনিভাবে শিবের কন্যা রূপে মনসাকে দেখলেন চাঁদ সদাগর। মঙ্গলকাব্য গুলো এই মেলবন্ধনেরই প্রাথমিক ফল।

বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলো যে সামাজিক পটভূমিতে রচিত হয়েছে সেদিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক পাল রাজারা ইতিমধ্যেই ক্ষমতা চ্যুত, কর্ণাটক থেকে আগত সামন্ত সেন পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একাদশ শতকের শেষের দিকে রাঢ় অধিকার করেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত বাজত্ব কবেন। তাঁব বাজত্ব কালে তিনি জয কবেন গৌড, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কামৰূপ প্রভৃতি বাজ্য। হেমন্ত সেনেব পুত্র বল্লাল সেন ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাজ্য পবিচালনা কবেন। বল্লাল সেন নিজেব বাজত্ব কালে মগধ ও মিথিলা জয কবেন। এব থেকে বোঝা যায সেই সমযকাব বাংলা গৌড-বঙ্গ-কলিঙ্গ-কামৰূপ-মগধ ও মিথিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্যেব অধিকাবী সেন বাজাবা বৈদিক-আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতিব বাহক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই সমাজে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেবই প্রাধান্য ছিল বেশি। একদিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এবং অন্যদিকে বাংলাদেশেব আদি নিবাসী অনার্য বাঙালি ও তাব সাথে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, এই সকল ধর্মেব পাবস্পবিক বিবোধে বাংলাদেশেব সামাজিক ও বাষ্ট্রিক অবস্থা তখন খুবই অস্থিব ছিল। বাজন্য বর্গেব পৃষ্ঠপোষকতায হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কখনও সমাজেব নিম্ন শ্রেণীব লোকদেব কাছে টানাব চেষ্টা কবেনি, ফলে নিম্নবর্ণেব লোকেবাও বাজ শক্তিকে সুনজবে দেখেনি। বল্লাল সেনেব পব প্রৌঢ বযসে লক্ষ্মণ সেন যখন বাজসিংহাসনে আবোহন কবেন, তখন থেকেই সেন বংশ ক্রমশ দুর্বল হতে শুৰু কবে। আব ঠিক এই সুযোগটাকেই কাজে লাগিযে যুদ্ধ প্রিয তৰুণ তুর্কি নেতা মহম্মদ-বিন-বখতিযাব খিলজী বাংলা আক্রমণ কবেন। বলা যায প্রায বিনা বাঁধায তুর্কিবা বাংলা জয কবে। সমাজেব নীচু স্তবেব মানুষ, যাবা সংখ্যা গবিষ্ঠ তাবা সেদিন বাজশক্তিব সাহায্যে এগিযে আসেনি। শুধু মাত্র ঐক্যেব অভাবে বাঙালি সেদিন আক্রমণকাবীব বিৰুদ্ধে কোনৰূপ প্রতিবোধ গডে তুলেতে পাবেনি। বখতিযাব খিলজী ও তাব প্রধান সহযোগী আলিমর্দান বাংলা জয কবে প্রথমেই আঘাত হানে ধর্মেব উপব। হিন্দু ও বৌদ্ধদেব দেব-দেবী, মন্দিব-বৌদ্ধবিহাব, শাস্ত্র-শিল্পকলা সবকিছু ধ্বংস কবতে প্রযাসী হয। তাব সাথে সমান্তবালভাবে চলে জোব কবে ধর্মান্তবিতকবন।

বাজশক্তিব পবিবর্তন তাব আগেও বাংলা দেশে বহুবাব হযেছে। সেন বাজাবা ক্ষমতা দখল কবেন পাল বাজাদেব কাছ থেকে। আবাব পাল বাজাবা ক্ষমতা লাভ কবেন হিন্দু বর্মণ বাজাদেব পবাজিত কবে। বাজশক্তিব এই পালাবদলে সাধাবণ বাঙালিব জীবনে সেদিন খুব একটা পবিবর্তন ঘটেনি, কাবণ বাজাবা যে ধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন না কেন সাধাবণ বাঙালিব আচাব অনুষ্ঠানেব প্রতি তাদেব সমান আনুগত্য ছিল। সুদীর্ঘকাল ধবে চলে আসা প্রাচীন ঐতিহ্যেব প্রতি তাদেব গভীব মর্যাদাবোধও ছিল। তাই বর্মণ কিংবা পাল ও সেন বাজাবা কেউই বাঙালিব চিবাচবিত জীবন যাত্রা পদ্ধতিব ওপবে কোন বাধা বা বিধিনিষেধ আবোপ কবেন নি, ববং পৃষ্ঠপোষকতা কবেছেন। কিন্তু তুর্কিবা তা কবেনি, কাবণ ধর্মেব দিক থেকে তাবা বিধর্মী ছিল, শুধু তাই নয তুর্কিবা বিদেশীও বটে। তাই বংশ পবম্পবায চলে আসা বাঙালিব কৃষ্টিব প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন তাদেব পক্ষে অসম্ভব ছিল। আক্রমণেব প্রতিটি পদক্ষেপেই তাই লুণ্ঠন ও নির্যাতন নিশ্চিত হযে উঠেছিল। আগ্রাসী মনোভাবেব প্রকাশ চিবকালই নিষ্ঠুব ও বীভৎস, ইতিহাসই তার সাক্ষী। সুতবাং এ ক্ষেত্রেও তাব কোন ব্যতিক্রম

ঘটেনি। অর্থ-মান-প্রাণ-ধর্ম-আচার-নিষ্ঠা সবকিছুর উপর যখন নির্মম আঘাত এসে পড়ল, দিশেহারা বাঙালি সেদিন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। বখতিযার খিলজী অবশ্য পরবর্তি সময়ে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়ে হত্যাযজ্ঞ বাদ দিয়ে নতুন ভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ, পাঠশালার বদলে মাদ্রাসা নির্মাণের দিকেই তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন। ফলে প্রাণের ভয় তখন অনেকটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে ওঠার আগেই নিজের সহচর আততায়ীর হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। তার পর নতুন শাসকের হাতে ক্ষমতা যাবার পর সমাজ ব্যবস্থা পুনরায় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। হত্যা ও প্রতি হত্যার পাপচক্র পুনঃপুন আবর্তিত হতে থাকে । ধন-মান-প্রাণ ও জাতি নাশের ভয়ে অনেক বাঙালি সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর প্রান্তের দুর্গম ভূমিতে। তুর্কিদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বৃদ্ধ রাজা লক্ষণসেনও পদ্মার ওপর পারে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজ্যাধিকারের পর বাংলাদেশে পুনরায় সুস্থ জীবনযাত্রা ফিরে আসতে শুরু করে।

বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে হুসেন শাহের সিংহাসন আরোহন (১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিনশো বছরের অধিক সময় সীমায় তিন জন রাজা দক্ষ শাসন কার্য পরিচালনার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তাঁরা হলেন ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামসুদ্দিন ইলিযাস শাহ (১৩৪২ খ্রীঃ - ১৩৫৮ খ্রীঃ)। তার পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৭ খ্রীঃ - ১৩৮৯ খ্রী) এবং ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হওয়া তীক্ষ্ণধী হিন্দু শাসক রাজা গণেশ। রাজা গণেশের পর তার পুত্র যদু হিন্দু ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দিন নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহন করেন। এই নব্য ইসলামধর্মী যদু সিংহাসনে আরোহন করেই হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেন। হিন্দুদের ধরে ধরে হয় হত্যা করা আর তা না হলে জোর করে তাদের ধর্মান্তরিত করণের কাজ শুরু করেন। ফলে পুনরায় বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীক বিপর্যয় শুরু হয়। রাষ্ট্রের এমনই সংকটের মুহূর্তে বাংলার শাসন ক্ষমতায় পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের আগমন ঘটে। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইলিয়াস শাহী বংশের রাজারা বাংলা শাসন করেন। এই সময়ই বাংলা শাসক হিসেবে পেয়েছে সেই মানুষকে যিনি একাধারে শাসক ও সাহিত্য প্রেমী। তিনি অবশ্যই রুকনুদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৬ খ্রীঃ - ১৪৭৪ খ্রীঃ)। কিন্তু তারপরই হাবসী শাসনে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে রাজা থেকে সামান্য কর্মচারীকে লড়তে দেখেছে বাংলা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঃ

> ''মধ্যযুগে বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস যুদ্ধের হুংকার, দস্যুতার দাপট আর ক্রূরতার নিঃশঙ্ক অভিপ্রকাশে চিহ্নিত।''[২]

হাবসীদের দুঃস্বপ্নের ছয়টি বছর শাসনের পর বাংলা শাসক হিসেবে পেয়েছে হুসেন শাহকে। প্রজানুরঞ্জক রাজা হিসেবে যাকে একমাত্র আকবরের সাথে তুলনা করা হয়। কিন্তু

তবুও তাব সময়েও হিন্দুদেব উপব অত্যাচাব বন্ধ হয়নি। প্রত্যক্ষ ভাবে হয়ত কবেন নি, কিন্তু পবোক্ষভাবে হুসেন শাহ্ হিন্দুদেব উপব অত্যাচাব কবেছেন। ধ্বংস কবেছেন মঠ মন্দিব, নষ্ট কবেছেন হিন্দুদেব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য। তাব প্রমাণ পাওয়া যায় সেই সময়কাব বিভিন্ন গ্রন্থে। বিদ্যাপতি তাঁব 'কীর্তিলতায়' এভাবে এব বিববণ দিয়েছেন ঃ

''ধোআ উড়িধানে মদিবা সাঁধ,
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।।''[৩]

এই মন্দিব ভেঙে মসজিদ গড়াব কথা বৃন্দাবন দাসও লিখেছেন ঃ

''যে হুসেন শাহ্ সর্ব উড়িষ্যাব দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে।''[৪]

তাছাড়া হুসেন শাহেব বাজত্বকালে সমাজ জীবনে যে পুবো শান্তি সংহতি বজায় ছিল তা বলা যায় না। কাবণ বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে, চৈতন্য দেব নৌকায় নীলাচল যাওয়াব পথে সংকীর্তন শুরু কবলে মাঝি ভীত হয়ে বলেছে ঃ

''বুঝিলাঙ আজি আব প্রাণ নাহি বয়।।
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীবেই খায়।
নিবন্তব এ পাণীতে ডাকাইত ফিবে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ কবে।।''[৫]

বাষ্ট্রীয় জীবনেব এই ঘুর্ণিপাক ও উঠানামাব পাশাপাশি সমাজ জীবনে আবও একটা বিবোধ চলছিল তা হলো ধর্মভিত্তিক বিবোধ। শুধু মুসলমান শাসকবাই যে হিন্দু পীড়ন কবেছে তা কিন্তু সত্য নয়। গণেশেব মতো বাজাও পাঠানদেব পবাজিত কবে স্বল্পকালেব বাজত্বে মুসলমানদেব উপব অত্যাচাব কবেন। এই ঘাত প্রতিঘাতেব চিত্র সমকালীন সাহিত্যে খুব সুন্দবভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জয়ানন্দেব কাব্যে তাই দেখি ঃ

''পিবল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন কবিল নবদ্বীপেব ব্রাহ্মণ।।
বিষম পিবল্যা গ্রাম নবদ্বীপেব কাছে।
ব্রাহ্মণ যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।।''[৬]

বৃন্দাবন দাসেব 'চৈতন্য ভাগবৎ' গ্রন্থে আমবা দেখি যে চৈতন্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যবন হবিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ কবলে অন্যান্য মুসলমানবা তাঁকে ধবে মুল্লুক পতিব কাছে নিয়ে গেলে মুল্লুক পতি তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম পবিত্যাগ কবে হিন্দু আচাব-আচবণ ছেড়ে দেওয়াব অনুবোধ জানান ঃ

"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হইয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুব আচাবে দেহ মন।।
আমবা হিন্দুবে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড হই মহাবংশ জাত
জাতি ধর্ম লঙ্ঘি কব অন্য ব্যবহাব।।
পবলোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তাব।।"[৭]

কবি বিজয গুপ্তেব 'মনসামঙ্গল' কাহিনিব হাসান হুসেন পালায দেখি হোসেন হাটি গ্রামেব কাছে হাসান হুসেন নামে দুই ভাই ছিল। পেশায তাবা কাজী, কাব্যে দেখি ঃ

"কাজিযানী কবে তাবা, জানে বিপবীত।
তাদেব সম্মুখে নাই হিন্দুযানী বীত।।"[৮]

তাদেব এক দুষ্ট শ্যালক ছিল। কাজী যেহেতু বিচাব বিভাগেব দাযিত্বে ছিল, তাই সে যখন তখন হিন্দুদেব উপব অত্যাচাব কবত, কাব্যে পাই ঃ

"যাহাব মাথায দেখে তুলসীব পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয কাজীব সামাতঁ।।
পবেব মাবিতে কিবা পবেব লাগে ব্যথা।
চোপড চাপড মাবে দেয ঘাড কাতা।।
যে যে ব্রাহ্মণেব পৈতা দেখে তাব কান্ধে।
পেযাদা বেটা লাগ পাইলে তাব গলায বান্ধে।"[৯]

তাছাডা এই কাব্যে দেখি যে বাখালবা যখন মনসা পূজাব প্রস্তুতি নেয ঠিক তখনই কাজীব অনুচব গিযে সমস্ত আযোজন নষ্ট কবে দেয, আব বাখালবা এব জবাব দিতে গেলে কাজীব শাসন দণ্ডে কঠোবভাবে দণ্ডিত হয। এই ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান কবে নেযা যায যে সমাজে হিন্দুবা তখন ততটা সুবক্ষিত ছিল না। যদিও মনসামঙ্গল কাহিনিব অগ্রগতিতে দেখি যে মনসাব ক্রোধেব সামনে হাসান-হুসেনবা নতি স্বীকাব কবেছে, অবশেষে তাঁব পূজা কবেছে। নাগদেব দংশনে একে একে তাদেব লোক মবতে শুরু কবলে তাবা মনসাব শবণ নিযেছে ঃ

"জীযাইযা দেহ দেবী কৃপাবলোকনে।
এই দেশে তোমাকে পূজিব জনে জনে।"[১০]

কিন্তু তা কতটা বাস্তব সম্মত সে বিষযে সংশয থেকেই যায। হযত বাস্তবে যা প্রায অসম্ভব, তাই কল্পনাব মধ্য দিযে কবি নিজস্ব চিন্তাব প্রতিফলন ঘটিযেছেন।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও দেখি যে মামুদ সবীপ নামে এক ডিহিদাবেব অত্যাচাবে দামিন্যা ছাডতে হযেছিল কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীকে। কবি নিজের বাস্তব জীবনে যে অভিজ্ঞতা

অর্জন করেছেন তা-ই তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। অরাজকতা, নিরাপত্তাহীনতা, অপরিজ্ঞাত নিয়মনীতি সমকালীন সব কিছুই কবি কালকেতুর রাজ্য শাসনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কালকেতুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে স্ত্রী বাঘ পশুরাজ সিংহকে বলেঃ

"শুন শুন রায় মাঙ্গিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকাবী না শুনে গোহারি
বিপাকে তেজি জীবন।
রানীগন সঙ্গে থাক লীলা রঙ্গে
না কর দোষ বিচার।"[১১]

এখানে তার অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সেই সমাজে বিচরণশীল মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে সংযুক্ত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া চৈতন্য জীবনী গ্রন্থেও দেখি যে নবদ্বীপের কাজীর দ্বারা চৈতন্য দেবের পার্ষদদের কীর্তন বন্ধের আদেশ ও মৃদঙ্গ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ভাঙার মাধ্যমেও মুসলমানদের হিন্দু বিরোধিতারই পরিচয় বহন করে।

"যাহারে পাইল কাজী, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।
কাজী বলে হিন্দুযানি হইল নদীযা।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।"[১২]

এথেকে একথা স্পষ্ট যে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের রাজত্ব কালেও হিন্দু বাঙালিরা শান্তিতে ছিল না। সুতরাং একথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে তুর্কি বিজয়ের পরবর্তি বাংলার ইতিহাস নিতান্তই উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার ইতিহাস। তুর্কি আক্রমণ বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে শূণ্যতা নিয়ে এসে ছিল, সমালোচক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় ঃ

"এভাবেই বাঙালি জাতি আত্মবিলুপ্ত হতে থাকে। সমাজ ও সাহিত্যে দেখা যায় উষর-মরু-বন্ধ্যাত্ব। লম্পট ও উশৃঙ্খল জনকের ঘরে পুত্রের মানস বিকাশ যেমন হয় ব্যাহত তেমনটি ঘটল তুর্কি আক্রমণের পরে। মধ্যযুগের ইউরোপের 'The dark age' এর থেকে তুর্কি শাসনের নৃশংসতা ও বিশৃঙ্খলার এই দিনগুলিকে 'শতগুণে নঙর্থক, ভয়াবহ ও মানবধর্ম বর্জিত' বলে মনে হয়।"[১৩]

একটি কথা ভূলে গেলে চলবে না যে তুর্কি হোক কিংবা ইলিয়াস শাহী, হুসেন শাহী বা হাবসী, মোঘল এরা যারাই এই বাংলা শাসন করেছেন তারা প্রত্যেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। পাঁচশ বছরের তাদের শাসন কালে হিন্দুরা যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। শাসন ক্ষমতার পালা বদলের সাথে সাথে অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি

সবকিছুতেই পবিবর্তন শুরু হয়ে যায়। সমাজেব নিম্নবর্গেব মানুষ যাদেবকে উচ্চবর্ণেব লোকেবা কোন দিন কাছে টেনে নেয়নি, তাবা ইসলাম ধর্মেব দিকে ঝুঁকতে শুরু কবে। ইসলাম ধর্মেব প্রগতিশীলতা তাদেবকে এই ধর্মেব প্রতি আকৃষ্ট কবেছিল। অববিন্দ পোদ্দাবেব ভাষায় ঃ

> ''হিন্দু সামাজিক সংস্থাব নির্মম বিধানে যাবা নির্যাতিত হচ্ছিল বর্ণ সমাজেব অন্তর্গত নিম্নবর্গ গুলি এবং বর্ণ সমাজেব বাইবেব অস্পৃশ্য জাতিগুলি - তাবা ঐস্লামিক সমাজ সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ কবে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ কবেছে। হিন্দু সমাজেব বিধান দাতাদেব নিকট যাবা ছিল শুদ্র ও অস্পৃশ্য পর্য্যাযেব, ইসলাম তাদেব দিল মুক্ত মানুষেব অধিকাব, এবং শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণেব উপবেও প্রভুত্ব কবাব ক্ষমতা সামাজিক চিন্তা ধাবাব এই উদাবতা এবং সমানাধিকাবেব আদর্শই ভাবতেব সমাজেতিহাসে ইসলামেব সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।''[১৪]

তাছাড়া বল্লাল সেন প্রবর্তিত জাতি ভেদ প্রথায় বাজাব ইচ্ছানুসাবে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বেব ছাড়পত্র পাওযা যেত অনাযাসে। পূর্বে ব্রাহ্মণেবা শুদ্রেব দেওযা খাদ্য-পানীয কোনভাবেই গ্রহণ কবতেন না। ব্রাহ্মণদেব স্থান ছিল সমাজেব একেবাবে শীর্ষে। পাণ্ডিত্য, চাবিত্রিক ঔদার্য্য ও আডম্ববহীন জীবন তাঁদেব শ্রেষ্ঠত্ব বিচাবেব মাপকাঠি হলেও কখনো কখনো তাবা চাষাবাদও কবতেন আবাব একই সাথে সমানভাবে বাজকার্যে অংশ গ্রহণ এবং জ্যোতিষ চর্চাও কবতেন। সেই ব্রাহ্মণবাই বক্ষণশীল বাঙালি সমাজেব বৃহত্তব অংশ যাবা, সেই নিম্নবর্ণেব মানুষদেব কুসংস্কাবেব অন্ধকাব গর্ভে ফেলে দেয। মধ্যযুগেব বর্ণহিন্দু সমাজ সনাতন আদর্শে এতই বিভোব ছিলেন যে তাবা বুঝতেই চান নি শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চাব চেযে অনেক বড প্রাণধর্ম ও প্রেম ধর্মেব আদর্শ। তাই সেই সময সমাজেব সার্বিক অবক্ষযেব হাত থেকে বক্ষা কল্পে বাঙালি সমাজেব উচ্চনীচ নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ হওযাব প্রযোজনীযতা দেখা দেয। পবিস্থিতিব শিকাব হযেই সেদিন ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব তথাকথিত কর্ণধাববা বুঝতে পাবলেন যে যাদেব এতদিন তাবা দূবে সবিযে বেখেছিলেন তাদেব কাছে না টানলে আত্মবক্ষা কবা অসম্ভব। ফলে তাদেব সংস্কাব, বিশ্বাস এমনকি দেবদেবীকে পর্যন্ত আর্য আভিজাত্য দান কবা হল। এভাবেই আর্য-অনার্যেব মেল বন্ধন হল। ফলে লোকাযত ধর্ম-বিশ্বাস থেকে উঠে আসা মনসা-চণ্ডী-শিব-ধর্ম প্রমুখ দেবদেবীবা প্রতিষ্ঠা পেলেন। লেখা হলো আখ্যানধর্মী একাধিক মঙ্গলকাব্য। এই প্রতিবোধেব প্রচেষ্টাব ফলেই সমাজে এক বিবাট পবিবর্তন সাধিত হতে শুরু কবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঃ

> ''যবন সংস্পর্শ দোষে যাদেব জাত গিযেছিলো তাদেবকে প্রাযশ্চিত্য কবিযে পুনবায হিন্দু সমাজে স্থান দেওযাব প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজপতিদেব মধ্যে আত্মপ্রকাশ

> করে। মুসলিম অভিযান যে হিন্দু সমাজের উপর প্রবল আক্রমণের সূত্রপাত করেছে, এ চেতনায় তারা ক্রমশই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নানা প্রকার মেল বন্ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে পুনরায় স্থিতিস্থাপকতা আনয়নের চেষ্টা করেন।''[১৫]

শুধু তাই নয় সমাজে এতদিন যারা অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত ছিল তাদেরকেও কাছে টানার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল।

মধ্যযুগের সময়সীমা অনেক বড়। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন বংশের রাজারা রাজত্ব করেছেন এই বাংলায়। বলতে কোন দ্বিধা নেই যে এদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী। সেই বিদেশীরা এদেশে এলেন, রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করলেন। সেই সকল রাজশক্তির সাথে সাথে অনেক সেদেশীয় লোকরাও এসেছিল এদেশে। তারা সবাই কিন্তু উচ্চপদে আসীন ছিলেন না, সাধারণ লোকও ছিল। ধীরে ধীরে তারা সবাই এদেশে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বি লোকরা পাশাপাশি বাস করত। এরার তার সাথে যুক্ত হল ইসলাম ধর্ম। রাজশক্তির উত্থান-পতন অনেক হয়েছে। কিন্তু সেই সকল সাধারণ মানুষের অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ক্রমে হিন্দু মুসলিম-বৌদ্ধ-জৈন নির্বিশেষে সকলেই পাশাপাশি বাস করতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমাজ' *গ্রন্থের 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে লিখেছেনযে* হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়ে মুসলমানরা এদেশে প্রবেশ করে, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরুষানুক্রমে এদেশের মাটিকে আপন করে নিয়েছে।

মধ্যযুগের প্রথমভাগে মুসলমানদের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের যে সম্পর্ক ছিল, সময়ের অগ্রগতিতে তা ই আরো সুন্দর ও আত্মিক হতে শুরু করে। এই যুগেরই মধ্য ও শেষ ভাগে তা আরো বেশি গভীর রূপ ধারণ করে, সমকালীন সাহিত্যিক নিদর্শন থেকেই তা উপলব্ধি করা যায়। সে সময়ে রচিত কিছু সাহিত্য থেকে উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখি যে হাসান-হুসেনরা দেবী মনসার বিরোধিতা করায় দেবী তাদের শাস্তি দিয়েছেন, নিরুপায় হাসান-হুসেন অবশেষে দেবীমনসার পূজো করতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয় মনসার পূজা প্রচারেও উদ্যোগী হয়। কাব্যে পাই যে হাসান-হুসেন তাদের পাত্র-মিত্র, প্রজা সাধারণ সবাইকে ডেকে বলেনঃ

> ''প্রচারিত রাজ্য রাজ্য   মনসার পূজা কার্য
> বিধান করহ মহাশয়।''[১৬]

এরপর হাসান-হুসেনের রাজ্যে হিন্দু-মুসলমান কোন বিবাদ ছিলনা, সেই সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"ছত্রিশ আশ্রমে লোক
নাহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর।
বৈসে যত দ্বিজগন
সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজময় যেন দিবাকর।।

অভিনব সুরপরি
দেখি ঘর সারি সারি
প্রতিঘরে কনকের ঝারা ।"[১৭]

(হিন্দু সমাজ প্রসঙ্গে)

আবার মুসলিম সমাজ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"নিবসে যবন জত তাহা বা বলিব কত
মঙ্গল পাঠান মোকাদীম ।
ছৈয়দ মোল্লা কাজী কেতবা কোরাণ বাজি
দুই ভক্ত তছলিম ।।
মাসিদ মোকাম ঘরে ছেলাম নামাজ করে
ফয়তা করয়ে পিত্য লোকে ।
বন্দিয়া মনসা দেবী দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
উদ্ধারিয়া ভকত সেবকে ।" [১৮]

বীরভূমের কবি বিষ্ণুপাল আরো সুন্দর ও আন্তরিকতার সাথে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচনায় হাসান-হুসেনকে তিনি শিবের পুত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর কাব্যে পাইঃ

"রতির আজ্ঞায় দোহে ঘামে টলবল।
চখতা চাখই পক্ষ কেড়্যা খায় সব।।
আধখানা চন্দ্র প্রভুর ভূমিতে পড়িল।
হাসান-হোসেন দুই ভাই তাহাতে জন্মিল।।"[১৯]

এখানে আন্তরিকতা ভালোবাসার চেয়ে রাজ তুষ্টিই প্রাধন লক্ষ্য বলে মনে হয়। কবি বিষ্ণু পালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যেই সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

''ফিবে মাদাই আউবি আউবি।

হিন্দু মুসলমান চিনিবাবে নাবি

ভাই সবাব হাতে ছুবি কাটাবি,

দাৰুণ কুখুবাব বোল বিষম বাজিতেছে ঢোল

হা আই ছাড়িছে ঘনে ঘন।

কালুতুবকা মুছলমান মাগ্যেব পাতে ভাত খান

সোখনিতে না দেয গোময।''[২০]

শুধু মনসামঙ্গল নয চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতিব বিববণ অনেক আছে। মুসলমানদেব সম্পর্কে কবি মুকুন্দ যে বর্ণনা দিযেছেন, সেই বিষযে আলোচনা কবতে গিযে ড ক্ষুধিবাম দাস বলেছেন ঃ

''কবি কঙ্কন মুসলমানদেব বর্ণনা ও নগব পত্তনেব বর্ণনা প্রথমেই দিযেছেন, বিস্তৃতিব সঙ্গে দিযেছেন, তাঁদেব ধার্মিকতাব পবিচযে শ্রদ্ধা ও বাস্তব আনুগত্য দুইই বক্ষা কবেছেন। এব মূলে বাজনৈতিক কাবণ অল্পস্বল্প থাকলে তা বাস্তব বিবোধী হযনি। কবি কঙ্কন ব্রাহ্মণ এবং বিদগ্ধ হযেও নিম্নবর্ণ ও মুসলমানদেব পবিচয যে বকম অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতিব সঙ্গে গ্রথিত কবেছেন তাঁতে তাঁব প্রশংসায আমাদেব লেখনী উদ্ভাসিত হযে পড়ে। তখনকাব সমাজ নির্দিষ্টভাবে বিভেদমূলক হলেও কার্যক্ষেত্রে শান্তি, সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন জাতেব মধ্যে যেমন, তেমনি হিন্দু-মুসলমান ব্যক্তিগত কলহ কদাচিৎ ঘটলেও সাম্প্রদাযিক মাবদাঙ্গা প্রভৃতিব কোন পবিচয মধ্যযুগে পাওযা যায না। সম্প্রদাযগত কলহ আজ কালকাব ব্যাপাব, বাজনৈতিক স্বপ্ন এব মূলে। সামন্ততান্ত্রিক পবিস্থিতিতে বাজনৈতিক অধিকাবেব কোন প্রশ্নই যেহেতু ছিল না, আব যেহেতু শাসক হিন্দুই হোন আব মুসলমানই হোন নির্বিঘ্নে ঐশ্বর্যভোগ ও সর্বপ্রযত্নে স্বাধিকাব বক্ষাই তাঁদেব লক্ষ থাকত, সেজন্য তাবা সম্প্রদাযেব লোককেও প্রযোজনে কঠোব হস্তে দমন কবতেন। তাছাড়া পাঠান মোঘল কতৃর্ত্বে হিন্দুবা দলবদ্ধ হযে মুসলিম বিবোধিতা কবাব সাহস পেতেন না, অল্প সল্প একতবফা ঘটনাতেই কলহেব সমাপ্তি ঘটত। বস্তুত এমন ব্যাপক কোন গোলমালেব পবিচয মধ্যযুগে পাওযা যায না। আব কবি কঙ্কন যে পবিচয দিচ্ছেন তাতে হিন্দু-মুসলমান সামাজিক পার্থক্য রক্ষা করেও পারস্পবিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিযে বসবাস কবত।''[২১]

তাছাড়া গুরজাটে মুসলমানদের বসবাস প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দ পদ রচনা করেছেন এবং তারা যে যে বৃত্তি বা পেশায় নিয়োজিত ছিল তারও পরিচয় দিয়েছেন ঃ

(১) ''রোজা নামাজ করিয়া কেই হৈল গোলা।
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা ।।''[২২]

(২) ''বলদে বাহিয়া নাম ধরাল্য মুকেরি।
পিঠা বেঁচিয়া নাম ধরাল্য পিঠারি ।।''[২৩]

(৩) ''মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবাড়ি।''[২৪]

(৪) ''সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম ।''[২৫]

(৫) ''সুন্নৎ করিয়ানাম ধরয়ে হাজাম।''[২৬]

(৬) ''কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘট ।''[২৭]

(৭) ''নেয়াল বুনিয়া নাম ধরয়ে বেনটা।''[২৮]

(৮) ''রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া ।''[২৯]

(৯) ''ধরিলা হালাল নাম কুদ্দুর ধরিয়া।''[৩০]

(১০) ''গোমাংস বেঁচিয়া নাম ধরয়ে কসাই ।''[৩১]

সমাজকে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য এই যে বিভিন্ন বৃত্তিধারি মানুষের উল্লেখ পাই তা আমাদেরকে এক আদর্শ শাসকের সুষ্ঠ রাজ্য পরিচালনার ইঙ্গিতই দেয়।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও আমরা দেখি যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের মধ্যে এক সম্প্রীতির রূপরেখা কবি তৈরী করেছেন। এই কাব্যের 'ঢেকুরপালা' অংশে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ পেশাজীবী মানুষের বসতি বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানদের বসতির বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি উল্লেখ করেছেন ঃ

''পুরীর অন্তর গড়ে স্বতন্তর
বসিল যবন যত।
পাইয়া মর্য্যাদা কত মীরজাদা
সৈয়দ পাঠান কত।।
সমর কুশল বসিল মোগল
শেখজাদা যত জনা।''[৩২]

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বি লোকদের মধ্যে এই যে পারস্পরিক মিলন, তা কিন্তু একদিনে সম্ভব হয়নি। সুদীর্ঘ বছর ধরে হিন্দু-মুসলমানের পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পরিক সংস্কৃতির আদান প্রদানের ফলেই উভয় ধর্মের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বগত মিলন সম্ভব হয়েছিল। পোষাক-পরিচ্ছেদ,

খাদ্য দ্রব্য এমন কি ভাষাব আদান প্রদান ও ঘটেছিল ব্যাপক ভাবে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে দুই-একটি শব্দ উদাহবণ স্বরূপ উপস্থাপিত কবলে বিষযটিব সত্যতা অনুধাবন কবা যেতে পাবে। যেমন ঃ

(১) 'তুমি যে বাজাব লোক চাহ *ইবশাল*'[৩৩]

(২) '*মোকামে মোকামে* পায অজযেব ধাব'[৩৪]

(৩) 'তিনসন *ইজাফা* দিযাছি বাজকব।'[৩৫]

(৪) 'আদবে *ইনাম* পাবে ববে মোব মনে'[৩৬]

(৫) 'অধোবস্ত্র *ইজাব উজাব* অধোদেশে'[৩৭]

শুধু পাশাপাশি অবস্থানেব ফলে সংস্কৃতিব আদান-প্রদানেব মাধ্যমেই যে এই মিলন ঘটেছিল তা কিন্তু সত্য নয। এই মিলনেব পিছনে অন্য কাবণ আছে বলেও মনে হয। মঙ্গলকাব্য বচনাব সমযকালে বাংলাব শাসন ক্ষমতায ছিল মুসলমানবা, তাই তাদেবকে সন্তুষ্ট কবাব জন্য হযত কবিবা হিন্দু-মুসলমানেব এবকম ঘনিষ্ট সম্পর্কেব কথা বলেছেন। আবাব মুসলমান বাজাব পৃষ্ঠপোষকতা লাভেব জন্যও হযত এমনটা কবা হতে পাবে। তাছাডা বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে হিন্দু-মুসলিমদেব মধ্যে কোন বড ধবনেব ঘটনাব উল্লেখ পাওযা যায না সত্যি, কিন্তু ছোটখাটো অনেক ঘটনাবই চিত্র দেখতে পাওযা যায। সেই ঘটনাগুলোকে আডাল কবাব জন্যও হযত এ ধবণেব সম্প্রীতিব কথা বলা হযেছে। মুসলমান বাজা কর্তৃক হিন্দুব সাহিত্য বচনায পৃষ্ঠপোষকতা কবাব পেছনেও কাবণ নিহীত আছে। তুর্কি ও পাঠানদেব শাসনকালে, দিল্লীব নিযন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবাব জন্য বাংলাব মুসলমান শাসকগণ অভিযোগ বিহীন শাসন ব্যবস্থা কাযেম কবতে গিযে বিধর্মী হিন্দুব ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পৃক্ত কাব্য গ্রন্থ প্রনযনে পৃষ্ঠপোষকতা কবেছেন, উদাব মানসিকতা নিযে নয। কিন্তু তবুও এব ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিব একটা বাতাববণ তৈবী হযেছিল, একথা অনস্বীকার্য। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত ও সমন্বযেব পবিচয পাওযা যায মঙ্গলকাব্যে।

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক অতি নিবিড়। সাহিত্য হল সমাজ ও সংস্কৃতির বাহক। সাহিত্যে যেমন আমরা সমকালের ছবি দেখি, তেমনি অতীতকালকেও অবলোকন করি। তাই সাহিত্যিককে তার সমাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। যদিও প্রতিটি সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যিকের সামাজিক চিন্তা চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে থাকে,তবু আখ্যানধর্মী সাহিত্যে সমাজ যেন আপনা থেকেই চলে আসে। তাই এই জাতীয় রচনায় মানুষের পরিবার-সমাজ এমনকি রাষ্ট্রজীবনও প্রতিফলিত হয়। এসম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য -

> ''সমাজে যারা বাস করে, সমাজের যেসব জিনিষ আমরা দেখি, সাধারণতঃ সাহিত্যে তারই প্রতিফলন পড়ে। সে গুলি হলো মানুষের থাকা-খাওয়া, জীবন জীবিকা, ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে মানুষও যেমন উঠে আসে, তেমনি সমস্ত পারিপার্শ্বিক নিয়ে সমাজও ধরা দেয়। তবে সাহিত্যিক সমাজ সচেতন ব্যক্তি হলে, তেমন রচনায় সমাজের অন্তর বাহির উভয় রূপকেই ধরাযায়।''[১]

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান শাখা, যার মধ্যে মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি খুব সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত। প্রধানত দেব- দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে এগুলো রচিত। তবু মানব মনের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস, তাদের কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সবকিছু নিয়ে এগুলো শুধু দেব মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে মধ্যযুগের দেশ কালের সার্থক দলিল। দেবতা এখানে দেবতা হয়ে থাকেন নি, হয়ে উঠেছেন সমাজেরই সাধারণ মানুষ। পৌরাণিক কাঠামোকে গ্রহণ করলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, হাসি-কান্না দিয়ে যে দৈনন্দিন জীবনচিত্র কাব্যে প্রতিফলিত, তা কোন দেবতার নয় - মর্ত্যমানবের। সহজভাবে বলতে গেলে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির উৎস মূলে দৈবী প্রেরণা থাকলেও ক্রমশ তাতে পল্লী বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের বাস্তব রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়সীমার বিচিত্র আবহাওয়ায় স্নাত হয়েই এই মঙ্গলকাব্য গুলির আবির্ভাব। সুদীর্ঘ কাল রাষ্ট্র শক্তির পালাবদল, এক আদর্শাশ্রয়ী

রাজার পর বিভিন্ন আদর্শাশ্রয়ী রাজার শাসনের ফলে মানুষের সমাজ জীবনের যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু কল্যাণকর সমস্ত কিছুই যেন ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছিল। মানুষ সেদিন এই ধ্বংসের ধূলি মেখেই নিজেকে সবচেয়ে অসহায় মনে করেছে, জীবন তাদের দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এই চরম দুর্দ্দশা থেকে মুক্তি লাভ কল্পেই মানুষ তখন আশ্রয় গ্রহণ করে লৌকিক দেবদেবী মনসা-চণ্ডী-ধর্ম-শিবঠাকুর দের কাছে। এই লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গল কাব্যগুলোর বাইরের ছাঁচ পৌরাণিক, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তা সম্পূর্ণ লৌকিক। বিভিন্ন দেব দেবীর জন্ম, ঘর-সংসার, দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্য লাভের উপাখ্যানই মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। কিন্তু এই বাইরের রূপকে বাদ দিয়ে যদি কাব্য কাহিনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় তাহলে দেখা যাবে দেবদেবীদের আচার-আচরণ, তাদের ব্যবহার, পরস্পরের সঙ্গে কলহ সমস্ত কিছুই মানুষদের মত। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে গুণবৈশিষ্ট্য বা অভিব্যক্তি বর্তমান, তা এই দেবদেবীর ওপর আরোপ করা হয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ অমানবিক গুণপ্রকৃতির সাথে মিলে গেছে অতিতুচ্ছ মানবিক গুণ, যেমন ঃ ঈর্ষা, ভয়, লোভ, প্রতিশোধ পরায়ণতা প্রভৃতি। কবি মানস তাই কোনো অপ্রাকৃত, অলৌকিক বা অসত্য জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না, সৃষ্টি করেছে তাদের প্রতিদিনকার পরিচিত জগৎ এবং তাদের বিচরণ ভূমি।

সাহিত্যের উপর সমাজের প্রতিবিম্ব দর্শন একালের সাহিত্য বিচারে খুবই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঠিক সেই বিষয়টাকেই মাথায় রেখে আমরা মঙ্গলকাব্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করব ।মঙ্গলকাব্য ধারায় সবচেয়ে প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য। কাব্যটি আগাগোড়া পড়লে দেখা যায় যে অলৌকিকতা কাব্যটির সমাজ বাস্তবতাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে রেখেছে। কিন্তু এই অলৌকিক আবরণ তুলে নিলে কাব্যটিতে লক্ষ করা যায় মানব জীবনেরই কাহিনি। যেমন ঃ

> ''শিব অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষ। চণ্ডী সপত্নীভীতা এক বাঙালি নারী, যে নাকি আচরণে একে বারে লৌকিক। মনসা সমাজ সংস্কার থেকে বঞ্চিতা নারী, না পাওয়ার বেদনায় তিনি সমাজ বিরোধী। আর জরৎকারুমুনি সংসার সম্পর্কে নিতান্তই অনভিজ্ঞ এবং পারিবারিক ধর্ম থেকে বিচ্যুত কর্তব্যহীন স্বামী।''[২]

প্রতিটি চরিত্রকে যদি এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা হলো এরা কেউ দেবতা নয়। এযেন মানুষের উপর দেবতার প্রলেপ। এই প্রলেপটি সরিয়ে নিলেই তারা রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠবে। যদিও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মূলত দেববাদই প্রাধান্য পেয়েছে, মানবতাবাদ নয়। তবু সেসব সাহিত্যে দেবমাহাত্ম্যের অনিবার্যতা স্বীকার করলেও একমাত্র পরিচয় বলে মেনে নেওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্যঃ

> ''পূরাণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বাংলা সাহিত্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকলেও সাহিত্যের ভিত্তিমূল আরও গভীরে প্রোথিত - দেশের মাটির নীচে প্রসারিত

শেকড় মাটি থেকেই প্রাণরসটুকু সংগ্রহ করে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তাই তার লোকায়ত ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হলে চলবেনা। এই ঐতিহ্যই সে সাহিত্যকে করে তুলেছে মানবমুখী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে তাই কখনও একান্তভাবে দেবতা নিরপেক্ষ মানুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কখনও বা দেবতাই মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছেন। সৃষ্টির পর্য্যায়ে প্রাণের ব্যক্ততম প্রকাশ হচ্ছে মানুষ, দেবতা তো মানুষের আদর্শে গড়া রূপমহিমা।''[৩]

মনসামঙ্গল কাব্যের দেব চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা নিরূপন করা সম্ভব। চণ্ডী চরিত্রের মধ্যে হিংসা, কৌতুক, প্রেম, কূটঅভিসন্ধি সব কিছুরই সমন্বয় লক্ষণীয়। দ্বিতীয়বার সমুদ্র মন্থনে উঠে আসা হলাহল পান করে শিব যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তখন চণ্ডীর প্রেমময়ী রূপ আমরা দেখতে পাই। চণ্ডী তখন আক্ষেপ করে বলেন - 'প্রভু বিনে কি মোর জীবনে'[৪]। কিংবা ঃ

''মোর সবে তুমি সার তোমা বিনা নাহি আর
অনাথ কার্ত্তিক গণপতি।।''[৫]

তখন একমূহুর্তের জন্য হলেও আমাদের মনে হয় স্বামী হারা কোন স্ত্রী সদ্য মৃত স্বামীর বিরহে কাতর হয়ে বিলাপ করছে। আমাদের মনেই হয়না যে সদ্য বৈধব্য প্রাপ্তা এই রমনী দেবাদিদেব মহাদেবের সহধর্মিনী চণ্ডী। তাছাড়া চণ্ডীকে না বলে শিব যখন কমলবনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন নারদ এসে চণ্ডীকে সব বলে দিলে রাগে অভিমানে চণ্ডী শিবকে 'ভাঙ্গড়' বলে সম্বোধন করেছেন। শুধু তাতেই ক্ষ্যান্ত থাকেন নি তিনি সরাসরি শিবকে প্রশ্ন করেছেন ঃ

''কোন কার্য্যে ধর তুমি মস্তকে গঙ্গাকে।
আমি জানি তাহাকে সে নাজানে আমাকে।।
চুলেতে ধরিয়া তার করিলে লাঘব।
তবে সে খণ্ডিবে মম মন দুঃখ সব।।''[৬]

তারপর ঘুমন্ত চণ্ডীর সাথে ছলনা করে শিব কালিদহে কমল আনতে চলে গেলে চণ্ডীর ঘুম ভাঙল, কিন্তু ঘুম ভাঙার পর শিবকে পাশে দেখতে না পেয়ে চণ্ডীর বিলাপ আমাদের মনে করিয়ে দেয় স্বামী পরিত্যক্তা কোন বাঙালি রমনীর কথা। যার কাছে স্বামীই সব কিছু, সেই স্বামীই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। নিরূপায় চণ্ডী তাই বলেন ঃ

''কোথা গেল প্রাণপতি,
হবে মম কোন গতি,
পাগলে যৌবন কৈনু দান।
না বিচারি দোষগুন
রোষ করে অকারণ
আমা ছাড়ি গেল কোন স্থান।''[৭]

চণ্ডী যখন এরকম ভাবনা চিন্তা করছেন, তখন নারদ এসে তাঁকে বললেন ঃ

"শুন হেমন্ত নন্দিনী।
পদ্মবনে জম্মিয়াছে জাতেতে পদ্মিনী।।
তাঁহার নখের রূপ তব অঙ্গে নাই।
বিবাহ করিতে তারে গেছেন গোসাঞি"।।[৮]

নারদের কথা শুনে চণ্ডী সরজা ডোমনীকে ডেকে শিবের খবর নেন। কারণ যে ঘাটে সরজা ডোমনী খেয়া পার করে সেই ঘাট পেরিয়েই শিব রোজ পুষ্পবনে যান। সরজাকে চণ্ডী বলেন যে তার জীবন বড় দুঃখের। স্বামী তার সর্বদা ভাঙের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। এমন স্বামীর হাতে তিনি পড়েছেন, যিনি তাকে একা ঘরে রেখে পালিয়ে যান। চণ্ডী সরজাকে আরো বলেছেন যে তার স্বামী রোজ পুষ্পবনে গিয়ে রাত কাটায়। তাই সরজা ডোমনীর কাছে চণ্ডীর জিজ্ঞাস্য, তিনি আজ খেয়া পায হয়েছেন কিনা! উত্তরে সরজা বলেছে যে সে আজ চণ্ডীর স্বামীকে খেয়া পার করেনি। তার পরের ঘটনা যা দেখি তাতে কখনই মনে হবে না যে দেবতাকে নিয়ে এ কাব্য লেখা। দেবী চণ্ডী ডোমনীর বেশে নৌকায় খেয়া পার করার জন্য চুপটিকরে বসে থাকেন। পরে শিব সেখানে খেযা পার হতে এসে ডোমনীর রূপে পাগল হয়ে যান। হয়ে উঠেন অতিশয় কামাসক্ত।

"ডোমনীর রূপ দেখি অতিসুলক্ষণ
কামেতে পীড়িত শিব বিচলিতমন।"[৯]

কামাসক্ত শিব যখন ডোমনীকে বলেন, 'তবরূপে দহে কলেবর, আলিঙ্গন দিয়া মম প্রাণ রক্ষা কর'।[১০] তারপর খেয়াপারাপার হওয়ার সময় ডোমবেশী চণ্ডীকার সাথে শিবের কথোপকথন শুনে মনে হয় এধরণের কথাবার্তা কোন দেবতার নয়, মর্ত্যমানবের। এছাড়াও লক্ষণীয় মনসাকে প্রথমবার দেখে চণ্ডী তাকে 'সতিনী' বলে মনে করে তার সাথে কলহে মেতে উঠেছেন। মনসাকে দেখে চণ্ডী ভেবে নিয়েছেন যে শিবের সাথে দেবী মনসা হয়ত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত। পিতার অনুপস্থিতিতে এই চরম ঘৃণার কথা শুনে মনসা তাকে নিরস্ত করতে গেলে ক্ষিপ্ত চণ্ডী মনসার চোখ কানা করে দেন। চণ্ডী নিজেই বলেছেন ঃ

"অনেক মারিনু তাঁরে ভাবিয়া সতিনী।।
চক্ষু কানা কৈনু তার কুশাঘাত করি।"[১১]

এতে মনসাও ক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং নিজের বিষদৃষ্টি দিয়ে চণ্ডীকে মেরে ফেলেন। পরে শিব সেখানে উপস্থিত হয়ে মনসাকে অনুরোধ করলে মনসা পুনরায় তাকে জীবন দান করেন। পুর্নজীবন লাভ করে চণ্ডী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে মনসার সাথে প্রবল বচসায় জড়িয়ে পড়েন। কাহিনির অগ্রগতিতে দেখি সমাজ নিন্দার হাত থেকে বাঁচার জন্য শিব মনসাকে নির্বাসন দেন। এখানে পুর্নজীবন লাভের ব্যাপারটিকে বাদ দিলে পুরো ব্যাপারটিই মানব পরিবারের বলে মনে হয়।

মনসা এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। শিবের কন্যা হলেও দেব সমাজে তিনি ব্রাত্য, কারণ তার কোন মাতৃ পরিচয় নেই । তাই দেবসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। নিজের অধিকার অর্জনের জন্য এক নারীর যা কিছু করণীয় তা ই তিনি করেছেন। প্রয়োজনে ছলনার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে এই কাব্যের খল চরিত্র বলে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে মনসা মানেই এক সংগ্রাম। তাঁর সংগ্রাম পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক নারীর আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। মনসা শিবের কন্যা। তাঁর এই পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই যতসব ঝামেলা বাঁধে। জন্মের পর মনসার যখন শিবের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই প্রথম সাক্ষাতেই মনসার রূপে শিবের মনে কাম জাগ্রত হয়। কারণ মনসা তখন রূপসী যুবতী। তাই মনসাকে দেখেই শিব বলেন ঃ

> ''দেখিয়া তোর যৌবন, স্থির নহে মম মন
> প্রাণ বাখ আলিঙ্গন দানে।''[১২]

শিব, কন্যা মনসাকে চিনতে না পারার পিছনেও অবশ্য একটা কারণ আছে। বল্লাস সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথায় এক এক জন কুলীন পাত্র বহু বিবাহ করতে পারত। বিবাহের সংখ্যা কোন কোন সময় এরকম হয়ে যেত যে তারা ভুলেই যেতেন তাদের স্ত্রীর সংখ্যা কত এবং তারা কে কোথায় থাকেন। তাদের গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যা কত। শিবকেও আমাদের এখানে সেই কুলীন স্বামীদের মতই মনে হয়। যিনি নিজের সন্তানের পরিচয় জানেন না। ফলস্বরূপ নিজের ঔরষ জাত সন্তানের প্রতিই কাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

> ''শিব বলে বাক্য মম শুনহ সুন্দরী।
> কোথা হতে আসিযাছ কাহার কুমারী।।
> দেখিয়া তোমাব রূপ দহে কলেবর।
> আলিঙ্গন দিযা মম প্রাণ রক্ষা কর।।''[১৩]

মনসা কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শিবকে খুব সুন্দরভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

> ''পদ্মা বলে রাম রাম,
> না বল এ পাপ কাম,
> হেন বাক্য বল কি কারণ।
> তুমি মম জন্ম দাতা,
> আমি তোমা দুহিতা,
> নারাযণ দেব সুরচন।''[১৪]

কিন্তু তাতেও শিব বিশ্বাস করতে পারলেন না। মনসাকে তিনি নিজ রূপে প্রকটিত হতে বললেন। মনসা তখন বিয়াল্লিশ নাগে ভূষিতা হয়ে নিজ রূপে দর্শন দিলেন। এখানে এই সর্পালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে দর্শন দেবার অলৌকিক ব্যাপারটিকে বাদ দিয়ে যদি বিষয়টি এভাবে

বিশ্লেষণ করা যায় যে মনসা নিতান্ত সাধারণ মেয়ে। ছোটবেলা থেকে পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা মেয়ে বড় হয়ে পিতৃ পরিচয় আদায় করতে চাইলে, সে পিতা তাকে মেয়ে বলে প্রথমে মেনে নিতে চায়নি। পরে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়ার পর পিতা তাকে নিজ কন্যা বলে স্বীকার করেন।

তারপর শিবের স্বীকৃতি লাভ করে মনসা যখন শিবের বাড়ীতে গেলেন, তখন তাকে দেখেই চণ্ডী ক্ষিপ্ত হয়ে যান ঃ

"চক্ষু মেলি দেখে চণ্ডী সম্মুখে পদ্মাকে।
সতিনী সতিনী বলি ঘন ঘন ডাকে।।"[১৫]

শুধু তাই নয়,

"মনসা দেখিয়া কোপে অগ্নি হেন জ্বলে।
লাফ দিয়া ধরিলেক মনসার চুলে।।"[১৬]

তবুও মনসা বিমাতার কাছে থাকার জন্যে অনুনয় বিনয় করেন।

"সতমা হইয়া এত করে অপমান।
কতেক লাঞ্ছনা আব চক্ষু হৈল কান।।
এতসব দুঃখ পদ্মা বিসরিযা মনে।
পুনরপি ধরিলেক চণ্ডীর চরণে।।"[১৭]

এখানে মনসার প্রতি আমাদের সহমর্মিতা জাগাটাই স্বাভাবিক। চণ্ডী কিন্তু তাতে কর্নপাতও করেন নি, বরং শিবকে বলেন, 'অরণ্যে নির্বাস উহা দেহ শীঘ্রগতি'।[১৮] কাহিনির অগ্রগতিতে দেখি যে মাতৃ হীন মনসাকে শিব বাধ্য হয়ে নির্বাসন দেন। যথা সময়ে মনসার বিয়ের আয়োজন হয় জরৎকারুমুনির সাথে। এই বিয়ের যে বর্ণনা কাব্যে পাই তাও যেন এই মাটি থেকেই নেওয়া। মনসাকে নানা আভরণে সুসজ্জিত করা থেকে শুরু করে সমস্ত মঙ্গল কার্য্যই বাঙালি সমাজে প্রচলিত নিয়মের মতই। তাছাড়া মেয়ে জামাইকে যৌতুক দেওয়া থেকে শুরু করে দাস দাসী সঙ্গে দেওয়া এ যেন মানুষেরই কথা বলা হচ্ছে দেবতার মাধ্যমে। বিয়ের পর হুতাশন মুনির অভিশাপে জরৎকারুমুনি মনসাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাবার কালে মনসার বিলাপ স্বামী পরিত্যক্তা কোন সাধারণ নারীর কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। শুধু মনসামঙ্গল কেন চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন প্রতিটি কাব্যের দেবদেবী চরিত্রগুলি বস্তুত দেবতা হয়ে থাকেনি। দেবতার প্রলেপের আড়ালে এরা মানুষের কথাই বলেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেব দেবীরাও অলৌকিক জগতের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের গুণাবলী নিয়ে কাব্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছুই অবগত হওয়া যায়। বিশেষ করে মানুষের সুখ-

দুঃখ-হাসি-কান্নার সাথে তারাও যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছেন। দেবতা ও মানুষে এখানে কোন ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও সমকালীন সমাজ জীবন অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। কাব্যে বস্তুত দেবখণ্ডের পৌরাণিক অংশে অতি প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির যে প্রতিফলন লক্ষণীয়, বলাবাহুল্য কবিরা তা পুরাণ থেকে নিয়েছেন। তবে শিবচণ্ডীর গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায় সমকালীন সমাজের পারিবারিক জীবনের বাস্তব ছবি আছে। বৃদ্ধ পাত্রে কন্যাদান, অবস্থাপন্ন পরিবারে ঘর জামাই হিসেবে থাকার অসম্মান, নিজ সংসারে গিয়ে দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ - চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের এই সমাজ বাস্তবতা বাঙালি জীবনে পরবর্তিকালেও লক্ষণীয়। এ তো গেল শিব-পার্ব্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র। কালকেতু ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনচিত্রে দেখা যায় - ফুল্লরা সুখী কেননা তার সতীন নেই। কালকেতুর কথায় তা স্পষ্টঃ

> "শ্বাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা।
> কার সঙ্গে দ্বন্দ করি চক্ষু কৈলি রাতা।।"[১৯]

সেই সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন যে ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সতীনের ঘর কিংবা ননদের ঘর যেকোন নারীর জন্যই যন্ত্রণাদায়ক ছিল। খুল্লনার দাম্পত্য জীবনের মধ্য দিয়ে সে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। আজকের দিনেও তা সমান ভাবে বাস্তব। সামাজিক রীতি অনুযায়ী বাঙালি ঘরের মেয়েরা সাধারণত বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী চলে যায়, এবং তারপর থেকেই দিনগুনতে শুরু করে দেয় কবে বাপের বাড়ি আসবে। বাপের বাড়িতে যাওযার এই আকুলতা দেবীদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি দেবী ভবানীও বাপের বাড়ি যাবার আনন্দে উদ্বেল। সেই আনন্দ তিনি চেপে রাখতে পারেন নি। তাই দেবী ভবানীকে বলতে শুনি ঃ

> "পিতা মোর পূণ্যবান করিবে অনেক দান
> কন্যাগনে দিবে ব্যবহার।
> আমি আগে পাব মানআভরণ পরিধান
> ভেদ বুদ্ধি নাহিক পিতার" [২০]

বিয়ের পর কন্যা বাপের বাড়ী এলে তাকে বস্ত্র-অলঙ্কার ইত্যাদি দেওয়ার রীতি-বাঙালি সমাজে প্রচলিত। দেবী ভবানীও সেই বস্ত্র অলংকারের কথাই বলছেন। এখানে ভবানী যেন ভগবতী নন কোন বাঙালি ঘরের মেয়ে। দেবতা ও মানুষ এখানে যেন মিলিমিশে এক হয়ে গেছে।

বাঙালি সমাজে কন্যা বিবাহ যোগ্যা হলে কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা উপযুক্ত পাত্র সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মানবীয় এই গুণ দেবতার মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দেখতে পাই যে কন্যা গৌরী বিবাহ যোগ্যা হলে পিতা হিমালয় উপযুক্ত পাত্রের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন।

"রূপবতী হৈমবতী মেনকা হরিষ মতি
হিমালয় চিন্তিত অন্তর।
কুলশীল রূপবান নিরুপম স্ব-সমান
কোথা পাব কন্যা যোগ্য বর।"[২১]

আজকের মতই সেই সময়েও বাঙালি সমাজে মেয়ের বিয়েতে শ্বশুর, মেয়ে জামাইকে পণ দিতেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই এই পণ প্রথা প্রচলিত। তাই কবি কঙ্কনের কাব্যে দেখি যে দেবতারাও এই পন প্রথার বাইরে নন্। গৌরীর পিতা হিমালয় বিয়েতে মেয়েজামাই শিবকে ভূমি দান করেছেন -

"জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান।
তথিমধ্যে ফলে মসুর কার্পাস মাষ ধান।।"[২২]

আর তারপরও সমাজে নারীরা নির্যাতিতা। নানা ভাবেই তাদেরকে শ্বশুর বাড়ীতে নির্যাতন করা হয়। কখনও কখনও তাদেরকে প্রাণেও মেরে ফেলা হত। নিষ্ঠুর হলেও এটা বাস্তব। কবি কঙ্কনের দৃষ্টিতে পুরুষ আর দেবতার তাই কোন পার্থক্য নেই। কারণ দুজনের হাতেই নারী নির্যাতিতা, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গৌরীকে বলতে শুনি ঃ

"দড় ব্যঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিড়ির বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।।"[২৩]

তাছাড়া জমিদার বা বিত্তশালী মানুষ সেযুগে যেমন বিলাসী জীবন যাপন করত, সুরা নারী নিয়ে মজে থাকতো দিন রাত। দেবতাদের মধ্যেও এই প্রবণতা পরিলক্ষিত। কাব্যে দেখিযে শিব পশুকে বর প্রদান করছেন এই বলে ঃ

"ভোগ কর নানা রঙ্গে থাকহ কামিনী সঙ্গে
রাজ ভোগে হইয়া বিহ্বল।"[২৪]

দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি নীলাম্বর অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে আসার পেছনে চণ্ডীর একটা বিরাট হাত রয়েছে। কারণ ইন্দ্র শিবকে ফুল দিয়ে পূজো দিতে গেলে চণ্ডী কীটরূপ ধারণ করে শিবেকে দংশন করেন। ফলে ক্রোধবশত শিব নীলাম্বরকে মর্ত্যলোকে ব্যাধ হয়ে জন্ম নেবার অভিশাপ দেন। কারণ শিবকে পূজো করার ফুল চয়ন করে এনেছিল নীলাম্বর। নির্দোষ নীলাম্বর কোন দোষ না করেই শাস্তির খাঁড়া ঝুলল তাঁর কাঁধে। ঠিক একই ভাবে বাঙালি সমাজেও দেখি সবল সবসময় দুর্বলকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দুর্বলের উপর সবলের এই অত্যাচার মানব সমাজের মতো দেব সমাজেও প্রচলিত। তাই দেবতা ও মানুষকে এখানে আলাদাভাবে চিনে নেওয়া খুবই মুশকিল। বলতে গেলে দেবতার আদলে কবি আসলে মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন।

হর-গৌরীর বিয়ের পর শিব যখন পরিবার নিয়ে শ্বশুর বাড়ি থাকতে শুরু করলেন।

কাজ নেই কর্ম নেই, রোজগার করার ক্ষমতা নেই, দিনরাত কেবল পাশা খেলা । এতে মেনকা রুষ্ট হলে গৌরী মেনকার কলহের যে চিত্র কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী এঁকেছেন তা একেবারেই বাস্তব। মেনকা বলেছেন ঃ

''দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ ছাল
সবে ধন বুড়াবৃষ গলে হাড় মাল।।
প্রেত ভূত পিশাচ মিলিল তার সঙ্গ
অনুদিন কত নাকি কিনা দিব ভাঙ্গ।।
রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।।''[২৫]

একথা শুনে একবারের জন্যও মনে হয়না এই চিত্র কোন দেব পরিবারের। মনে হয় আমাদের নিত্য দিনের দেখা ঘর জামাই রেখে তার নিত্য সেবা করে বীতশ্রদ্ধ কোনো শ্বাশুড়িমাতার অর্ন্তবেদনাই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শিব-দূর্গার গৃহস্থালিতেও সেই সুরেরই মুর্ছনা যেন বার বার বেজে উঠেছে। ভোজন রসিক শিব নিজের ইচ্ছে মত খাদ্য তালিকা দিয়ে যাচ্ছেন রান্না করার জন্য।

''আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত।।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর
কুমড়া বর্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।।''[২৬]

উত্তরে গৌরী জানিয়েছেন ঃ

''কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিনু।
অরশেষে যেবা ছিল রন্ধন করিনু।।
রন্ধন করিতে ভাল বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই।।''[২৭]

গৌরীর এই উক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের কথা উঠে এসেছে। এরূপ অসচ্ছল পরিবার কোন দিনই দেবতার হতে পারেনা। শিব দূর্গার দাম্পত্য জীবনও সুখের নয়। প্রায়সই স্বামী-স্ত্রী তে ঝগড়া লেগেই থাকে। এর মূল কারণ একটাই - সে হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্য যদি কোন পরিবারে প্রবেশ করে তাহলে সে ঘর থেকে প্রেম-ভালোবাসা পালিয়ে যায়। শিব দূর্গার দাম্পত্য জীবনেও তাই ঘটেছে। শিবের সাথে কলহ করে দুর্গা তাই মাঝে মাঝেই বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার হুমকি দেন। সহচরী বিজয়া তখন অনেক কষ্ট করে দূর্গাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেন। স্বামী-স্ত্রীর এই যে কলহ তা দেব সমাজের নয় - বলা বাহুল্য তা হত দরিদ্র মানুষের। প্রকৃত অর্থে দরিদ্র শ্রমজীবীদের এটা হলো প্রাত্যহিক জীবনের ছবি। ফলে কবিকঙ্কন বা অন্যান্য কবিরা শিব দুর্গার পৌরাণিক প্রলেপে যে চিত্র এঁকেছেন তা বাইরের আবরণ মাত্র এর অর্ন্তমূলে প্রোথিত মানুষেরই জীবন কথা।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনও যথেষ্ট বাস্তবতার সাথে কাব্যে উপস্থিত। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যে যে সমাজ জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় 'ধর্মমঙ্গল'কাব্যে তা অনুপস্থিত। তার বদলে এখানে প্রাধান্য পেযেছে একটি রাজ্য জয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। বাংলার জনমানসে এই কাব্য যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তার পেছনে কারণ অবশ্যই আছে। কারণটা ঐতিহাসিক। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য যখন লেখা হয তখন রাঢ় বাংলায় যথেষ্ট অরাজকতা চলছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সাথে বাংলার নবাব হুসেন সাহের যুদ্ধ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর আক্রমণ পর্যন্ত রাঢ় বাংলার ইতিহাস যুদ্ধের ঘনঘটাতে ভরা। আর তার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হযে পড়েছিল। আর সেই সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয। অবশ্য তার অনেক আগে থেকেই এই কাহিনির কিছু অংশ লোক সমাজে প্রচলিত ছিল ডোমদের লোকস্মৃতি ও লোক গাঁথায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিরা এই 'ডোম' দের অধিষ্ঠিত করলেন গৌরবের আসনে। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে এটা যেন সরাসরি জেহাদ ঘোষণারই নামান্তর। অবশ্য মনসামঙ্গলকাব্যেও নিম্নবর্গীয় দেবী মনসা ও মাঝি মাল্লারা শৈব চাঁদ সদাগরের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করে জয়ী হয়েছিল। সেদিক দিয়ে লক্ষ করলে মনসামঙ্গলে যার সূচনা ধর্মমঙ্গলে তার পূর্ণবিস্তার বলা যায়। আর সেজন্যেই ধর্মমঙ্গলে দেবকথার আড়ালে নিম্নবর্গীয় মানুষের কথাই উঠে আসে যেন আগে।

দুর্গা চরিত্রের মধ্যে অবশ্যই সমকালীন সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে দেহনির্ভরতা, প্রেমাভিনয়ের মধ্যে যৌন আবেদন, অর্থের বিনিময়ে দেহকে পন্যের মত সস্তায় বিক্রি করতে দেখা যায়। তাই ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যের 'আখড়া পালা', 'জামতি পালা' ও 'গোলাহাট পালায়' দুশ্চরিত্রা নারীর চরিত্র অঙ্কন করে সেই সময়ের গঠনশীল সমাজ-ব্যবস্থার জীর্ণতাকেই তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। তাই দেবী দুর্গাকেও দেবীত্ব বিসর্জন দিয়ে দাঁড়াতে হয় গণিকার ছদ্মবেশে। দেহের মদিরা দিয়ে ভক্তের চোখে ধরাতে হয় নেশা। এটা অবশ্যই যুগ প্রভাবেরই ফল।

'আখাড়া' পালায় দেখি দুর্গা লাউসেনকে মোহিত করতে একেরপর এক কামবান নিক্ষেপ করলেন। কাম উদ্দীপক আচরণ করলেন।

> "রতন যৌবন ডালি কোলে উপস্থিত।
> রাখিলে আমার ভাবে পাবে মহাপ্রীত।।"[২৮]

কিন্তু তবুও যখন লাউসেনকে টলাতে পারলেন না, তখন দেবী তাকে বর প্রদান করলেন। এই অলৌকিকতাটুকু বাদ দিলে আমাদের মনেই হবেনা যে দেবতা এখানে গণিকা রূপে উপস্থিত। আসলে কবি এখানে দেব চরিত্রকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে তারা অনেকক্ষেত্রেই দেবত্ব বর্জিত হয়ে উঠেছেন।

শিবাযন কাব্যে শিব ও দূর্গা দেবতা হলেও তারা বাঙালির ধর্ম-সমাজ ও সংস্কৃতিতে মিশে গেছেন । এই কাব্যে শিব-দূর্গার গার্হস্থ্য জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। শিবকে একজন আদর্শ বাঙালি গৃহস্থ বলেই মনে হয়, যিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে শান্তিতে দিন যাপন করতে চান। আর দূর্গা চিরায়ত বাঙালি মেয়ের মতই স্বামী গৃহে কঠোর পরিশ্রম করতেও কষ্ট বোধ করেননা, বরং হরেকরকম অন্নব্যঞ্জন রান্না করে স্বামী-পুত্র-কন্যাকে খাইয়ে নিজের জীবনের চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করেন। শিব-দূর্গার এই গার্হস্থ জীবন সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয -

> ''তিনি (শিবঠাকুর) স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবেষ্ঠিত গৃহী। যদিও তাঁহার আবাস কৈলাস বলিযা উল্লিখিত হয, তথাপি অতি সহজেই অনুভব করা যায় যে, এই কৈলাস বাংলারই এক নিভৃত পল্লী ছাড়া আর কিছুই নহে। দুই পুত্র, দুই কন্যা ও এক সর্বংসহা পত্নী লইয়া এই পল্লীতে এক দরিদ্র্য ব্রাহ্মণের বাস।''[২৯]

শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের এ চিত্র আজও পাঠকের হৃদয়ে অম্লান। অন্যান্য সমালোচকের দৃষ্টিতেও বিষয়টি একইভাবে ধরা পড়েছে।

শ্রীযুক্ত নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> ''এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগম্মাতা
> পার্ব্বতীর কৈলাস জীবন নয়, এ অতীত বাংলার
> কোন শিবদাস ভট্টাচার্য্য এবং তস্য ভার্য্যা
> পার্ব্বতী ঠাকুরবাণীর জীবন কাহিনী।''[৩০]

হিন্দুপুরাণে শিবকে দেবাদিদেব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেবাদিদেব বলতে সাধারণত যা বুঝা যায় তাহলো দেবতাদের আদিদেব, অর্থাৎ দেবতার মধ্যে যিনি সবচেয়ে প্রবীন। আর দুর্গা অর্থাৎ সতী হলেন দক্ষরাজ দুহিতা। বলাই বাহুল্য যে দক্ষরাজের যজ্ঞ সভায় পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। শিব তখন প্রচণ্ড উন্মত্ত হয়ে দক্ষযজ্ঞ নাশ করে সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয়কারী নৃত্য শুরু করেন এরূপ পরিস্থিতিতে দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু সুদর্শন দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে দেন। অবশেষে শিব শান্ত হয়ে ধ্যানস্থ হলেন এবং সতী পুনরায় উমা রূপে হিমালয়ের গৃহে জন্ম লাভ করেন। এই জন্মেও শিবের সাথে তার বিয়ে হয়। 'শিবায়ন' কাব্যে এতটুকু কাহিনি পর্যন্ত পুরাণকে অবলম্বন করা হয়েছে কিন্তু তার পরে শিব-দুর্গার গার্হস্থ জীবন বর্ণনায় শিবায়নের কবিরা পুরাণকে ধরে রাখেননি। শিব এখানে দেবাদিদেব মহাদেব নন, একজন সাধারণ দরিদ্র পরিবারের গৃহকর্তা। কিন্তু সংসার জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ান উদাসীন পুরুষ। তাকে নিয়ে গৃহিনীর যত দুশ্চিন্তা। তাদের পরিবারে অনেক লোক, গৃহকর্তা শিব, তাঁর স্ত্রী পার্বতী, দুই পুত্র, ভীম নামে এক ভৃত্য, তিন দাসী। অথচ আয়ের একমাত্র উপায় শিবের ভিক্ষাবৃত্তি। কিন্তু এতে সংসার চলে না। অভাবের সংসারে পরের দিন খাদ্য কোথা

থেকে আসবে এ বিষয়ে বিন্দু মাত্র আগ্রহী নন শিব। উপরন্তু তিনি জমিয়ে আড্ডা দেন এখানে-সেখানে। এ বিষয়ে অবশ্য গোপনে মামীকে জানিয়েছেন ভাগ্নে নারদমুনি ঃ

"কুচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
শঙ্করভ্রমে তায় করে মধুপান।।
নিত্য নিত্য এই কীর্তি করে কৃত্তিবাস।
দিনশেষে বিজ্ঞ বেশে ভিক্ষা অভিলাষ।।"[৩১]

অবশেষে পার্বতী শিবকে চাষাবাদের পরামর্শ দেন ঃ

"চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন ।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন।।
চরণে ধরিযা চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে ।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে ।।"[৩২]

স্ত্রী পার্ব্বতীর পরামর্শে শিব চাষ আবাদ করতে মনস্থ করেন। সমস্ত শিবায়ন কাব্য জুড়ে গৌরীর গৃহস্থালীর বর্ণনা, ভগবতীর শঙ্খ পরিধান প্রসঙ্গ, সমস্ত কিছুতেই শিবঠাকুরের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত বাস্তব জীবন চিত্র চিত্রিত হয়েছে। 'শঙ্খ পরাপালা'য় শিবঠাকুরের কাছে পার্বতীর শঙ্খ চাওযার করুণ ধ্বনিটি ট্রাজেডির সমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে ভাস্বর হয়েছে ঃ

"প্রণমিয়া পার্বতী প্রভুর পদতলে ।
রঙ্কিণী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে ।।
গদগদ স্বরে বলে করে কাকুর্ব্বাদ।
পূর্ণকর পশুপতি পার্বতীর সাধ।।
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটী বাই।
কৃপা কর কান্ত আর কিছু চাই নাই।।"[৩৩]

সতী নারী স্বামীর কাছে শাঁখা চেয়েছে, যে শাঁখা কোন বিলাসিতার জিনিষ নয়, এয়োতির চিহ্ন স্বরূপ। শাঁখা হাতে না থাকলে কারো সামনে হাত বের করা যায় না। এই দুঃখের কথা পার্বতী তার স্বামী শিবকে জানিয়েছেন ঃ

"লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই ।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাই কই ।।
তুল ডাটি পারা দুটী হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর।।
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।"[৩৪]

কিন্তু নিরুপায় স্বামী পতিব্রতা স্ত্রীর এই সামান্য আবদার টুকুও রাখতে পারলেন না।

'শিবায়ন' কাব্যে এই যে জীবন চিত্র কবিরা চিত্রিত করেছেন, বিশেষ করে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য যে জীবন চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে কবির দরদী মনের পরিচয় পাওয়া

যাচ্ছে। রামেশ্বর বাঙ্লার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। তাই তার রচনায় এই সমাজের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। ফলে সহজাত কবিত্ব শক্তি বলে তিনি এত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সেই সমাজের বর্ণনা দিতে পেরেছেন। কবি আপন কল্পনা শক্তি দিয়ে এমন এক পরিবারের চিত্র এঁকেছেন যা পড়লে মনে হয় কাব্যে বর্ণিত হরগৌরী যেন আমাদের প্রতিবেশী, তাদের ঘর সুদূর কৈলাসে নয়, আমাদেরই ঘরের পাশে।

দেবতাদের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে মঙ্গল কবিরা তাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এভাবেই মানুষের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশার মর্মস্পর্শী আলেখ্য তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, প্রায় সবকয়টি মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে তা প্রযোজ্য ঃ

> ''বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্রগুলি তাঁহার কাব্যে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। এই দিক দিয়া বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসেও একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, তাঁহার পরিকল্পিত দেব-চরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানবচরিত্র রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নাই। বাংলার ধূলিমিলন গৃহাঙ্গিনায় তাঁহার কাহিনীর পরিবেশটি রচনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আদর্শবাদের স্পর্শ মাত্রও নাই।''[৩৫]

সাহিত্য সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারও মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে একই কথা বলেছেন ঃ

> ''সেইকালে এবং স্থানে যে জীবন নিজেকে সৃষ্টি করেছিল এবং যেভাবে সৃষ্টি করেছিল, কবির সরস জীবন দৃষ্টি তাই তার বর্ণনার রেখায় রেখায় তুলে ধরেছেন। কবি চোখ দিয়ে যা দেখেছেন, হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করেছেন, ব্যাপক জীবন বোধ দিয়ে যা বুঝেছেন, তা-ই কাব্যে ভাষা পেয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ব্যথা-বেদনা এবং প্রচলিত জীবনের সামগ্রিক প্যাটার্ন তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে কাহিনীর সঙ্গে রূপ পেয়েছে। এইসব বর্ণনা থেকে এবং সমস্ত খণ্ড খণ্ড চিত্রকে অবলম্বন করে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক জীবনের একটা অখণ্ড চিত্র সৃষ্টি করা চলে।''[৩৬]

মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে জানতে হলে সেই সমাজের কতকগুলি দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা খুবই আবশ্যক। যেমন ঃ

(১) সেই সমাজের ভৌগোলিক পরিবেশ।
(২) সেই সমাজের শাসক শক্তির অবস্থান।
(৩) উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা তার সাথে অর্থনৈতিক অবস্থা।
(৪) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি।

আমরা জানি সাহিত্য সমাজের দলিল, কালের দলিল । ফলে যে কোনো সাহিত্যকে জানতে হলে তার কাল অর্থাৎ সময়কে জানা আবশ্যক । মঙ্গল কাব্যের সমাজ জীবন নিয়ে

আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মঙ্গল কাব্য রচনার সময়কে জানা তাই প্রয়োজন। মূলত পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। বাংলা মঙ্গল কাব্য গুলোতে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের রীতি-নীতি ও হাল-চালের রূপটি বাস্তব সম্মত ভাবে ধরা পড়ার কারণ, যে চরিত্রগুলি মঙ্গলকাব্যের ঘটনার ধারক ও বাহক তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের। এমন কি মঙ্গল কাব্যে যেসব দেবতারা স্থান পেয়েছেন তাদের চরিত্রের মধ্যেও সামাজিক জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এই মঙ্গলকাব্য গুলোর মধ্যেই গোটা মধ্যযুগের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনকে যে খুঁজে পাওযা যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর কোন দেশেরই ভৌগোলিক পরিসীমা সবসময় এক থাকেনা, থাকা সম্ভবও নয়। কখনও তার কলেবর বৃদ্ধি পায় আবার কোন সময় তা সংকুচিতও হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উঠা-নামার উপর তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের প্রথম কবি কানা হরিদত্ত। বিশেষজ্ঞদের অনুমান তার কাব্যটি চতুর্দ্দশ শতকে লিখিত, কিন্তু সঠিক কোন সন-তারিখ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই এই গ্রন্থে বর্ণিত মানুষের প্রবহমান জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ধ্যান-ধারণার জগৎ, তার আর্থ-সম্পদ, তার আহরণ উপায়, বণ্টন বিধি সবকিছুই আমাদের কাছে অজ্ঞাত। পরবর্তি সময়ে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে দিল্লির সিংহাসনে আসীন শাসক হিসেবে হুসেন সাহের উল্লেখ করেছেন। বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে লিখেছেন ঃ

> ''ঋতু শূণ্য বেদশশী পরিমিত শক।
> সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক ।।
> সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
> নিজ বহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।।
> রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।
> মল্লুক ফতেয়া বাদ রাঙ্গরোড়া তকসিম্।।''[৩৭]

বলাই বাহুল্য যে বাংলার বিভিন্ন জনপদ রাষ্ট্র তখন তাদের প্রাচীন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম পরিহার করে এক 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী এই দুই রাজ বংশের আমলে বাংলায় এক অখণ্ড ও সার্বভৌম রাজ শক্তি গড়ে উঠে।

ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে শাসক ও শাসিত পরস্পরের মধ্যে যে হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ-সংঘাত ও বিজেতা-বিজিত সুলভ ভাব বিরাজ করছিল, ইলিয়াস শাহী রাজত্বকালে তা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ পূর্ববর্তি শাসকদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তি শাসকরা তা অনায়াসেই বুঝে নিয়েছিলেন যে হিংসা-ধ্বংস-রক্তপাত দিয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন দিনই সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়, বরং ক্ষমতায় টিকে থাকতে

হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে অনুপ্রাণিত হতে হবে। তাতে উভয় পক্ষই লাভবান হবে। দেশজ সংস্কৃতি, লোকায়ত ঐতিহ্য তাদের সাহিত্য, দর্শন-চিন্তা-চেতনার প্রতি আরো সংবেদনশীল ও সহানুভূতি সম্পন্ন হতে হবে। আর এরই ফলশ্রুতিতে ইলিয়াস শাহী রাজনীতিক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ হুসেন শাহ্ হিন্দুদেরকে শুধু রাজ কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেই ক্ষ্যান্ত থাকেন নি, একান্ত মর্যাদা সম্পন্ন ও দায়িত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের অধিষ্টিত করেছেন। শুধু তাই নয় তারা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপ্‌লাই তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছেন।

মহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের পর থেকে অনেক রাজবংশের রাজারাই বাংলা শাসন করেছেন। প্রায় পাঁচশ বছরের এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রথমে গ্রামগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থার অবস্থানও ছিল গ্রামে,

> "যার ফলে সৃষ্ট হয় বিভিন্ন গ্রাম্য বাজার হাট প্রভৃতি। কিন্তু এই যুগে পৌছে কৃষিও হস্তশিল্প, দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, গ্রামীন অর্থনীতির এই দুই ধনোৎপাদন ব্যবস্থা স্বতন্ত্র বিকশিত হয়। উৎপাদিকা শক্তির ক্রমবিকাশের দরুন উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময়ের প্রসার আরও বৃদ্ধি পায়। এই বিনিময ব্যবস্থার দৌলতে সৃষ্ট হয় নতুন শ্রমবিভাগ, জন্ম নেয় এক নতুন শ্রেণী, যারা পরিচিতি লাভ করে বণিক পরিচয়ে।"[৩৮]

'মনসা মঙ্গল' কাব্যের চাঁদ সদাগর ও চণ্ডীমঙ্গল' এর ধনপতি ওই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদেব সামাজিক অবস্থানের পর্যালোচনা করলেও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যের বিশেষ ভূমিকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন কবির রচনায় বাণিজ্যপথের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে বর্ণনাযও তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থা তথা ধনউৎপাদন ব্যবস্থায় বাণিজ্যের গুরুত্ব তথা সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক চাঁদ সদাগর দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য যাত্রা করেছে। তাঁর এই যাত্রা পথের বর্ণনা প্রসঙ্গেই তার গন্তব্যাভিমুখে সমুদ্র পথের বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনা যে নেহাত কাল্পনিক নয় তার প্রমাণ মেলে বিপ্রদাসের কাব্যে। তিনি তাঁর 'মনসাবিজয়' কাব্যে যে সমুদ্র পথের বর্ণনা করেছেন তার সাথে অনেকাংশেই মিল রয়েছে ফান্‌ডেন ব্রোকের নকশায় দেওয়া ভাগীরথীর প্রবাহ পথের। নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন ঃ

> **"পঞ্চদশ শতকে ভাগীরথী সংকীর্ণ তোয়া সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন তার প্রবাহ আজিকার মত ক্ষীন নয়, সাগর মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পর্যন্ত বড় বড় বাণিজ্যতরীর চলাচল এখনও অব্যাহত। ফান্‌ডেন ব্রোকের নকশায় এই পথের দুই ধারের নগর বন্দরের এবং পূর্ব ও পশ্চিমাগত শাখা-প্রশাখা নদী গুলির সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। ফান্‌ডেন ব্রোকের কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর আগে বিপ্রদাস পিপলাই তাহার মনসামঙ্গলে এই প্রবাহ পথের যে বিবরণ দিয়েছেন তাহার সঙ্গে ফান্‌ডেন ব্রোকের নকশার বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রেই এক। এই দুই জনের নিকট হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান**

তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমত, ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহই অন্তত কলিকাতা পর্যন্ত, পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতকের প্রধানতম প্রবাহ দ্বিতীয়ত ত্রিবেণীতে বা মুক্তবেণীতে সরস্বতী-ভাগীরথী যমুনা সংগম, তৃতীয়ত, কলিকাতা ও বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমানে আমরা যাহাকে বলি আদিগঙ্গা, সেই আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরথীর সমুদ্রযাত্রা।''[৩৯]

মধ্যযুগে বাণিজ্যে বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল, কারণ বিজয় গুপ্ত-বিপ্রদাস-পিপলাই প্রভৃতি মঙ্গল কবিদের কাব্যে দেখি যে চাঁদ সদাগর নিজের দেশে উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে জাহাজ বোঝাই করে বাণিজ্য যাত্রা করেছেন আর বিনিময়ে নিয়ে এসেছেন সে সকল দেশের বিলাস সামগ্রী । বিজয় গুপ্তের কাব্যে পাই ঃ

(ক) ''হস্তীর দন্ত দেখিয়া চান্দ হাসে মনে মন।
বিজু সিজু ডিঙায় ভরিল ততক্ষণ।।''[৪০]
(খ) 'হরিদ্রা বদলে চান্দ লইলেক সোনা।।'[৪১]
(গ) ''কলাই দেখিয়া রাজার আনন্দ বিশাল।
ইহার বদলে দিল মুক্ত প্রবাল।।''[৪২]

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বাণিজ্য ব্যবস্থায় মুদ্রার নিম্নতম মান ছিল 'কড়ি'। নারায়ণ দেব রচিত 'পদ্মাপূরাণে' দেখি চাঁদ সদাগর মাছ বিক্রি করে উপার্জন করা কড়ি কিভাবে ব্যয় করবেন তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। কাব্যে পাই ঃ

''চান্দো বলে অর্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অর্দ্ধেক কড়ি আমি নটিরে বিলাইব।।''[৪৩]

কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যেও মুদ্রার নিম্নতম মান 'কড়ি' হিসেবেই পাওয়া যায়ঃ

''একপন কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর একপন কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব।।
আর একপন কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব।
আর একপন কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব।।''[৪৪]

শুধু 'মনসা মঙ্গল' কাব্য নয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বর্হি-বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা আছে। ধনপতি সদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রা করেছে। বলা বাহুল্য যে সমাজে তখন বিনিময় অর্থনীতি ও মুদ্রা-অর্থনীতি দুটোই চালু ছিল এবং এই দুটি পদ্ধতিরই উল্লেখ রয়েছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। মুদ্রা-অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে যে ঘটনাকে আমরা পাচ্ছি তা হল দেবী প্রদত্ত আংটি কালকেতু মুরারি শীলের কাছে বিক্রি করেছে কোটি টাকায়। আর বিনিময় অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে ধনপতি সদাগরের সিংহল যাত্রার উল্লেখ করা যায়। ধনপতি যেসব দ্রব্য বিনিময়ের জন্য সিংহল নিয়ে গিয়েছিলেন সে গুলো উল্লেখযোগ্য ঃ

"বদল আশে নানা দ্রব্য এনেছি সিংহলে।
যে দিলে যে হয় তাহা শুন কুতূহলে।।
তুরঙ্গ বদলে কুরঙ্গ দিবে।
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে
শুন্ঠের বদল টঙ্ক।
প্রবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে
পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে জায়কল দিবে
বহড়ার বদলে গুয়া।
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল দিবে
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটশন বদলে ধবল চামর
কাঁচের বদলে নীলা।"[৪৫]

এর থেকে প্রমাণ হয় যে সে সময় বাংলার সমাজ কৃষি সমৃদ্ধ ছিল। ফলে খাদ্যেও সয়ম্ভর ছিল। অন্যথায় চাঁদ সদাগর ও ধনপতি বিলাসিতার দ্রব্য না এনে দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্রব্য আহরণ করতেন।

মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সমাজ বর্ণ ও বৃত্তি নির্ভর, বিভিন্ন বর্ণের ও বৃত্তির লোকের সন্ধান আমবা পাই প্রায় প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যে। সমাজের শীর্ষে ছিলেন ব্রাহ্মণরা। তারা শাস্ত্র, পুরাণ, সাহিত্য, অলংকার শাস্ত্র সবকিছুতেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাই সারস্বত সমাজে সবকিছুতেই তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ঃ

নিবাংসি দ্বিজজত কথা সরোদয় হার তথা
নাটক নাটিকা ভাল জানে।
কণ্ঠে তার সরস্বতি মুখে তার বৃহস্পতি
আগম আদি বেদ বাখানে।"[৪৬]

সেই সময় অনেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই টোল খুলে বাড়ীতে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এবং এই টোলের আয় থেকে অনেকেরই সংসার চলত। যেহেতু ব্রাহ্মণরা বর্ণে শ্রেষ্ঠ ছিল তাই সকলেই তাদের শ্রদ্ধা করত। শুধু তাই নয় পাদ্য-অর্ঘ্য সহ অভ্যর্থনা পাওয়া ও যজমানের কৃতার্থ হওয়াও সেকালে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বিষয়টি মনসামঙ্গলকাব্যে লক্ষ করা যায়। চাঁদ সদাগর ও সায় বেনের ঘরে ঘটক ব্রাহ্মণ প্রবেশ করলে দুই বাড়িতেই ব্রাহ্মণ সমাদৃত হলেন ঃ

"ব্রাহ্মণ দেখিয়া তারে কৈল নমস্কার।
বসিবারে দিল তারে আসন ভৃঙ্গার।।

আসনে বসিয়া দ্বিজ পাখালে চরণ।
সম্বন্ধের প্রস্তাবে বসিল দুইজন।।"[৪৭]

এই ব্রাহ্মণদের সামাজিক মর্যাদা ছিল সত্যি, কিন্তু তারা অত্যন্ত লোভী প্রকৃতির ছিলেন। ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকেই তারা প্রায় পদানত করে রেখেছিলেন। চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে ধনপতির অনুরোধে দনাই পণ্ডিত লক্ষপতির ঘরে সম্বন্ধ নিয়ে যান। কিন্তু লক্ষপতি নিজের দুরবস্থার জন্য ব্রাহ্মণ দনাই পণ্ডিতকে প্রথানুগ সমাদর করতে পারেন নি। এর ফলে রুষ্ঠ হয়ে ওঠেন দনাই পণ্ডিত। কবির বর্ণনায় তা খুব স্পষ্ট ঃ

"ইহা শুনি দ্বিজবর বলে অভিরোষে।
কেনি বা আইনু সাধু তোমার নিবাসে।।
বসন দক্ষিণা যদি নাঞি দিলি দান।
ব্যবহার ঘুচালে সন্দেশ গুয়া পান।।
এত অনুযোগ শুনি সাধু লক্ষপতি।
কর যোড়ে অনুনয় করে ওয়া প্রতি।।"[৪৮]

এর মধ্য দিয়ে সেকালের ব্রাহ্মণদের লোভ ও লালসার কথা তো ফুটে উঠেছেই তার সাথে অন্য জাতিদের তারা কিভাবে চাপে রাখতেন তাও প্রকাশ পেয়েছে। শুধু চণ্ডী মঙ্গল নয়, মনসা মঙ্গল কাব্যেও তা লক্ষণীয়। বেহুলার বিয়েকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দানের মাধ্যমে সে পরিচয় কাব্যে নিহিত।

"পঞ্চদশ মুদ্রা দক্ষিণা বিষ্টুদাসে।
এক লাখ এক ক্রান্তি মনুহর গ্রামে।।
ছায়া মণ্ডপে যত ব্রাহ্মণ আর ভাই।
বিহিত প্রকারে দক্ষিণা দিল তাক্।।"[৪৯]

ব্রাহ্মণদের পরেই সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল কায়স্থদের। ইলিয়াস শাহী বংশের সূচনা লগ্ন থেকে বাংলাদেশে জমিদার শ্রেণী হিসেবে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা সমান তালে এগিয়ে এলেও পরবর্তি সময়ে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি কিছুটা কমে আসে। এ সম্পর্কে সনৎ কুমার নস্করের মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য। তিনি তাঁর 'মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হোসেন শাহী পর্বে মিথ্যা গুজবের কারণে ব্রাহ্মণদের দেখা হতে থাকে সন্দেহের চোখে। বলতে গেলে, রাজ কর্মচারী ও ভূস্বামী হিসেবে কায়স্থদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এই সময় থেকেই। মুঘলদের বাংলা বিজয়ের প্রাক্কালে আঞ্চলিক শাসন কর্তা রূপে যে-সব বাঙালী জমিদারদের পাই তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন কায়স্থ বংশ সম্ভূত।"[৫০]

শিক্ষা দীক্ষা ও সমাজের সামাজিক বিকাশে মধ্যযুগে কায়স্থদের স্থান ছিল অনেক উপরে। রাজস্ব আদায়, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে তাই কায়স্থদেরকেই নিযুক্ত করা হত।

অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও তারা যথেষ্ট সম্মানও পেতেন। তৎকালীন সমাজে বণিকরাও কায়স্থের পরের স্থানেই ছিল। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগর, ধনপতিরাযে সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠিত তা বলাই বাহুল্য। আর শাস্ত্রী সমাজের চোখ রাঙানিতে সমাজের একেবারে নীচের স্তরে পড়েছিল যারা তারা হল করণ, বৈদ্য, নাপিত, গোপ, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার বা শাঁখারি, তন্তু বায়, কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধর, মোদক, তৈলকার বা তেলী, চর্মকার, শুঁড়ি, কসাই, কৈবর্ত, রজক, ব্যাধ, জোলা, বাগদী, চণ্ডাল আরো অনেক। জীবন মৈত্র তাঁর কাব্যে এদের একটি তালিকা পেশ করেছেন।

''তিলি তাঁতি সূত্রধর শুঁড়ি গুড়ি মালাকাব
কৈবর্ত কোত্তালি কর্ণহাড়ি।
বণিক নাপিত কুবি চাই ধাই তাম নীহোরি
কোচ মেচ চণ্ডাল বাউবি।।
যোগী জোলা ভাট নট গাবো হাজ ভাউ ভোট
গোপ বাকই সেকার মোদকী।
কুমাব কামাব যেন চামব ঢুলায জেল
নানা জাতি ঢুলিয়া বন্ধকী ।।''[৫১]

এই নিম্ন বর্ণের লোকদের সমাজের উচ্চ বর্ণের লোকরা ঘৃণার চোখে দেখতো, তাদের ছোঁয়া জলও স্পর্শ করতনা উচ্চ বর্ণের লোকেরা। শুধু তাই নয় হিন্দু দেবতার মন্দিরের দরজাও এদের জন্য চিরকাল বন্ধ থাকতো। এদের দেখলে কিংবা এদের স্পর্শ করলে উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিজেদের অশুচি মনে করত। ময়ূর ভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে অন্ত্যজ কালুডোমকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে ঃ

''তুই তো চণ্ডাল জাতি নর মধ্যে হিন যাতি
কেহ নাহি দেখে এ বদন ।''[৫২]

সমাজের উচ্চ বর্ণের লোকের সাথে নিম্ন বর্ণের বিয়ে বাঙালি সমাজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ নিম্ন বর্ণের সাথে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন হলে উচ্চ বর্ণের 'জাত' চলে যেত। তাই এই ধরণের আন্তঃ বিবাহে কেউই উৎসাহ দেখাত না। চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে এরকম স্তর বিন্যাস লক্ষণীয়ঃ

''আমি ক্ষত্রী বণিকেরে বল কন্যা দিতে।
জাতি নাশ করিতে তোমার লয় চিতে।''[৫৩]

এর থেকে প্রমাণ হয় যে জাতি ভেদ প্রথা মধ্যযুগের মানুষের চিন্তা চেতনাকে কিভাবে গ্রাস করেছিল। ফলে মানুষ শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে

ফেলে ছিল। যার ফলে নিম্ন বর্ণের লোকেরা সবসময় একটা ভয় মিশ্রিত ভাব নিয়ে উচ্চ বর্ণের লোকদের সামনে উপস্থিত হতো। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখি যে লখীন্দরকে পুনর্জীবিত করে স্বর্গ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে বেহুলা ডোমনীর ছদ্মবেশে চাঁদ সদাগরের বাড়ীতে এসে অন্ন ভিক্ষা করল। সনকা তাকে খেতে দিলে ঃ

"ডোমনী বলেন মাঅ আমরা নীচ জাত্যে।
তোমার সাক্ষাতে অন্ন ভুঞ্জিব কেমতে।।"[৫৪]

এরকম অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মনসা-চণ্ডী ধর্মমঙ্গল ও শিবায়ন কাব্যে, যা থেকে তৎকালীন সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী মানুষের শ্রেণীগত দ্বন্দ ও বৃত্তি সম্পর্কে অনায়াসেই জানতে পারা যায়।

শুধু হিন্দু নয়, মঙ্গল কাব্যে মুসলমানদেরও বিভিন্ন পেশাগত স্তর বিন্যাস রয়েছে। যেমনঃ

"রোজা নামাজ করি কেহ হইল গোলা।
তাসন করিযা নাম বলাইল জোলা।।
বলদ কহিয়া কেহ বলায় মুকেরি ।
পিঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠারি ।।
মৎস বেচি নাম কেহ ধরাল কাবাড়ি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি বাখে দাড়ি।।
হিন্দু হযে মুসলমান হয গরসাল।
নিশা কালে ভিক্ষা মাগে না ধরে কাল ।।
সানা কান্ধি নাম বলাইল মালাকার।
জীবন উপায় তার পেয়ে তাঁতি ঘর।।
পট পড়িয়া বুলে কেহ নগরে নগর।
তীরকর হয়ে কেহ নিরাময় শর।।
সুন্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম।
সহরে সহরে ফিরে নাকরে বিশ্রাম।।
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।
নেয়াল বুনিয়া নাম বলায় বেনটা।।
নানা বৃত্তি করিয়া বমিন মুসলমান।
সাবধান হয়ে শুন হিন্দুর বাখান ।।"[৫৫]

মঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের বাঙালি নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের চিত্র খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। গার্হস্থ ধর্ম ও বর্ণাশ্রমের শাসনে মধ্যযুগীয় নারীরা নিস্প্রভ হয়ে থাকলেও মাঝে মাঝেই তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে নানা ধরণের কাজ কর্মে পুরুষের সাথে সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। পন্য বিক্রী করা, খেয়া পার করা, চাষাবাদ করা, গৃহপালিত পশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করা থেকে শুরু করে যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত প্রায়

সবকিছুতেই নারীরা নিজেকে নিয়োজিত করেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি যে ফুল্লরা বাজারে বাজারে মাংস বিক্রি করে। শুধু ফুল্লরা কেন তার শাশুড়ি নিদয়াও বাজারে পন্য কেনা বেচা করত। মেয়েদের এই পন্য কেনা-বেচার চিত্র মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

''নিদযা বসিযা খাটে মাংস লযে গেলাহাটে
অনুদিন বেচযে ফুল্লরা।
শাশুডি যেমত ভনে সেইমত বেচে কিনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা ।
মাংস বেচি লয় কড়ি চাললয় দাল বড়ি
তৈল নোন কিনয়ে বেসাতি ।
শাক বেগুন কচু মূলা এঁটে খোড় কাঁচকলা
নানা সজ্জ ভরে আনি পাঁতি ।।''[৩৬]

শুধু পন্য কেনা-বেচাই নয়, সেই সময় নারীরা খেয়াও পারাপার করত - 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে সরজা ডোমনীর মাধ্যমে তার প্রমাণ মেলে। 'শিবায়ন' কাব্যে দেখি চাষা শিবের সাথে পার্ব্বতী সমানভাবে চাষাবাদ করছেন। আর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের নারী তো সবার উপরে। তারা পুরুষের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহেও সমানভাবে অংশ নিয়েছে। এগুলো ছাড়াও সমাজের আরো বহুমাত্রিক চিত্র আছে যেগুলো মঙ্গলকাব্য গুলোতে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হযেছে। সমাজে তখন বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। বাল্য বয়সে বিযে না দিতে পারলে মেযের বাবাকে লোকে গঞ্জনা দিত। কারণ তখনকার লোক মানসে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে সাত বৎসরের মেয়েকে বিয়ে দিলে গৌরী দানের পূণ্যলাভ করা যায়। বারো বছর বয়স পর্যন্ত বাল্য বিবাহের সময় সীমা ধরে নেয়া হত। তাই বারো বছরের অধিক বয়সের মেয়েকে ঘরে রাখলে সেই পরিবারকে 'এক ঘরে করে দেওয়া হত'।

''বার বৎসরের কন্যা জেবা রাখে ঘরে।
ব্রাহ্মণে না খায় জল কুটুম্বে ছল ধরে।।''[৩৭]

তাই সামাজিক শাস্তি এড়ানোর জন্য প্রায়শঃই অসম বয়সে বিয়ে হত। বয়সে দ্বিগুন কিংবা তিনগুণ বড় পুরুষের সাথেও ছোট ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। ফলে অতি অল্প বয়সে বৈধব্য প্রাপ্তা হত সেই মেয়েরা। কখনো কখনো সহমরণের নামে মৃত স্বামীর চিতায় তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত, যারা জীবনটাকে হয়ত তখনো ভালভাবে বুঝেই উঠতে পারেনি। অবশ্য অনেক সময় মেয়েরা নিজের ইচ্ছাতেই সহমরণে যেত। চণ্ডীমঙ্গলে ছায়ার সহমরণ, ধর্মমঙ্গলে কর্ণসেনের ছয়পুত্র বধু নিজেদের ইচ্ছাতেই সতী হয়েছিলেন। মধ্যযুগে বাল্য বিবাহের সাথে বহু বিবাহের প্রচলনও ছিল। এক একজন কুলীন স্বামীর অনেক পত্নী থাকতো। কখনো কারণে আবার কখনো বিনা কারণেই অনেকগুলো বিয়ে করতেন তারা।

সেই সময় সমাজে একটা বিশ্বাস ছিল ভাবীবংশ ধর পুত্রের জন্যই বিবাহ। তাই এক স্ত্রীর পুত্র সন্তান না হলে অবলীলায় দ্বিতীযবার বিয়ে করা যেত। কেননা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য পুত্রের ক্রিয়া কর্ম ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যে অন্তত তারই ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

"বাজা বলে শুনহ লক্ষের সদাগর।
দ্বিতীয় বিবাহ করি বংশ রক্ষা কর।।"[৫৮]

আর এরপরও যদি কেউ অপুত্রক থাকত, তাহলে তার জীবন বিফল বলেই গণ্য হত। লোকে তাকে অবজ্ঞা করত অশ্রদ্ধা করত। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে পুত্রহীন জীবনের বেদনার কথা এভাবেই ব্যক্ত হয়েছেঃ

"হাহাকাব কবে তার পিতৃ লোকগন।
পুত্রবিনা পিণ্ডবাদ প্রধান তর্পন।।
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রয।
আটকুড়া লোকে বলে মুখে নাহি চায।।"[৫৯]

ষোড়শ শতাব্দীতে কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি ঘটে ছিল। যার ফলস্বরূপ সমাজে দেখা দিয়েছিলো চুরি-ডাকাতি-রাহাযানি ও লুণ্ঠনের ব্যাপক প্রবণতা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি তাই বলেছেন ঃ

"পসরা লুটিযা ভাড়ু পূরয়ে চুবড়ি।
যত দ্রব্য লয় ভাড়ু নাহি দেয কড়ি।
লণ্ড ভণ্ডে গালি দেয় বলে শালা শালা ।
আমি মহামণ্ডল আমার লাগে তোলা।।"[৬০]

তাছাড়া সেই সময় সমাজে পর্তুগীজ জলদুস্য 'আরমাদা' দেয় ভয়ও ছিল যথেষ্ট। ধনপতি সদাগর সিংহল যাত্রার পথে 'ফিরাঙ্গির' দেশ অতিক্রম করলেন হারমাদের ভয়ে। হারমাদই হলো পর্তুগীজ জলদস্যু 'আরমাদা'। এরা দিনে ডাকাতি করত। জলপথের মত স্থলপথও তখন ততটা নিরাপদ ছিল না। ঠগী পিণ্ডারীদের মত এদেশেও স্থল পথে বাটপাড়ের উপদ্রব ছিল। এরা পথিকের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে উল্লিখিত রূপরায় এমনই এক বাটপার যে কবি মুকুন্দের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গিয়েছিল।

মধ্যযুগের চিকিৎসা ব্যবস্থারও কিছু কিছু চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। সেই সময় চিকিৎসা কার্যে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে বৈদ্য বলা হত। 'চণ্ডী মঙ্গল' কাব্যে তাদের কথা এভাবে বলা হয়েছেঃ

"ফিরে তারা গুজরাটে শোলঙ্গে পীলিহাকাটে
ছান কাটে চক্ষে দিয়ে কাঁটা।"[৬১]

বৈদ্য ছাড়া আরেক শ্রেণীর চিকিৎসকের উল্লেখ পাওয়া যায় মঙ্গল কাব্যে তারা হলেন ধন্বন্তরী ওঝা। জলাভূমি বাংলায় সাপেড় কামড়ে প্রতি বছর প্রচুর লোক মারা যেত। তাই

সর্প বিষ নাশের জন্যই মূলত এরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সেই সময সাপের কামড়ের রোগীর বিষ নাশের জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হত শল্য-বিশল্য বৃক্ষ। এই বৃক্ষের পরিচয দিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"লোহিত তাহাব ডাল চিবল চিবল পাতা
বিশেষ কহিলাম সেই ঔষধের কথা ।"[৬২]

আর এই বৃক্ষের বিষনাশক ক্ষমতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"ওঝা বোলে কুকুডাক শুয়া অ গবল।
পর্ব্বতে নিযা ফির প্রতি গাছের তল।।
যেই গাছেব গন্ধে কুকুড়া পায প্রাণ ।
সেই গাছে আন বাপু মোর বিদ্যমান।।
ওঝার বচনে বলে এক শত শিষ ।
কুকুরা পক্ষকমারে খুআইআ বিষ ।।
শাতালি পর্ব্বত বান উদেশিয়া যায ।
প্রতিগাছে গাছে মরা কুকুড়া ছোযায।।
কুকুড়া পাইল প্রাণ ঔষধের গন্ধে।
সেই গাছ তোলে শিষ্য পরম আনন্দে।।"[৬৩]

এছাড়াও সাপের কামড়ের রোগীর বিষনাশের জন্য কবিরাজ-ওঝারা মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাঁড়-ফুঁক, চড়-চাপড় ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। চড়-চাপড়ে বিষ নামানোর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বলেছেন ঃ

"এক এক চাপরমারে এক এক জনার গায়।
নিদ্রাভঙ্গ হইযা তারা চারিদিকে চায়।।"[৬৪]

সর্পদংশনের চিকিৎসা ছাড়া আরো বিভিন্ন লোক চিকিৎসার পরিচয় দিয়েছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁর 'শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন' কাব্যে।

মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্য, পরিধেয়, বিনোদন, যান বাহন, বাসস্থান সবকিছুরই উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে। যার মাধ্যমে তৎকালীন বাঙালির দৈনন্দিন জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালির প্রধান খাদ্যের মধ্যে রয়েছে ভাত, মাছ, দুধ, ফলমূল প্রভৃতি। এর কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে বাংলায় ধানের চেয়ে গমের ফলন অপেক্ষাকৃত কম আর বাঙালিরা গম বা রুটি খেতে বিশেষ পছন্দও করতেন না। তাই বাঙালিরা ভাতকেই প্রধান খাদ্য হিসেবে পছন্দ করতেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের ধানের ফলনও প্রচুর ছিল। রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে এরকম অনেক ধানের উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ কামিনী, পূণ্যভোগ, পারিজাত, জামাইনাড়ু, নীলাবতী, খয়ের শালী, কনকচূড় প্রভৃতি। বাঙালিরা ভাতে 'ঘি' খেত। আর ভাতের সাথে বিভিন্ন ধরণের ব্যঞ্জন খাওয়ার প্রচলনও ছিল। বিশেষ করে নিরামিষাশীরাই প্রচুর পরিমাণে ব্যঞ্জন খেত। সুক্ত

থেকে শুরু করে লাউ, নাল্‌তেশাক, মোচা, কুমড়ো, কচু, কাঁচকলা, সিম, পটল, পুঁই, কলমীশাক, পালংশাক, বাথুয়া, পলতা, পুঁই, হেলঞ্চ, বনতা, মেথী, নটেশাক, সরিষা শাক প্রভৃতি, তার সাথে মুসুরি, কালাই, ছোলা, অড়হর, মটর প্রভৃতি ডাল। তেঁতুল, কুল, আমড়া, প্রভৃতি দিযে অম্বল ছিল বাঙালির প্রিয় খাবার। মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, কই, চিতল, শোল, বোয়াল, মাগুর, ইলিশ, চিংড়ি, রিটা, পুটি, পাবদা, চেলা, বাঁশপাতা, ভেদা, খুলিশা, ডেকুট প্রভৃতি। এই সমস্ত মাছ বিভিন্ন তরকারীর সাথে রান্না করলে উত্তম যেসব ব্যঞ্জন তৈরী হত তার পরিচয় পাওয়া যায় বংশীবদন দাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে ঃ

''বড় বড় কৈ মৎস ঘন ঘন আঞ্জি

কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি
চিতলের কোল ভাজে বসবাস মাখি।।
ইলিশ তলিত করে বাচা ও বাঙ্গনা ।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল পোনা।।
বড় বড় ইচা মৎস্য করিল তলিত ।
রিঠা পুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত।।
বেত আগ পলিযা চুঁচুরা মৎস্য দিয়া।
শুকতা ব্যঞ্জন রান্ধে আদা বাটিয়া ।।
পাবতা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।
পুরান কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল ।।

বাগুন দ্বিখণ্ড করি তাত লাউ যোগ।
মাগুর মৎস্য সহ রান্ধে কোঞর ভোগ।।
নবীন কুমড়া দিযা কই মৎস্য সনে।
নিপুল বাইয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধনে।।''[৬৬]

মৎস্য প্রিয় বাঙালি মাংস প্রিয়ও ছিল। মাংসের তালিকার মধ্যে আছে হরিণ, পাঁঠা, কবুতর কচ্ছপ প্রভৃতি। দ্বিজবংশীদাসের রচনায় বাঙালির মাংস রান্নার বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

''কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্বা দিয়া ।
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাকিয়া ।।
কৈতরের বাচ্চা ভাজে কাউঠার হাতা,
ভাজিছে খাসীর তৈল দিয়া তেজ পাতা
ধনিয়া সলুপাবাটি দারু চিনি যতো ।
মৃগ মাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত ।।
রান্ধিছে পাঁঠার মাংস দিয়া খর ঝাল ।
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল ।''[৬৫]

বিচিত্র ধরণের পিঠা তৈরীতেও বাঙালি যথেষ্ট পটু ছিল। চালের গুড়োর সাথে, দুধ, চিনি কিংবা গুড়, নারিকেল প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরী করা হত বিচিত্র ধরণের পিঠে। এছাড়া অন্যান্য উপকরণ দিযেও বিচিত্র পিঠে তৈরী করা হত। যেমন ঃ তাল পিঠা তিল পিঠা, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরপুলি, নারিকেল পুলি, পাতাপিঠা, চিতর পিঠা, কাঁচবড়া ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন যেমন ঃ দই, মাখন, ছানা, ঘি, পায়স, সন্দেশ, রসগোল্লা সেকালের বাঙালির প্রিয় খাবার ছিল।

মধ্যযুগে প্রচলিত অনেক পোষাক পরিচ্ছদের উল্লেখ আছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। সে সময় হিন্দু পুরুষরা সাধারণত ধুতি ও চাদর পরত এবং মুসলমান পুরুষেরা কুর্তা পরত, মাথায় পরত টুপী। মুসলিম মেয়েরা পরত ইজার এবং হিন্দু মেযেরা অবশ্যই শাড়ী পরত। তবে মুসলমান মেয়েদের শাড়ী পরার উল্লেখও আছে। বিজয় গুপ্তের 'মনাসমঙ্গল' কাব্যে পুরুষদেব তিনখণ্ড পরিধেয বস্ত্রের উল্লখে আছে। একটি পরণের, একটি মাথার পাগড়ির আকারের আর আরেকটি গায়ে থাকতো উড়ুলির মতো। মেয়েদের বক্ষ আবরণী হিসাবে কোথাও কোথাও কাঁচুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদেশী পরিব্রাজক স্টাভোরিনাম বাঙালি মেযেদের সাযা পেটিকোট পরার খবর দিয়েছেন। আর বিধবা মেযেরা সরল সাদাসিদে পোশাক পরত। বস্ত্র পরার ক্ষেত্রে কিছু শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের ব্যাপারও ছিল সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থায।

''শুদ্র না হইযা যেবা নীলবস্ত্র পবে।
তুমি না তরাইলে বাছা সেই পাপ ধরে।।''[৬৭]

তাছাড়াও বস্ত্র পরার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের ভেদ সুস্পষ্ট ছিল, কারণ বস্ত্র পরার ক্ষেত্রে দরিদ্রের বিলাসিতার কোন সুযোগ ছিল না। ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করার জন্যই তাদের আয়ের অধিক অংশ চলে যেত, তাই অনেক সময় ছেঁড়া কাপড় পরেই লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করত। এই দারিদ্র্যের ছবি আমরা দেখি 'শিবায়ন' কাব্যে। 'গৌরীর বাল্য খেলা' অংশে লক্ষী-নারায়ণের বিয়ে উপলক্ষে বর কন্যা বিদায় অংশে গৌরী বলেছেন ঃ

''আঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর্যা ভাত।''[৬৮]

এটাই মধ্যযুগের বাস্তবতা। দারিদ্র্য পিড়ীত বাঙালির কাছে এইটুকু চাওয়াই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদার কাছে এরকমই বর প্রার্থনা করেছিল। কোন সুখ নয়, ঐশ্বর্য নয় তার চাওয়া শুধু, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। সেবাস্টিয়ান মানরিক তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাদ্বারা বাঙালির পোষাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> ''দেড়হাত বা দুহাত কাপড় পুরুষের পরিধেয়, যা কোমর থেকে নীচের দিকে ঝোলে আর তাদের মাথায় বাঁধা থাকে বারো থেকে চৌদ্দ বিঘৎ লম্বা কাপড়। অন্যদিকে মেয়েরা যে একখানি কাপড়ে সমস্ত শরীরটাকে পেঁচিয়ে রাখতো, সেটির দৈর্ঘ্য আঠারো থেকে কুড়ি বিঘৎ অর্থাৎ প্রায় দশহাত।''[৬৯]

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 'শিবায়ন' কাব্যে বাগ্‌দিনীর বস্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনেকটাই সেবাস্টিয়ানের বর্ণনার অনুরূপ। কাব্যে পাই ঃ

"দুহাতে দুগাজি মেটে কাপড় পরেছে এঁটে
খাট করি হাটুর উপর।"[১০]

মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে তৎকালীন সমাজের শিক্ষ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হিন্দু ছেলে-মেয়েরা তখন টোল পাঠশালা ও চতুষ্পাঠি তে পড়ালেখা করত। তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণরা বাড়িতে টোল খুলে ছাত্রদের পড়া লেখা শেখাতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র এই সকল টোলে শিক্ষা দেওয়া হত। শুধু জ্যোতিষশাস্ত্রই নয় জ্যোর্তিবিদ্যাও পাঠ্য সূচিতে ছিল। টোলের পাঠ্যসূচি সম্পর্কে মুকুন্দ জানিয়েছেন ঃ

"পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝায়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রি দিন করিয়া ভাবনা।
নিবিষ্ট করিয়া মোন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যাবিনে নহে অন্য কথা।।
রক্ষিত পঞ্জিকা টিকা ন্যায় কোষ নানা শিক্ষা
গন বৃত্তি বর্দ্ধজে দেমনা।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব পড়িল উজ্জ্বল দত্ত
ছন্দ পড়ি বাড়িল মাননা।।
পড়িল দুঘট বৃত্তি বিরসভা পূর্ববর্তী
নিরন্তর করয়ে বিচার।
রাত্রিদিন জত্নবান পড়ে ভট্টী অভিধান
পুথি সোধে বিবিধ প্রকার।"[১১]

তাছাড়া 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে একজন গুরু দশ বারো দিনের মধ্যেই বর্ণ পরিচয় সহ শিক্ষার্থীকে লেখা শিখাতে সক্ষম হতেন। কবির বর্ণনায় পাই ঃ

"আকারাদি খকারান্ত যে যে বর্ণগুলি।
ক্রমিক হইতে ভূমে লেখাইয়া সকলি।।
বড় পুত্র ধর্মের ধীষণা ব্যয় হয়।
অনায়াসে দিন দশে বর্ণ পরিচয়।।"[১২]

বর্ণপরিচয়ের পর যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ এবং বানান পদ্ধতি ঃ

"ক-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখিদিল ক্ষিতি তলে
প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দন।
চ বর্গ ট বর্গ যথ পড়িলেক শ্রীয়মন্ত

অন্ত স্বযে প্রবেশিল মন।।
ক্য ক্র ক্ল আদি ক্ক ক্ষ্ম অবধি
রেফ যুক্ত পড়ে যথ ফলা।
ক্র ক্ল আঙ্ক আস্ক অং পড়ে সিদ্ধি শেষে
বানানে পারগ হইল বালা।।''[১৩]

অবশেষে শুরু হল ব্যাকরণ শিক্ষা ঃ

''পূজা করি সরস্বতী আরম্ভ কবিল পুথি
জানিবারে সন্ধির প্রকার।
সূত্রর সন্ধি করিয়া সুসম পন্থেতে গিয়া
শব্দ সন্ধি জানিল অপার।।
চণ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু
দীপিকায়ে জানিল কারণ।।
ষত্ব নত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা কহে
পারগ হইল ব্যাকরণ।''[১৪]

এছাড়া 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লাউসেনের সমরবিদ্যা শিক্ষার পরিচযও বিদ্যমান ঃ

''শাস্ত্র বিদ্যা শিখি কুমার হৈল পণ্ডিত।
রাজপুত হই অস্ত্র নাজানে কিঞ্চিত।।
অস্ত্র শিখিবারে দিল অস্ত্র গুরু স্থান।
মহামন্ত্র শিখিলেন ইন্দ্রের সমান।।''[১৫]

এ-তো গেল হিন্দু সমাজের শিক্ষা পদ্ধতির কথা। এবার মুসলিম সমাজের শিক্ষা পদ্ধতি নিযে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মুসলমান সমাজের ছেলে মেয়েরা মক্তবে পড়াশুনা করত। মক্তবে 'মৌলবি' সাহেব ধর্ম-গ্রন্থই পড়াতেন। তাদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে কবিকঙ্কন লিখেছেন ঃ

''যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান
সখদম পড়ায় পঠন।''[১৬]

মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি। তবে আরবির সাথে অন্যান্য ভাষাও শেখানো হতো। এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্য প্রনিধান যোগ্য ঃ

''এ দেশের মুসলমান ছেলে মেয়েরা আরবির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি এবং দেশীয় ভাষা বাংলা শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব দিত।''[১৭]

আর মকতব এবং পাঠশালায় অঙ্কও শেখানো হত। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

''যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং কড়াকিয়া, কাঠাকিয়া, বিঘাকিয়া শিক্ষালাভ

করা ছিল প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের পাঠ্য সূচী ।''[৩৮]

মক্তব ছাড়া বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুল, মসজিদ এবং ইমাম বাড়াতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেওয়া হত।

তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল । তবে মেয়েরা প্রাথমিক স্তর পর্যন্তই পড়াশুনা করতে পারত। কারণ হিন্দু সমাজে গৌরী দানের পূণ্য লাভের লোভে অধিকাংশ মেয়েদেরই ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত । আর যাদের একটু বয়সে বিয়ে হত তাদের ক্ষেত্রেও পারিবারিক অবরোধ ছিল। আর মুসলমান মেয়েদের বিয়েও খুব ছোটবেলায় দিয়ে দেওয়া হত। তাই উভয় সমাজেই মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত ছিল। তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতেন। সে যাইহোক না কেন সেকালে সমাজে প্রায় সকল শ্রেণীর মেয়েরাই কম বেশি লেখা পড়া জানতো। এমন কি সমাজে একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত ব্যাধ সমাজের মেয়েরাও লেখাপড়া জানতো। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ব্যাধ কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরা যে লেখাপড়া জানতো তার পরিচয় ফুল্লরার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে ঃ

ভারত পুরানক্রমে শুনেছি পণ্ডিত ধামে
অবনীতে দারা বেদবতী।
জানিলে জানিত পারো বলিলে বচন ধর
যে রূপে পালিল স্বামী সতী ।[৩৯]

এছাড়াও খুল্লনা, লীলাবতী, দুর্বলা দাসীরা যে লেখাপড়া জানতো তার প্রমাণও কাব্যে পাওয়া যায়। পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া কারু শিল্পেও সেই সময়ের মেয়েরা যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। কেতকা দাস-ক্ষেমানন্দের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে কাজলামাল্যানীর টোপর নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের সেই দক্ষতার পরিচয় মেলে ঃ

''কাজলা আনিয়া সাধু তারি দিলাপান।
কাজলা মাল্যানী করে টোপর নির্মাণ।।
নানা চিত্র লিখে তাহে লিখে নানা ফুল।
সোনার টোপর রূপে যেন সমতুল।।
একে এক লিখে তাহে যতেক দেবতা।
হংস বাহনে লিখে চতুর্ম্মুখ ধাতা।।
বৃষে কাশীচুর লিখে গড়ুরে গোবিন্দ।
হাটনে পবন লিখে ঐরাবতে বিন্দু।।
কুবের বরুণ সম দশদিক নাল।
গগন পবন ঘোর নন্দী মহাকাল।।'' [৪০]

নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। তাই যাতায়াতের ক্ষেত্রে স্থলপথ থেকে জল পথই বেশী ব্যবহৃত হত। জলপথে যাতায়াতের জন্য নৌকাই সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম ছিল। করা, কোসা,

ডিঙ্গি, সাম্পান প্রভৃতি বিশ-পঁচিশ ধরণের নৌকা বাংলার নদী নালা খাল বিলেভেসে বেড়াত। মাঝে-মাঝে কলারমান্দাস বা ভেলার ব্যবহারও লক্ষণীয় ছিল।

এ তো গেল জলপথের বিবরণ। স্থলপথে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি। গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলনও লক্ষ্যণীয। উটের ব্যবহারও ছিল। এছাড়া পাল্‌কি ব্যবহারের রেওয়াজও ছিল। কিন্তু তা সাধারণের জন্য নয়, জমিদার শ্রেণী বা ঐরকম মর্যাদায যারা ভূষিত তারাই পাল্‌কি ব্যবহার করত।

মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত যে সমাজ, সেই সমাজের মানুষের বাসস্থান কি রকম ছিল তা জানার আগ্রহ অবশ্যই সকলের আছে। আমরা জানি যে ঐ সময়ে ইট পাথরের পাকা বাড়ীর ব্যবহার খুব কম ছিল। রাজা-রাজ্‌ড়া বা মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি ছাড়া কারোরই পাকা বাড়ি ছিল না। সাধারণ মানুষ বাঁশ, কাঠ, বেত, খড়, হোগলা এবং মাটির দেয়াল দিযে তৈরী ঘরই বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করত। আর এই সকল ঘরের চালের ছাউনির জন্য ব্যবহার করা হত খড়, গোলপাতা বা তালপাতা। দোচালা থেকে আটচালা পর্য্যন্ত ঘর সেকালে তৈরি হত। এই ঘরগুলো 'বাংলার ঘর' হিসেবেই পরিচিত ছিল, আর এই ঘর গুলো দুতলা থেকে তেতলা পর্য্যন্ত হত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এরকম পাতার ছাওনির ঘরের উল্লেখ আছে-

> ''পাশেতে বসিযা বামা কহে দুঃখ বাণী।
> ভাংগা কুড়্যা ঘর কানি পত্রের ছাওনি।।
> ভেবাণ্ডার থাম তাব আছে মধ্যে ঘবে।
> প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।।''[৮১]

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরেক ধরণের ঘরের প্রচলন ছিল, সে গুলোকে 'জল টুঙ্গিঘর' বলা হত। দিঘির মধ্যে খুঁটি পুঁতে 'জলটুঙ্গিঘর' তৈরি করা হত। এছাড়া শয্যার উপকরণ ও গৃহস্থালীর আসবাব পত্রেরও উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। খাট, পালঙ্ক থেকে শুরু করে লেপ, মশারি, তোষক, তামার হাড়ি, পিতলের কলস, পাথরের বাসন, পর্য্যন্ত। আর তারই পাশাপাশি দরিদ্রের সংসারে আসবাব হীন অবস্থায় কোন ভাবে দিন গুজরানের চেষ্টাও লক্ষ করা যায়।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় যে 'মঙ্গলকাব্য' গুলো সেকালের সামাজিক দলিল, সমকালীন সমাজ জীবনের একটি বাস্তব চিত্র। সাহিত্যিক চান বা না চান যেহেতু তিনি সামাজিক মানুষ, তাই তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সামাজিক চিন্তা চৈতন্যের প্রকাশ ঘটবেই এটাই স্বাভাবিক। আর যে সাহিত্য আখ্যান ধর্মী, সেরকম সাহিত্যে সমাজ না এসে পারে না । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্যঃ

> **''একজন লেখকের রচনায় প্রধানত তার দেখা সমাজই চিত্রিত হয়, তার নিজের জানা শোনা সমাজের বিষয়িক ও মানসিক দিক গুলি ধরা পড়ে।''** [৮২]

মঙ্গলকাব্যেও তা-ই ঘটেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মঙ্গলকাব্যের লোকজীবন

আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু 'মঙ্গলকাব্যের লোকজীবন' তাই আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে 'লোকজীবন' শব্দটিকে একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। 'লোকজীবন' শব্দটি দুটি পৃথক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত যথাক্রমে 'লোক' ও 'জীবন'। 'লোক' বলতে সাধারণত বোঝায় 'জন' বা 'মানুষ'। আর জীবন বলতে ইংরেজী 'লাইফ' কে বুঝায়। কিন্তু এখানে 'লোক' বলতে কোন একজন মানুষকে নির্দেশ করছে না, এমন একদল মানুষকে বোঝাচ্ছে যারা ঃ

> ''সংহত একটি সমাজের বাসিন্দা, অর্থাৎ নিদৃষ্ট একটি ভূখণ্ডে তারা বসবাস করে। জন্ম থেকে মৃত্যু এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে এক ধরণের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সর্বোপরি তাদের আর্থিক পরিকাঠামোও প্রায় একই রকম।''[১]

আর জীবন বলতে এখানে দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে বুঝাচ্ছে। আরো বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে,

> ''লোকজীবনকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠে তাকে বলা হয় Folk Society। Folk অর্থে উন্নততর সমাজের প্রান্তবর্তী অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পৃথক জনসমষ্টিকে বোঝায়। আর এই জন সমষ্টির সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিকেই লোকজীবন বলে চিহ্নিত করা যায়।''[২]

এই লোকজীবন তথা বাঙালি জনপদের জীবনাচরণের রেখা চিত্রই ফুটে উঠেছে মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে।

মঙ্গলকাব্য এমন একটি সাহিত্য ধারা যার মধ্যে বাঙালির লোকজীবনের খুঁটিনাটি পরিচয় খুব বাস্তবতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। এই মঙ্গলকাব্যে চিত্রিত যে সমাজ, তা নিঃ সন্দেহে লোকায়ত বাঙালি সমাজ। গোটা একটা সমাজ যখন সাহিত্যে স্থান পায়, তখন সেই সমাজের সাথে সাথে সেই সমাজের মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, তাদের কৃষ্টি এগুলো যে উঠে আসবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে তাই আমরা দেখি যে, সেখানে যে সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তাতে সেই সমাজের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা বাস্তবভাবে চিত্রিত হয়েছে। দেবদেবীর লীলা মাহাত্ম্য বর্ণিত এই মঙ্গলকাব্যগুলোর সৃষ্টি নিহিত রয়েছে লোক সংস্কৃতির বহুব্যাপ্ত পরিধির মধ্যে, কারণ লোকসংস্কৃতির লোকায়ত

ধারাকে অবলম্বন করেই মঙ্গলকাব্যের প্রথম জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ছড়া-ব্রতকথা-পাঁচালি-লোককথা এবং সেই লোকায়ত মানুষের রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসবাদি ছিল মঙ্গলকাব্য রচনার উৎসমূলে। এরই সাথে লোকায়ত ঐতিহ্যের পরম্পরাগত রূপটি যেমন ঃ লোকক্রিড়া, লোকবাদ্য, লোকযান, ধাঁধা, হেঁয়ালি প্রভৃতির উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায় মঙ্গলকাব্যে। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমেও চিরন্তন বাঙালি লোকজীবনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বাংলা মঙ্গলকাব্যকে 'প্রাকৃতজনের শিল্প সম্ভার'[১] হিসাবেও গণ্য করা হয়।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের সমাজ মূলত ছিল লৌকিক সমাজ। প্রতিটি মঙ্গল কাব্যেই তাই তৎকালীন শ্রেণী বিভক্ত লোক জীবনের বাস্তবচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই শ্রেণি বিভাজনে ক্ষমতা, পেশাগত মর্যাদা, সম্পদ, শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্মীয়-আচার-অনুষ্ঠান মূলক পবিত্রতা, পরিবার ও জাতিগোষ্ঠীর পদমর্যাদা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক মর্যাদাকে সাধারণমান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে সামাজিক স্তর বিন্যাসে সমাজবিজ্ঞানীরা চারটি প্রধান ধরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো যথাক্রমে (১) দাস প্রথা (২) মধ্যযুগীয় এস্টেট (৩) জাতি-বর্ণ-প্রথা এবং (৪) সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ও মর্যাদা। মঙ্গলকাব্য গুলোতে মূলত দুই ধরণের সামাজিক স্তর বিন্যাস লক্ষ্যণীয় যেমন ঃ (১) জাতি-বর্ণ প্রথা (২) সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ও মর্যাদা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল-বেরুণী তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এদেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ও বৈশ্যরা হলো উচ্চ শ্রেণিভুক্ত, আর মেহনতী মানুষ হচ্ছে নিম্ন শ্রেণিভুক্ত। এই নিম্ন শ্রেণির মানুষ গুলোকে কোন বিশেষ বর্ণ হিসাবে গণ্য করা হয় না, পেশা বা জীবিকাই এদের বর্ণ। সমাজে এরা অন্ত্যজ বা 'লোক'। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সেবা করাই এদের কাজ। মধ্যযুগে এই স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিক কালের মত অর্থ-প্রধান ভূমিকা নেয়নি, অর্থের চেয়ে জাতি-বর্ণই তখন মুখ্য ভূমিকা পালন করত। মানুষের চিন্তায়-চেতনায়ও এই জাতিভেদ প্রথা প্রবল ভাবে বাসা বেঁধে ছিল, তাই চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেখি যে রাজা হওয়া প্রায় নিশ্চিত জেনেও কালকেতুর মনে সংশয় ছিলঃ

> "চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন
> নগরের মাঝে দেহ আমার ভবন।।
> পূজিও মঙ্গলবারে করাইও জাত।
> গুজরাট নগরেতে তুমি হবে নাথ।।
> এমন শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন।
> কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন।।
> আমি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
> কেহ না পরশে জল লোকে বলে রাঢ়।।
> পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ।
> নীচ কি উত্তম হয় পাইলে বহুধন।।"[৩]

মঙ্গলকাব্যে 'লোক' বলতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা হল ঃ ডোম, হাড়ি, মালাকার, যাজক, জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, ফকির, মহাজন, মালী, বারুই, বৈদ্য, নাপিত, গোপ মোদক, তেলি, গন্ধবণিক, ঘটক, কাঠুরিয়া, যোগী, গণক, চাষী, কামার, তাম্বুলি, কুম্ভকার, তন্তুরায়, শঙ্খবণিক, মনিবণিক, দরজি, কাঁসারি, শিউলি, সুবর্ণবণিক, ছুতার, কলু, পাটনি, মাটিয়া, জগাডাট, ধোপা পসারী, দাবী, চামার, বারবণিতা, চালুয়াতি, ময়রা, নাবিক, মালাধর ব্যাধ ইত্যাদি । চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি মুকুন্দ এদের সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

মৎস্য মারে চষে চাষ দুই জাতি বসে দাস
নগরে ফিরায় কলু ঘানি।
বাইতি নিবসে পুরে নানাবিধ বাদ্য করে
নগরে মাদুরি বিকি কিনি।
বাগদি নিবসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জালবুনে মৎস ধরে
কোঁচগণ বসে লীলা রঙ্গে।
নগর করিযা শোভা বসিল অনেক ধোবা
দড়ায় শুকায় নান বাস।
দরজী কাপড় সিঁয়ে বেতন করিয়া জীয়ে
গুজরাটে বসে একপাশ।
সিউলি নগরে বসে খেজুরের কাটি রসে
গুড় করে বিবিধ বিধান ।
ছুতার হাটের মাঝে চিড়াকুটে খই ভাজে
কেহ করে চিত্র নিরমাণ।
মোজা পানই আব-জিন নিরময়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে।
বিউনি চালনী ঝাঁটা ডোম গড়ে টোকা ছাতা
জীবিকার হেতু এক চিতে।[৪]

'লোক' শব্দের আক্ষরিক পরিভাষায় এরাই লোক, তাই এদের সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই আমাদের আলোচ্য।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে বাঙালি লোকজীবনের সজীব রূপটি সুন্দরভাবে ও যথেষ্ট বাস্তবতার সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কাব্যের আরাধ্যা দেবী মনসা লৌকিক দেবী । লোকসমাজেই তার অধিষ্ঠান। মনসাদেবীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অনেক সমালোচকই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সমালোচক ক্ষিতিমোহন সেন মনসা দেবীর উৎস সম্পর্কে বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের কানাড়ী 'মন্‌চা আম্মা'র সাথে মনসা নামের মিল রয়েছে।

'মঞ্চম্মা' প্রাদেশিক উচ্চারণে 'মন্চা আম্মা' অর্থাৎ মনচা মাতা। পরে মনচামাতা থেকেই মনসা মাতার উদ্ভব। 'মনচা অম্মা' দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সর্প দেবী। বাংলাদেশে এটি খুব সম্ভবত বহন করে এনেছিলেন কর্ণাটদেশীয় সেন রাজারা। কিন্তু সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেন ঃ

> ''যাহারা মনে করেন সেন রাজা গণের আনুকুল্যে বঙ্গদেশে মনসাদেবী নামে মনে-মঞ্চম্মাব পূজা প্রচারিত হয, তাহাদের এই যুক্তি সমর্থন করা যায না। অতএব সেন রাজাদিগের মধ্যস্থতায দক্ষিণাত্যের এই 'মঞ্চম্মা' নামটি বাংলাদেশে আসিযা মনসায় রূপান্তরিত হইযাছে তাহা বলিতে পাবা যায না।''[৫]

সমালোচক সুকুমার সেন কিন্তু পুরোপুরি অন্যভাবে বিষযটিকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর মতেঃ

> ''দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত কানাড়ী ভাষার 'মনচা আম্মা' বা 'মনে মাঞ্চী' হইতে মনসামা উৎপন্ন হয নাই। 'মনসা' হইতেই 'মনচা' আসিযাছে।[৬]

সে যাই হোক 'মনসা' যে লৌকিক দেবীরই সংস্কৃতনাম সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। কারণ প্রাচীন কোন সংস্কৃত অভিধানে কিংবা পানিনির ব্যাকরণেও 'মনসা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায না। রামাযণ-মহাভারত কিংবা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণ গুলিতেও 'মনসা' নামের কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তি কয়েকটি সংস্কৃত উপপুরাণ এবং অর্বাচীন কযেকটি সংস্কৃত অভিধানে 'মনসা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মনে করেন ঃ

> ''এই সকল পূরাণ এবং অভিধান কোনর্টিই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কালে রচিত নহে। অতএব মনে হয, খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতেই এই শব্দটি সংস্কৃত পূরাণ ও অভিধানে প্রবেশ করিয়াছে।''[৭]

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে মনসা কোন বৈদিক দেবতা নন। নিতান্ত লোকসমাজ থেকে উঠে আসা এক দেব চরিত্র। যে ভাবধারা ও পরিবেশে ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর পাশে লৌকিক দেব-দেবীর স্থান, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই লৌকিক দেবদেবী ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তন্ত্রে গৃহীত হয়, তাই তার মূল রূপটিও লোকায়ত মানসেই প্রথিত।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র দেবী চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক সমালোচকই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই দেবীচণ্ডীর উল্লেখ 'ব্রহ্মবৈবর্তপূরাণ', 'ভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপূরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পূরাণ', 'হরিবংশ', প্রভৃতিতে থাকার সূত্রে এর পৌরাণিক তথা ব্রাহ্মণ্য উৎসের প্রতি গুরুত্ব দেবার প্রয়াস অনেকেই করেছেন। সমালোচক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্যের মতে ঃ

> ''মঙ্গলচণ্ডীকে পৌরাণিক গোষ্ঠী বহির্ভূত লৌকিক দেবতা বলিয়া মনে করা অসঙ্গত। মঙ্গলচণ্ডী একসময়ে এদেশে প্রধান পৌরাণিক দেবীর সমান মর্যাদা পাইয়াও পূজিত হইতেন।''[৮]

কিন্তু তাব এইমত সঠিক বলে মেনে নেওযা যায না। কাবণ, 'মনসা'ব মত 'চণ্ডী'ব নামও শুধু মাত্র অর্বাচীন কালেব উপপুবাণ গুলিতেই পাওযা যায। বৈদিক সংহিতা, বামাযণ, মহাভাবত, বা প্রাচীন কোন পুবাণেই দেবী চণ্ডীব স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। তাছাডা মনে বাখা প্রযোজন যে মঙ্গলচণ্ডীব পূজা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ তাই পুবাণে এব উৎস অনুসন্ধান কবা অর্থহীন। কাবণ পুবাণ বাহিত হযে এটি বাংলায এলে এব উল্লেখ পাওযা যেত বাংলাদেশেব বাইবেও। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয তাই যথার্থই বলেছেন ঃ

''আর্যেতব কোন সমাজ হইতে এই নামটি (চণ্ডী) কালক্রমে পূর্বভাবতীয পৌবাণিক সাহিত্যে প্রবেশ লাভ কবিযাছে। চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত অর্থাৎ কোনও অনার্য ভাষা হইতে পববর্ত্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ কবিযাছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবত অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড ভাষা হইতে আগত।''[৯]

ড. সুকুমাব সেনও চণ্ডীব লৌকিক উৎসকে স্বীকাব কবেছেন। তাঁব মতে ঃ

''বিচিত্র লোক ভাবনাব পাকে জডাইযা পুবানো বাঙ্গলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গলেব অধিদেবী, মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিযাছিলেন।''[১০]

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তও এ প্রসঙ্গে মন্তব্য কবছেন, তাঁব মতে ঃ

''কালকেতুব কাহিনীব মধ্যে আবাব দেখিতেছি, ত্রযোদশ-চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশেব অতিমিশ্র প্রকৃতিব হিন্দুধর্মেব মধ্যে ব্যাধ জাতীয আদিম জাতিগুলিব প্রচলিত দেবী গণও কি কবিযা সমাজেব উচ্চস্তবে স্বীকৃতা চণ্ডীদেবীব সহিত অভিন্ন হইযা গিযাছেন। ইহাব মধ্য দিযা মর্ত্যে পূজা প্রচাবেব ইতিহাস দেখিনা, সে ইতিহাস তো সংস্কৃতে লিখিত পূবাণগুলিব মধ্যেই দেখিযাছি। এখানে দেখিতেছি নীচ ব্যাধ জাতিব মধ্যে প্রচলিত দেবীব মর্ত্যে পূজা প্রচাবেব ইতিহাস, এই ইতিহাস আসলে বাঙলাদেশেব একটা সমাজ বিবর্তনেব ইতিহাস। বাঙলাব বাঢ অঞ্চল আজিও বহু প্রকাবেব আদিম অধিবাসী অধ্যুষিত, এই আদিম অধিবাসীগণেব বিভিন্ন সমযে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটিযাছে। সেই অভ্যুত্থানেব মধ্য দিযা বাঙলাব জাতীয জীবনেব ভিতবে তাহাবা যেমন অবিচ্ছেদ্য অংশ বা উপাদান বলিযা স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদেব দেব দেবীগণও তেমনই উচ্চকোটি হিন্দুগণেব দেব সমাজেও স্বীকৃতিলাভ কবিতে লাগিলেন। সেই স্বীকৃতি লাভেব ভিতব দিযাই আদিম অধিবাসীগণেব দেব দেবীগণও পৌবাণিক দেবদেবীগণেব সঙ্গে নানা ভাবে মিলিযা মিশিযা অভিন্ন হইযা উঠিতে লাগিলেন।''[১১]

সমালোচক এই পৌবাণিক ও আদিবাসীদের দেবদেবীব যে মিলনেব কথা বলেছেন তা অনেকাংশেই সত্য। যে সময়ের কথা এখানে বলা হযেছে, সেই সময বাঢ় বাংলার সমাজে হিন্দু পুরাণগুলিব বেশি প্রচলন ঘটেছিল। যাব ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে পরিবর্ধিত হযে কবিরা কাব্য লিখেছেন দেশিয ভাষায। তাই সাহিত্য সৃষ্টিতে লোকাযত 'চাণ্ডী' দেবীর চণ্ডী হওযা একেবারেই অসম্ভব নয।

এতো গেল 'কালকেতু উপাখ্যান' এর দেবী চণ্ডীর উদ্ভবের কথা। এবার আলোচনা

করা যাক ধনপতি উপাখ্যানের দেবী চণ্ডীর উদ্ভবের কথা। এখানেও দেবী চণ্ডী বৈদিক নন। 'আখেটিক খণ্ডে' দেবী চণ্ডীকে দেখতে পাই ব্যাধ ও পশুর দেবতা হিসাবে, অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজে জন্ম নিয়ে দেবীচণ্ডী ক্রমশ সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু 'আখেটিক খণ্ডে বর্ণিত' পশুদেবতা চণ্ডীর সাথে 'বণিকখণ্ডে' বর্ণিত চণ্ডীর কোন সংযোগ নেই। এখানে অর্থাৎ ধনপতি সওদাগরের কাহিনিতে বর্ণিত দেবীচণ্ডীর লোকায়ত উৎস মূলত দুই ভাবে। যেমন ঃ (১) হারানো প্রাপ্তির দেবী রূপে (২) কমলে কামিনী বা ঐন্দ্রজালিক বিভূতি সৃষ্টি কারিনী রূপে।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবীচণ্ডীর উৎস নিয়ে যথেষ্ট বিচার বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন তিনি দেবী মঙ্গল বিধাযিনী। তন্ত্রের মহামাযা, বেদের রাত্রিদেবী - স্বরূপত একই দৈবী শক্তির পুঞ্জীভূত বিগ্রহ। সহস্রনাম স্তোত্রে দেবীর সহস্র নাম কীর্তিত - সমস্ত নাম বৈচিত্র কিন্তু মহা-একের মধ্যে একাকারা। চণ্ডী-দূর্গা-কালী সবই এক। মাযাতন্ত্রে তাই বলা হযেছে যিনি কালি তিনিই দুর্গা এবং তাদের ধ্যানও এক। সমালোচক সুধীভূষন ভট্টাচার্য মহাশয চণ্ডীমঙ্গলের দেবীকে মিশ্র দেবতা বলেছেন। তার পেছনে অবশ্যই একটা কারণও রযেছে, মযাতন্ত্রে যেভাবে চণ্ডী ও দুর্গাকে এক বলে অভিহিত করা হযেছে তা মেনে নিলে চণ্ডী অবশ্যই মিশ্র দেবতা কারণ আমরা জানি যে রম্ভাসুরেব পুত্র মহিষাসুরকে বধ করতে সম্মিলিত দেবশক্তির সংহত বিগ্রহই দেবী দুর্গা। দ্বিজ মাধবের কাব্যে বলা হয়েছে মঙ্গল দৈত্য বধ করে দেবী মঙ্গলচণ্ডী হযেছেন। বেদ-পুরাণ-তন্ত্রেও তার স্বরূপ একই।

ধনপতির উপাখ্যানে অরণ্য জীবনের কোন বর্ণনা নেই কালকেতু উপাখ্যানের মতো। তার পরিবর্তে সেখানে স্থান পেযেছে রাজসভা ও উচ্চবিত্তের জীবন ও সমাজ। ধনপতি অবশ্যই সামাজিক মর্যাদায উচ্চবিত্ত। তিনি পৌরাণিক দেবতা শিবের আশীর্বাদ ধন্য। তাই আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি তার গভীর আস্থা। সেই কারণে সমাজের নিম্নবিত্ত, সাধারণ লোকায়ত ধর্মাচরণের প্রতি তাঁর উন্নাসিক মনোভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই যে চণ্ডীকে কাব্যের শেষে প্রাধান্য পেতে দেখা যায়, তিনি কিন্তু আদৌ ধনপতির সমাজ ও জীবনের আভ্যন্তরীণ আচার সংস্কারের প্রতিনিধি নন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঃ

> ''অনেকটাই অন্দর মহলের গুহ্য আচার আচরণের প্রতি দুর্বল চিত্ত মেয়েলি বা নারী সমাজের পূজিত দেবীর সমগোত্রীয়।''[১২]

'মনসা মঙ্গল' কাব্যে দেবী মনসা যেভাবে নারী ব্রতের দেবী হয়েও পরবর্তি কালে সমাজের উচ্চবিত্তের স্বীকৃতি লাভ করে ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেখি দেবী চণ্ডীকে উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি আদায় করতে। 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে চাঁদ সদাগর যেভাবে পদাঘাতে দেবী মনসার ঘট চুর্ণ করে বাণিজ্যে চলে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে শৈব ধনপতিও দেবী চণ্ডীর ঘট পদাঘাতে ফেলে দিয়ে বাণিজ্যে চলে যেতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি, কেননা দেবীচণ্ডীর পূজা পদ্ধতি পৌরাণিক প্রথা সিদ্ধ নয়। এ সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন ঃ

''বন মধ্যে বসিয়া পঞ্চ কন্যার কথিত বিধানে যে দেবীর পূজা আর্চা হয় তাহা কোন

পৌবাণিক দেবীব আনুষ্ঠানিক পূজা আর্চানয -ইহা মেযেলি ব্রত বলিযাই মনে হয।''[১৩]

অভযা মঙ্গলকাব্যে কবি মুকুন্দবামও দেবী চণ্ডীকে স্ত্রীলোকেব দেবী বলে ইঙ্গিত কবেছেন।

''স্ত্রী লোকেব পূজা নিতে দেবী কৈল মতি
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা কবেন যুগতি।''[১৪]

ব্রতেব উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবি বলেছেন যে গার্হস্থ্য জীবনেব সমৃদ্ধি কামনা, স্বামী-পুত্রেব শ্রী বৃদ্ধিব কামনা, বন্ধ্যাব সন্তান কামনা, হাবানো জিনিষ ফিবে পাওযা প্রভৃতিব জন্য আবাধ্য বা আবাধ্যা দেবদেবীব কৃপা লাভ। ব্রতে পুরুষ পুবোহিতেব কোন স্থান নেই, মেযেবাই সবকিছুতে প্রাধান্য পায। পূজা সাধাবণত আড়ম্বরহীন, কামনাই এখানে মুখ্য। তাই 'অষ্টতণ্ডুলদূর্বা' দিযেই সাধাবণত পূজা উপাচাব শেষ হয। আব আবোও একটি বিষয লক্ষ কবাব মত তাহলো 'বাব', চণ্ডী মঙ্গলকাব্যেব দেবীব ব্রতেব দিন নির্ধাবিত ছিল মঙ্গলবাব। ইন্দুভূষণ মণ্ডল মনে কবেন ঃ

''পুবানকাবদেব আচাব আচবণ সম্পর্কিত অস্পষ্ট ধাবণায 'মঙ্গল' নাম যুক্ত দেবীই তাদেব লেখনীতে রূপান্তবিত হযেছে মঙ্গল চণ্ডীতে।''[১৫]

ধর্মঠাকুব মূলত লৌকিক দেবতা। অনেক সমালোচক তাকে বৌদ্ধ দেবতা বলে অভিহিত কবেছেন। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয এশিযাটিক সোসাইটিব ১৮৯৪ সালেব একটি অধিবেশনে তাঁব পাঠ কবা নিবন্ধে ধর্মঠাকুবকে তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা বলে উল্লেখ কবেছেন। তাঁব ধাবণা ধর্মঠাকুব ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যতই পবিপুষ্টি লাভ করুন না কেন তাঁব আদিতম রূপে তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। 'অমব কোষ' এব ব্যাখ্যা উদ্ধৃত কবে তিনি দেখিযেছেন 'বুদ্ধ' ও 'ধর্ম' সমার্থবোধক। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মে যে ত্রিশবণেব উল্লেখ আছে তাব সর্বশেষ শবণও ধর্মেব নামে যেমন ঃ বুদ্ধং শবণং গচ্ছামি, সংঘং শবণং গচ্ছামি, ধমর্ং শবণং গচ্ছামি। এমনকি বৌদ্ধ ধর্মেব সর্বশেষ পবিণতি হিসাবেও তিনি উল্লেখ কবেছেন ধর্মপূজাকে। কিন্তু মনস্বী সমালোচক সুনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায ঠিক এবকম মনে কবেন না। তাঁব মতে ঃ

"Dharma who is how ever described as the supreme deity, creator and ordiner of the universe, superior even to Brahma, Vishnu and Shiva and at times identified with them and he has nothing of the abstraction of the Buddhist Dharma about him "[১৬]

শুধু তাই নয, তাঁব মতে ধর্মেব গাজনেব নাচ-গান আর্য ধর্মেব নয। এগুলি দ্রাবিড বা চীন তিব্বতীয হতে পাবে। এ বিষযে শ্রদ্ধেয সুকুমাব সেন বলেছেন ঃ

''ধর্ম ঠাকুবেব পূজা চলে এসেছে দেশেব তথাকথিত নিম্নস্তরেব জনগণের মধ্য দিযে। এঁবা সংখ্যা গবিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায এদেব অধিকাব ছিল না। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণরা ব্যাপকভাবে আসতে শুরু কবেন গুপ্ত বাজাদেব সময থেকে। তাঁরা বাংলাদেশেব প্রাচীনতব অধিবাসী নন। তাই ধর্ম পূজার সঙ্গে তাদেব সংস্রব ছিলনা। পুবানো ব্রাহ্মণ যাবা আগে থেকে ছিলেন তাঁবা নবাগত ব্রাহ্মণদের দ্বাবা কোনঠেসা হযে পড়েন। এঁদেব অনেক পবে বর্ণ ব্রাহ্মণ হযেছিলেন। কেউ কেউ বা জাত খুইযেছিলেন এমন অনুমানও

অসঙ্গত নয়। চণ্ডালদের উপবীত সংস্কারের উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধ আচার্য অদ্বয়বজ্র দ্বাদশ শতাব্দীতে। রামাই পণ্ডিতের কাহিনিতে এই প্রাক্তন জাতিচ্যুত ব্রাহ্মণদেরই জয় ঘোষণার চেষ্টা। এঁরা সূত্র উপবীতধারী ছিলেন না, ছিলেন তাম্র উপবিতধারী। এঁদের বেদ ঋক্, সাম, যজুর বাইরে। অথর্ব বেদের ব্রাত্য সূক্তগুলি এমনি অব্রাহ্মণ্য পন্থী প্রাক বৈদিক আর্যদের লুপ্ত ভাণ্ডারের টুকরা। ব্রাত্য-ব্রতের উপাস্য এবং বৈদিক ব্রত বাহ্য। এই তিন অর্থেই অথর্ববেদের ব্রাত্য বাংলা সংস্কৃতির ধর্মঠাকুরের প্রাচীন প্রতিরূপ। ধর্মঠাকুরের পূজা ব্রত ছাড়া কিছু নয়। ধর্ম ঠাকুরের পূজায় বহু লোকজনের আবশ্যক। তিনি বহুলোকের পূজ্য সর্বজনিক দেবতা, ব্যক্তির উপাস্য মাত্র নন। সুতরাং তিনি ব্রাত্য, আর তাঁর পূজক, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ ও অব্রাহ্মণ জাতি। সুতরাং ব্রাত্য তো বটেই ।''[১৭]

'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন যে ঃ

''ধর্ম ঠাকুরের যে রূপ ধর্ম পূজার পুঁথি এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় সেই পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বহিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার মিশে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় ও ইরাণীয় সূর্য পূজার ধারা এবং পলিনেশীয় আদি দৈবতার বিশ্বাস এর মধ্যে বর্তমান। অধ্যাত্মভাবনা এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে অবৈদিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা মিশ্রিত হয়েছে।''[১৮]

নীহার রঞ্জন রায বলেছেন ঃ

''ধর্ম ঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাক আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।''[১৯]

'ধর্মমঙ্গল কাব্য' ধারার শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তী তাঁর কাব্যে ধর্মঠাকুরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

''ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল আসনে ছাতি
ধবল বরণে বাড়ী ঘর।
ধবল ভূষন শোভা অনুপম মুনি লোভা
আলো কৈল পরম সুন্দর ।।''[২০]

পণ্ডিত মণ্ডলী এই ধর্ম দেবতার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন, সেই বৈশিষ্ট্য গুলি যথাক্রমে ঃ .

(১) চৈত্র মাস থেকে আষাঢ়ের অনাবৃষ্টির ক'মাসই তার বার্ষিক পূজার অনুষ্ঠান হয়।
(২) আনুষ্ঠানিক স্নান তার বার্ষিক পূজার একটি অঙ্গ।
(৩) তিনি বন্ধ্যার সন্তান বরদাতা।
(৪) পশুবলি তার পূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।
(৫) ধর্ম সর্বশুক্ল বলে কল্পিত হয়, শুক্ল উপহারেই তার তুষ্টিও।
(৬) চক্ষু রোগের পরিত্রাতা।

(৭) ভযঙ্কব (malignant) দেবতা, অবিশ্বাসীকে কুষ্ঠ বোগ দিযে শাসন কবে।
(৮) মাটিব ঘোড়া উপহাবে তাব তৃপ্তি।
(৯) দ্বাদশ সংখ্যাটি তাব নিকট পবিত্র।
(১০)ডোম তাব পূজাবী।

এব থেকে প্রতীযমান হয যে অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানেব ক্ষমতা তাঁব আছে, কৃষিকাজে সহাযতা কবাব ক্ষমতাও তাব বযেছে। উল্লিখিত এই বিশ্বাস ও সংস্কাব বস্তুত আদিম কৌম সমাজেব বিশ্বাস এবং সংস্কাবেব ঐতিহ্যবাহী। এছাড়াও লক্ষণীয ধর্মঠাকুবেব পূজোব উপকবণে গাছ, হাঁস, শুকব বলি দেওযাব প্রথা বযেছে যা কৌম জীবনেব সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ। তাঁব পূজক বৃন্দও ব্রাহ্মণেতব ও অন্ত্যজ জাতি। এসবদিকে লক্ষ কবে পণ্ডিতেবা মনে কবে ধর্মঠাকুব লৌকিক দেবতা।

'শিবাযন' কাব্যেব আবাধ্য দেবতা শিবকে নিযেও যথেষ্ট বিতর্ক বিদ্যমান। শিবঠাকুব হলেন হিন্দু পুবাণেব সর্বাধিক গুরুত্ব পূর্ণ দেবতা। তিনি দেবতাদেব আদিদেব। এই শিবকে কেন্দ্র কবে অনেক 'মিথ' বিদ্যমান। তিনি অসুববাজ 'ত্রিপুব'কে বধ কবেছিলেন তাই তাব আবেক নাম 'ত্রিপুবাবী' আবাব দ্বিতীযবাব সমুদ্র মন্থনে 'হলাহল' উত্থিত হলে সৃষ্টি বক্ষা কল্পে শিবঠাকুব তা নিজ কণ্ঠে ধাবণ কবেন। যাবফল স্বরূপ তাব আবেক নাম হয 'নীলকণ্ঠ'। এই নীলকণ্ঠ শিবই সুবনদী গঙ্গাকে মর্ত্যে আনযনেব জন্য নিজেব জটাজাল বিস্তাব কবে গঙ্গাকে প্রথমে মস্তকে ধাবণ কবেন। কেননা গঙ্গাব দুর্দান্ত বেগ সবাসবি ধাবণ কবাব ক্ষমতা ধবিত্রী মাতাবও নেই। যাবফলে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হযে যেতে পাবে। এই শিবঠাকুবকে কখনো দেখেছি শিব রূপে অর্থাৎ সৃষ্টিব বক্ষক হিসেবে। আবাব তাঁব রুদ্র রূপও আছে। এই রূপে মুহূর্তেব মধ্যে তিনি পৃথিবীতে প্রলয কবাতে পাবেন। আব শিব রূপে পব মুহূর্তেই তিনি তাঁব শুভঙ্কবী সত্তাব পবশে পৃথিবীকে 'সুন্দব-মনোহব-কুসুমিতা' কবতে পাবেন।

পৌবাণিক রূপ ছাড়া এই শিব ঠাকুবেব আবো একটি রূপ আছে, যা হলো তাব লৌকিকরূপ। গ্রাম বাংলাব মানুষেব কাছে শিব খুবই জনপ্রিয ছিলেন। যাব ফলস্বরূপ বাঙালিব সৃষ্টি সম্ভাবে শিবঠাকুব একেবাবে বাঙালি ঘবেব মানুষ। বামাই পণ্ডিতেব 'শূণ্যপূবাণে' চণ্ডী শিবকে চাষ কবাব অনুবোধ কবেছেন।

"আহ্মাব বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষচাষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।।"[২১]

'গোবক্ষ বিজয' কাব্যে শিবেব গানেব যে পদ পাওযা যায সেগুলো বিশ্লেষণ কবলে দেখা যাবে শিব একেবাবে লৌকিক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঃ

"ভাঙ্ খাইবে ধুতুবা খাইবে খাইবে ভাঙ্গেব গুড়া।
পিবথিমি মজলে শিব না হইবে বুড়া।।
ভাঙ্ খাইবে ধুতুবা খাইবে খাইবে শতাববি।

দিবা রাত্রি থাক্‌বে ভুইন কুইচনীরার বাড়ী।।''[২২]

'শিবাযন' কাব্যে তাই দুই ধরণের শিবেরই উপস্থিতি বিদ্যমান। দক্ষরাজের স্বর্গ গমন থেকে শুরু করে, দক্ষযজ্ঞে সতীর উপস্থিতি ও পতি নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের ঘরে সতীর উমা রূপে পুর্নজন্ম লাভ, গৌরীর বাল্যখেলা, শিবের সাথে গৌরীর বিবাহ, মদন ভস্ম, রতির বিলাপ, শিবের দিব্য রূপ ধারণ প্রভৃতি পরিচ্ছেদে যে শিবঠাকুরকে পাওয়া যায তিনি পৌরাণিক শিবঠাকুর। কিন্তু শিব-দূর্গার গার্হস্থ্য জীবন যেখান থেকে শুরু হযেছে সেখানে যে শিবঠাকুরকে দেখা যায় তিনি অবশ্যই লৌকিক শিবঠাকুর। স্বযং রবীন্দ্রনাথও এই পর্য্যাযে লক্ষ করেছিলেন যে শিব ও শিবানী বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অকৃত্রিম ভাবে মিশে গেছেন। কাব্যে এই দুটি চরিত্রই যুক্ত হযেছে লৌকিক অনুষঙ্গে। শিবঠাকুর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একজাযগায বলেছিলেন ঃ

> ''কিন্নব জাতি সেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিযা কোন
> শুভ্রকায বজত গিবি নিভ প্রবল জাতি এই দেবতা
> (শিব) বহন কবিযা আনিযাছে ।''[২৩]

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে 'লিঙ্গ পূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা' শিবকে আর্য উপাসকগণ নিজের শাস্ত্রীয় নিয়মাচারের দ্বারা মার্জিত করে নিয়েছেন । এছাড়া নিগ্রবটুদের 'বৃক্ষপূজা', অষ্ট্রেলীয়দের 'ব্রহ্মসম্পর্কিত চিন্তা', মঙ্গোলীয়দের 'মাতৃকাপূজা'র সঙ্গে আর্যদের যাগ যজ্ঞাদির সম্পর্ক রযেছে । রবীন্দ্রনাথ এজন্যই মন্ত্রহীনদের দেব পরিকল্পনার সাথে মন্ত্র শক্তিধরদের দেব পূজাকে একীকৃত করে দেখেছেন । অর্থাৎ শিব মূলত অনার্য পরবর্তি সময়ে তাঁর উপরে পুরাণের প্রলেপ পড়েছে । তাই একথা অবশ্যই বলা যায় যে 'শিবায়ন' কাব্যে বর্ণিত শিব নিঃসন্দেহে অপৌরাণিক ও লৌকিক দেবতা । শিবায়নের কবিরা তাঁদের কাব্যে তাই পূরাণ কথার পাশাপাশি মেযেলি ব্রতকথা থেকে কাহিনির বিষয় বস্তু গ্রহণ করেছেন । তাই তাদের কাব্যে শিবের কৃষিকাজ, বাগ্‌দিনীর সঙ্গে অবৈধ প্রেম সম্পর্ক, গৌরীর শঙ্খ পরার ইচ্ছা নিয়ে মান অভিমান, শিবের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার বাসনা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে । কবি রামেশ্বর তাঁর কাব্যে শিবকে কর্মে-ঘর্মে যুক্ত রাখতে চেয়েছেন তাই কৃষকজীবন ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত যাবতীয তথ্য শিব চরিত্রটির সঙ্গে আবর্তিত ।

> ''ভীম তাঁর বিশ্বস্তভৃত্য। ভৃত্য ভীম লাঙ্গল দেন, শিবও সবুজ ফসলের প্রত্যাশায় নিড়ান তুলে নেন হাতে। মশা, মাছি, ডাঁশের কামড়ও সহ্য করেন।''[২৪]

তাই মনে হয় 'শিবায়ন' কাব্যের শিব পুরাণের রুদ্র দেবতা নয়, একেবারে লোকজীবন থেকে উঠে আসা কায়ক্লেশে 'সুখে দুঃখে দিন কাটে বেশ' - এমন কৃষক। শিব সম্পর্কে সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন ঃ

> ''এই শিব রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য' কাব্যের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ঘাটে ঘাটে কাজ করা কৃষক শ্রমিক হতে পারেন। নজরুলের 'সন্ধ্যা' কাব্য গ্রন্থের ধরণীকে শস্য-শ্যামলায় পরিণত করা কৃষক হতে পারেন, আবার অপেক্ষাকৃত একালের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

'আমার ভারতবর্ষ' কবিতার ক্ষুধার্ত ও নগ্ন পঞ্চাশ কোটি মানুষের কেউ একজন হতে পারেন ।''[২৫]

আমাদের আলোচনা থেকে অন্তত একথা স্পষ্ট যে মনসা-চণ্ডী-ধর্ম-শিব এরা প্রত্যেকেই লৌকিক দেবতা । এদের কারুরই পৌরাণিক স্বীকৃতি নেই । এঁরা ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত আবাহন পান না। তাই পূজা আদায়ের জন্য তাদের নিজেদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয় । ছলে-বলে-কৌশলে এরা ভক্তের কাছ থেকে পূজা আদায় করে থাকেন । ফলে তাদের দেবত্বের মহিমাটুকুও অক্ষুন্ন থাকেনা।

এই চারজন দেবতার কেউই পুরাণোক্ত দেবদেবী নন। মুক্তি লাভ বা স্বর্গ লাভের উদ্দেশ্যে এরা পূজিত হন না। মূলত এরা পূজিত হন ঐহিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাই মনসা সর্প ভয় থেকে মুক্তি দেন, চণ্ডী শিকারে সাফল্য দেন, ধর্ম সুবৃষ্টি আনেন - মৃৎ বৎসাকে সন্তান দেন আবার শিব উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করেন। স্বভাবতই এইসব মঙ্গল দেবদেবীর মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে আত্মবিস্মৃত কবিরা নানা ভাবে বাঙালি লোক জীবনেরই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন তাদের কাব্যে।

বাঙালি লোক জীবনের পরিচয় নিহিত রয়েছে তার উৎসব অনুষ্ঠানে (মূলত জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ), সংস্কার-বিশ্বাসে, খাদ্যে, পোষাক-পরিচ্ছদে, প্রবাদ-প্রবচনে, ধাঁধায, খেলা-ধূলায়, প্রযুক্তিতে। বাঙালি জীবনের এই বিশেষ দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করলেই মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত লোকজীবনের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে।

উৎসব অনুষ্ঠান -

(ক) জন্মবিষয়ক সংস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) নারীর পুত্রবতী হওয়া, (২) সাধভক্ষণ, (৩) জন্মের ঠিক পরবর্তী সময়ে পালিত হওয়া বিশ্বাস ও সংস্কার সমুহ, (৪) নামকরণ ও ঠিকুজি নির্মাণ, (৫) অন্নপ্রাশন, (৬) কর্ণভেদ ও বিদ্যারম্ভ ।

(১) **নারীর পুত্রবতী হওয়া** ঃ মধ্যযুগে অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য গুলো রচিত হওয়ার সময় লোক সমাজে একটি বিশ্বাস কাজ করত যে দেবদেবীর আর্শীবাদে নারীরা পুত্রবতী হয়। এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসা নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে ঃ

''ভক্তি করি একমনে যদি পূজ মোরে।
যেই বর মাঙ্গ তাহা দিবত সত্বরে।।''[২৬]

এই কাব্যের সনকা চরিত্রের মধ্যেও এই বিশ্বাস লক্ষণীয়। আরাধ্যা দেবী মনসার কোপে একে একে ছয়পুত্র হারানোর পর পুত্র কামনায় তিনি মনসার শরণ নিয়েছেন। আর এই বিশ্বাসের ফলও তিনি পেয়েছেন। ''চান্দর হইব পুত্র সনকা উদরে''[২৭] মনসার এই বরদানের সত্যতা নিরূপিত হয়েছে পরবর্তি সময়ে সনকার গর্ভে লখীন্দরের জন্মের মাধ্যমে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও আমরা লক্ষ করি যে দেবী চণ্ডীর আর্শীবাদে রম্ভাবতীর সন্তান হয়েছে।

"আশ্বাস করিযা তাবে বলেন পার্ব্বতী।
মোব আশীর্ব্বাদে তুমি হবে পুত্রবতী।"[২৮]

শুধু রম্ভাবতীই নয়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' দেবী চণ্ডীর আর্শীবাদে ধর্মকেতুর স্ত্রী নিদয়াও সন্তান সম্ভবা হয়েছে। এমন কি দেবী চণ্ডী জড়তী ব্রাহ্মণের বেশে নিদযাকে লোক ঔষধও দিলেন। পুত্রবতী হওযার আর্শীবাদ পেয়ে নিদয়া স্নান সেরে দেবীর সামনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই 'ঔষধ দিল দেবী নাকে'[২৯] এবং তারই ফলস্বরূপ পরবর্তি সময়ে নিদযা গর্ভবতী হয়েছে।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও এরকম দৃষ্টান্ত লক্ষণীয বৃদ্ধ কর্ণসেনের রাণী রঞ্জাবতী পুত্র সন্তান কামনায 'শালেভর' দিযেছেন। যার ফলস্বরূপ ধর্মঠাকুরের অশেষ কৃপায় পরবর্তি সময়ে রঞ্জাবতী লাউসেনের মত পুত্র সন্তানের 'মা' হতে পেরেছেন। কাব্যে দেখি রাণী রঞ্জাবতী ধর্ম ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন

"এক পুত্র দান মোবে দেহ পরাৎপর।
নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর।।"[৩০]

(২) **সাধভক্ষণ** ঃ সন্তান সম্ভবা নারীকে সাধ দেওয়া অর্থাৎ উত্তম রূপে আহার করানো, নতুন শাড়ি-গযনা পরানো প্রভৃতি বিশ্বাস ও সংস্কার বহুদিন ধরে বাঙালি সমাজে চলে আসছে। এই বিশ্বাস মূলত কৃষিভিত্তিক সভ্যতার উর্বরতার ধারণা প্রসূত। শস্য উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদন মূলত একই বিশ্বাস বা ধারণা থেকে এসেছে। বরুণ কুমার চক্রবর্তী অবশ্য সাধভক্ষণের অন্য কারণও নির্দেশ করেছেন।

"হিন্দু সমাজে নাবী সন্তানবতী হলে পাঁচ মাসে কাঁচা সাধ এবং ন'মাসে পাকা সাধ খাওযানোর রীতি।"[৩১]

কারণ গর্ভবতী রমনীর সাধ অপূর্ণ থাকলে তার পুত্র লোভী ও অসংযমী হয়।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় লখীন্দরের জন্মের আগে গর্ভের ন'মাসের সময় সনকাকে সাধ দেওয়া হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ঃ

"পঞ্চমাস যখন সনকা গর্ভবতী।
হেন কালে পাটনে চলিলা নরপতি।
ছয়-সাত-অষ্ট-মাসে আসিয়া প্রবেশে।
নয় মাসে ভক্ষদ্রব্য দেইত হরিষে।"[৩২]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দুটি খণ্ডে অর্থাৎ 'আখেটিক' ও 'বণিকখণ্ডে'ও সাধভক্ষণের বর্ণনা রয়েছে। আখেটিক খণ্ডে ধর্মকেতুর স্ত্রী নিদয়া ও বণিকখণে ধনপতির স্ত্রী খুল্লনার সাধভক্ষণের বর্ণনা আছে। আখেটিক খণ্ডে নিদয়ার সাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন।
আপনি রান্ধিয়া সাধ নিদয়ারে দেয় ব্যাধ
বিরচিল শ্রী কবিকঙ্কন।"[৩৩]

আবার বণিকখণ্ডেও খুল্লনার সাধভক্ষণের বর্ণনা রয়েছে ঃ

"কি আর খাইতে যায় মন।

কহনা খণ্ডিয়া লাজ ঃ আনিব সাধের সাজ ঃ ভাণ্ডারে নাহিক কোন ধন "[৩৪]

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও রাণী রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
সাদরে সাধের দ্রব্য এসে ঘরে ঘরে ।।
ক্ষীর খণ্ডা ছানা ননী চিনি চাঁপা কলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাত খোলা
মজা মত্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।
কাছে বসি হরিষে খাওয়ায কোন সই।।"[৩৫]

'শিবায়ন' কাব্যেও সাধের উল্লেখ আছে, তবে তা কোন নারীর নয়। 'সাধ' দেওয়া হয় শষ্য ভরা জমিকে। ভোর রাতে কৃষক স্নান করে ভিজা কাপড়ে শস্য হওয়া জমিতে সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান করে থাকেন। সাধের উপকরণ হলো যথাক্রমে ঃ

(১) আতপ চালের গুড়া।
(২) কাঁচা তেঁতুল।
(৩) কাঁচা হলুদ।
(৪) ডাবের জল।
(৫) কাঁচা দুধ।
(৬) গঙ্গা জল।
(৭) খেজুরের নতুন গুড়।

পূর্বেই বলেছি যে নারীর সাধভক্ষণের সাথে ('ফারটিলিটি কাল্ট') এর যথেষ্ট যোগ রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ভালো ও প্রচুর পরিমাণ ফসল হওয়ার আশায় কৃষিজমিতে যেমন সাধ দেওয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে নারীকে সাধ দেওয়ার পেছনেও সন্তানের মঙ্গলকামনা ও হৃষ্টপুষ্ট এবং পরিপূর্ণ সন্তানাকাঙ্ক্ষা দারুণভাবে কাজ করে।

(৩) **জন্মের ঠিক পরবর্তি সময়ে পালিত হওয়া সংস্কার** ঃ নবজাতকের জন্মকে কেন্দ্র করে জাতকের মঙ্গলকামনায় নানা লৌকিক অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়। তাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এরকম অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। যেমন ঃ

(ক) **সূতিকাভবনে আগুন জ্বালানো** ঃ শিশু জন্মের পর একদিকে সূতিকাগারের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সূতিকাগারে বা 'আতুর ঘরে' সরার মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। অন্যদিকে অশরীরি, অনভিপ্রেত কোনো কিছু যেন নবজাতককে স্পর্শ করতে না পারে সেরকম ভাবনা থেকেও আগুন জ্বালিয়ে রাখা হত। এটি নবজাতকের 'জাত সংস্কার'। প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই এই সংস্কারের উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' ধর্মকেতুর পুত্র কালকেতুর জন্ম উপলক্ষে কিংবা 'বণিক খণ্ডে' ধনপতি

পুত্র শ্রীমন্তের জন্মের পর এই সংস্কার পালন করা হয়েছে। 'আখেটিক খণ্ডে কালকেতুর জন্মের পর ঃ

''চাল ফাঁড়ি অগ্নি জ্বালে সূতিকা- ভবনে।''[৩৬]

কিংবা বণিকখণ্ডে শ্রীমন্তের জন্মের পর ঃ

'কাড়িয়া চালেব খড জ্বালিল আউড়ি।'[৩৭]

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও অনুরূপ সংস্কারের উপস্থিতি লক্ষণীয। লাউসেনের জন্মের পরঃ

''দূব গেল অন্ধকার প্রসন্ন হল অহ্নি।
সাবধানে সূতিকা সদনে জালে বহ্নি।''[৩৮]

(খ) **নবজাতকের নাভি ছেদন করার সময় সমবেত হুলুধ্বনি দেওয়াঃ** নবজাতকের নাভিছেদন করার সময় সমবেতভাবে হুলুধ্বনি দেওযা একটি লৌকিক সংস্কার। প্রায় প্রতিটি মঙ্গল কাব্যেই এই সংস্কারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে আছে, 'নাভি সুকর্তন কৈল দিয়া হুলাহুলি'[৩৯]। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে'ও দেখি যে কালকেতুর জন্মের পর সকলে হুলুধ্বনি দিয়ে নাভি ছেদন করেছেন ঃ

''সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে।''[৪০]

নবজাতকের নাভি ছেদনের উল্লেখ ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আছে ঃ

''ছেদন করিযা নাড়ী সপুরট পাট সাডী
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।''[৪১]

তাছাড়া নবজাতকের জন্মের তৃতীয় দিনে 'পোয়াতি' (নবজাতকের মা) কে বিভিন্ন লতাপাতা মূলসহ সুপথ্য দানও লোক সংস্কারের মধ্যে পড়ে। মঙ্গলকাব্য সমুহেও এই সংস্কারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে আছেঃ

'প্রভাতে পাচন দিল বিধি লোকাচারে।'[৪২]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিকখণ্ডে' আছে ঃ

''তিন দিনে করে রামা সুপথ্য পাঁচন।''[৪৩]

এগুলো ছাড়া ছয় দিনে ষাটিয়ারা, আট দিনে অষ্টকলাই, নয় দিনে নবনত্তা ও একুশ দিনে ষষ্ঠী পূজা করার সংস্কারও রয়েছে লোকসমাজে। 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এগুলি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বিষয়টি এরকমভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

''ছয়দিনে সূতিকা পূজিল সুবিধান।
আটদিনে আটকলাই কৈল শিশুগন।।
নবম বাসরে নত্তা করিল হরিষে।'[৪৪]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও এগুলোর বর্ণনা খুব বাস্তবতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

''ছয়দিনে ষ্যাঠরা করিল জাগরণ।''

বা ''আটদিনে আট-কড়াইয়া করিল ধর্মকেতু।

নয়দিনে নর্তা কৈলা সত শুভ-হেতু।।"[৪৫]

কোথাও কোথাও একত্রিশ দিনেও ষষ্ঠী পূজার উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে একত্রিশ দিনে ষষ্ঠী পূজার উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

"একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন।
নানা পরকারে কৈল নানা আযোজন ।।"[৪৬]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতু উপাখ্যানেও একত্রিশ দিনে ষষ্ঠী পূজার উল্লেখ রয়েছে।

"ষষ্ঠী পূজা কৈল তার একত্রিশ দিবসে।"[৪৭]

কোথাও কোথাও আবার নবজাতকের জন্মের পর ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা করা হয়ে থাকে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র 'বণিকখণ্ডে' শ্রীমন্তের জন্মের ছয়দিনে ষষ্ঠী পূজা করা হয়েছে।

"ছয়দিনে ষষ্ঠী পূজা কৈল জাগরণ।"[৪৮]

তার মূলে একটি বিশ্বাস কাজ করে যে মা ষষ্ঠীর কৃপায়ই নারীরা সন্তান প্রসব করতে পারে। তাই সন্তান জন্মের পর ষষ্ঠদিনে 'মা ষষ্ঠী' দেবীর পূজা করা হয় নবজাতকের মঙ্গল কামনায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে ষষ্ঠী দেবী আসলে সন্তানদাত্রী দেবী তাই সন্তান কামনা বা সন্তানের মঙ্গল কামনায় তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা হয়। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'ও দেখি যে সন্তান কামনায় তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানানো হয়েছে ঃ

"ষষ্ঠী দেবী পূজিরামা বর মাগে কেন্দে।
পুত্র হলে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে।।"[৪৯]

বরাক উপত্যকার কবি চৈতন্যপালের পদ্মাপূরান কাব্যেও ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজার উল্লেখ আছে- 'ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা করিয়া বিধানে'[৫০] এর থেকে বোঝা যায় যে বরাক উপত্যকায়ও ছয় দিনের ষষ্ঠী পূজার প্রচলন আছে।

(গ) **নামকরণও ঠিকুজি নির্মাণ** ঃ মধ্যযুগে বাঙালি লোকজীবনে একটি প্রচলিত লোকাচার ছিল যে নবজাতকের জন্মের কিছুদিন পর 'গণক' ডেকে জাতকের ভবিষ্যৎ গণনা করা হত। শুধু তাই নয় নবজাতকের রাশি অনুসারে নামকরণও করা হত। যেমনঃ

"দৈবজ্ঞ আনিয়া কোষ্ঠী তুলিল তাহার।
গণিয়া দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রশংসে অপার।।"[৫১]

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ও এই নামকরণ ও ঠিকুজি নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। এই কাব্যের বণিকখণ্ডে ধনপতি পুত্র শ্রীমন্তের জন্মের পর গণক ডেকে ঠিকুজি প্রস্তুত করা হয়েছে। আর গণক রাশি গণনা করে বলে দিয়েছে -

"সকল বিদ্যায় ধীর সত্য বাক্যে যুধিষ্ঠির
দানে হবে কর্ণের সমান।
শুকদেব সমুজ্ঞানী কুবের সমান ধনী
দীর্ঘজীবী পরম কল্যাণ।"[৫২]

অবশ্য কোথাও কোথাও অন্নপ্রাশনের পরও নামকরণের অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। 'মনসামঙ্গল', 'শিবায়ন' প্রভৃতি কাব্যে অন্নপ্রাশনের পর নামকরণ অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে।

(ঙ) **অন্নপ্রাশন ঃ** নবজাতকের জন্মের ছয়মাস বয়সে প্রথম তাকে অন্ন খাওয়ানোর অনুষ্ঠানের নাম অন্নপ্রাশন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন নবজাতকের ক্ষেত্রে সময়টা ছয়মাস হলেও নব জাতিকার ক্ষেত্রে তা পাঁচমাস বা সাতমাস। যদিও বিপ্রদাস পিপ্‌লাইয়ের 'মনসা মঙ্গলকাব্যে' বেহুলার ছয়মাসেই অন্নপ্রাশন হয়েছে এবং নামকরণও অন্নপ্রাশনের পরই অনুষ্ঠিত হযেছে ঃ

''ছয়মাসে অন্ন দিল বেহুলাতো নাম থুইল
দেখি সাহে হরষিত মন।''[৫৩]

সে যাই হোক জাঁক-যমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুকে প্রথম অন্ন খাওয়ানোর পেছনে আসলে একটা বিশ্বাস কাজ করে যে, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুর জীবন শুভ হবে মঙ্গলময় হবে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেও এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে।

মনসা মঙ্গল - ''ছয়মাস হইল যদি রাজার নন্দন।
অন্ন দিতে করিল প্রচুর আয়োজন।।''[৫৪]

বা

''ছয় মাসে বালকের মুখে অন্ন দিল
মনসার বরে শিশু বাড়িতে লাগিল।''[৫৫]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঃ ''ছয়মাসে করায় ভোজন।'' (বণিকখণ্ড)[৫৬]

ধর্মমঙ্গল কাব্য ঃ ''সাধে অন্নপ্রাশন করিল ছয়মাসে।''[৫৭]

শিবায়ন কাব্য ঃ ''পুষ্যায় পরমানন্দে পরিপাটি করি।
সাতমাসে শিশুকে ওদন দিল গিরি।।
গৌরী নাম রাখিল গিরীন্দ্র গুণবান ।
গুণকর্ম্ম ভেদে হৈল অনন্ত আখ্যান।।''[৫৮]

(চ) **কর্ণভেদ ও বিদ্যারম্ভ ঃ** কর্ণভেদ ও বিদ্যারম্ভ বাঙালি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। সাধারণত শিশুর পাঁচ বৎসর বয়সে এই অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেই এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। যেমন ঃ

''নিমন্ত্রিয়া জ্ঞাতিগণে আনিল আইও গণে
কর্ণভেদ কৈল শুভক্ষণে।''[৫৯]

''করয়ে শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর কেশ বালা দিবসে দিবসে।।''[৬০]

শুধু কর্ণভেদ নয় বিদ্যারম্ভ সম্পর্কেও সেখানে বলা হয়েছে ঃ

''আচার বিনয় দীক্ষা যত্নে করাইবে শিক্ষা
থাক ছিরা তোমার নিলয়।''[৬১]

''রায় কর্ণসেন হেথা আনন্দিত মনে ।
বিদ্যারম্ভ করি পুত্রে পড়ান যতনে।।''[৬২]

''পর্ব্বত পুন্যাহ পাইয়া পাঁচ মাস কালে।

কর্ণভেদ কন্যার করিল কুতূহলে।।''[৬৩]

(৪) বিবাহ ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংস্কার ও বিশ্বাস ঃ

লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেকগুলো লোকবিশ্বাসের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে, সামাজিক কিংবা নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চাউল, কলা, দুর্বা, কাঁচাহলুদ, পান-সুপারি, নারিকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। স্বভাবতই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে নানা সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়ায় এই দ্রব্যগুলির উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বিয়েতে যে ধরণের মঙ্গলদ্রব্য ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হলো ধান, দুর্বা, কুমকুম, ঘৃত, দধি, চন্দন, সিন্দুর, কজ্জল, গোরচনা, তাম্র, রূপা, সোনা, হরিদ্রা, অলক্তক, দর্পণ, সর্ষপ, চামর, দীপ ইত্যাদি। বিয়ের মঙ্গল অধিবাসে এই দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক

মনসামঙ্গল -

''মহীগন্ধ শিলা ধান্য দুর্বা কলা
দুগ্ধ দধি গো রচনা।
সর্পিষ প্রচুর স্বস্তিক সিন্দুর
কজ্জল শঙ্খ শোভনা।।''[৬৪]

চণ্ডীমঙ্গল -

''মহীগন্ধ শিলা ঃ দুর্ব্বা পুষ্প মালা ঃ ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর ঃ কজ্জল কর্ণপুর ঃ শঙ্খদিল যথাবিধি।।
বাঁধিল করে সূত্র ঃ প্রশস্ত দীপপাত্র ঃ মস্তকে করিল বন্দনা।
সুবর্ণ সীঁথি শিরে ঃ অঙ্গুরী দিল করে ঃ করিল আশিষ যোজনা।।
রজত দর্পণ ঃ তাম্র গোরোচন ঃ সিদ্ধার্থ চামর পবনে।
মোদক দিয়া লাজ ঃ পূজিল চেদিরাজ ঃ কন্যার গন্ধাধিবাসনে।।''[৬৫]

ধর্মমঙ্গল -

''মঙ্গল মহী আদি প্রশস্ত যথাবিধি
সুশীলা ধান্য দুর্ব্বাদল।
কুসুম ঘৃত দধি স্বস্তিক যথা বিধি
চন্দনাক্ত সিন্দুর কজ্জল।
সিদ্ধার্থ গোরোচনা তাম্রাদি রূপা সোনা
হরিদ্রা অলক্তক বাস।
দর্পণ সরষপে চামর শুভদীপে
করিলা মঙ্গল অধিবাস।''[৬৬]

শিবায়ন-

''মহীগন্ধ শীলা ধান্য দুর্ব্বা পুষ্পফল।
ঘৃত দধি দুগ্ধ দিল সিন্দুর কজ্জল।।

রোচনা সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রূপা তাম্র আদি।
চামর দর্পণ দীপ দিল যথা বিধি।।''[৬৭]

লোকসমাজে বিয়ের দিনক্ষণ পঞ্জিকা দেখেই নির্দ্ধারণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতি খুল্লনার বিয়ের দিনও এমনিভাবে পঞ্জিকা দেখে স্থির করা হয়েছিল ঃ

''লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ গণি।
গণিয়া নির্ণয় কৈল উত্তর-ফল্গুনী।।
ত্রয়োদশী রবিবার ইন্দ্র নামে যোগ।
দ্বৌযাম রজনী মধ্যে মাসের অর্দ্ধভোগ।।''[৬৮]

বিয়ের আগে 'অধিবাস' ও 'গায়ে হলুদ' বলে অনুষ্ঠান গুলি সমাজে প্রচলিত আছে। প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। মনসার বিয়ে উপলক্ষে তাঁকে গায়ে হলুদ ও নানা গন্ধ দ্রব্য মাখানো হয়েছে -

''করিল মঙ্গল কার্য্য বিবিধ প্রকারে
পিঠালী হরিদ্রা মাখাইল শরীরেতে
সুগন্ধি চন্দন রেণু কুমকুম সহিতে।''[৬৯]

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'ও এই অনুষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে-

''সখীগন হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।''[৭০]

'গায়ে হলুদ' এর পর অধিবাস। এই অনুষ্ঠানটি বিয়ের ঠিক আগের রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত রাত জেগে এয়োরা গান করেন। বিয়েকে কেন্দ্র করেই গানগুলি গাওয়া হয়-

''শুভদিনে বেণু রায় বসে অধিবাসে।
রঞ্জার বিবাহ গান ঘনরাম ভাসে।''[৭১]

'শিবায়ন কাব্যে'ও অধিবাসের উল্লেখ রয়েছে। কাব্যে আছে ঃ

''আনন্দ দুন্দুভি কর‍্যা লয়্যা বন্ধু গণে।
গৌরী অধিবাস গিরি করে শুভক্ষণে।।''[৭২]

. অধিবাসের পর বিয়ে। এই বিয়ে উপলক্ষে স্ত্রী আচারের নানা লোকাচার প্রচলিত আছে লোকসমাজে । 'মনসামঙ্গল কাব্যে' বেহুলার বিয়েতে এয়োস্ত্রীদের নিমন্ত্রণ দিতে 'গুয়া-পান' হাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা লোকসমাজের একটা লোকাচার । কাউকে নিমন্ত্রণ করতে হলে, পানবাটা দিয়েই অভ্যর্থনা করতে হয়।

''এয়োগনে নিমন্ত্রিতে চলে রতি হরষিতে
গুয়াপান লইয়া হস্তেতে।''[৭৩]

তারপর বিয়ের রাতে বরকে বরণ করার মধ্যেও অনেক স্ত্রী আচারের ব্যাপার রয়েছে। বরের কপালে চন্দন দিয়ে পায়ে দই ঢালা হয়। তারপর একটা সূতো দিয়ে বরের অধর মাপা হয়, এবং ঠিক একই ভাবে বরের দুটি হাত মাপা হয় এবং সবশেষে সেই সূতো দিয়ে বর-কনেকে বাঁধা হয়। এরকম নানা মাঙ্গলিক আচার শেষ করার পর বর কনেকে এক জায়গায়

আনা হয়। এবপব ববেব মুখ কাপড দিয়ে ঢেকে দেওযা হলে কন্যা সাতবাব ববকে প্রদক্ষিণ কবে। প্রদক্ষিণ শেষ হয়ে গেলে মালা বদল হয। মালা বদলেব পব ববকে গুড সহ চাল ছুডে মাবা হয, এবং তখনই শুভদৃষ্টি হয। এই যে গুডসহ চাল ছুডে মাবাব বীতি, এব পেছনে প্রকৃতপক্ষে অশুভ দৃষ্টি নাশেবই ইঙ্গিত কাজ কবছে। শুভদৃষ্টিব পব জলধাবা দিয়ে স্ত্রী আচাব শেষ কবে বব কনেকে মণ্ডপে আনা হয ও কন্যা সম্প্রদান কবা হয। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এব বর্ণনা খুব সুন্দবভাবে উপস্থাপিত কবা হযেছে।

''উল্লাস বাজনা বাজে আসন উপবে।
শশীমুখী সকলে ববিতে এল ববে।।
কোন নব নাগবী লাবণ্য দেশ বই।
কপালে চন্দন দিয়ে পাযে ঢালে দই ।।
কব ভঙ্গি কবিযে কহিছে কত তানে।
ঘবেব বদন বিধু ববে ঢাকে পানে।।
মুখে দিয়ে তাম্বুল সেনেব সেকেগাল।
সাতবাব ববিল ঘুবাযে হেমথাল।।
সাজাল সাতাস কোটী সখীগন লযে।
মঙ্গল আচাব কবে প্রদক্ষিণ হযে।।
যতনে আনিল কন্যা বতন বঞ্জিতা।
চিত্রাসনে বত্নদীপ জ্বলে চাবিভিতা।।
দুহাতে ঘুবাযে পান লাজে হেটমুখী ।
বসনে ববেব মুখ ঢাকে সব সখী।।
ববে প্রদক্ষিণ কন্যা কবে সাতবাব।
দু'জনে বদলে মালা পসাবিযা হাত ।।
নিছিয়া ফেলিল পান উভকব তুলি।
ববেবে ফেলিযা মাবে সগুড চাউলি।।
চাবিচক্ষু চঞ্চল চাহিল কন্যা ববে।
কামিনী সকল তায কত বস কবে।।''[৭৪]

শুধু 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'ই নয 'শিবাযন' কাব্যেও শিব-দুর্গাব বিযেব বর্ণনায স্ত্রী আচাব খুব বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপিত হযেছেঃ

''দিব্য দধি দিয়া দুটী চবণাব বিন্দে ।
অঙ্গুলি হেলায বাণী অশেষ প্রবন্ধে।।
পায হতে মস্তক মস্তক হতে পা।
প্রচুব প্রবন্ধ কৈল পার্বতীব মা।।
তজ্জনী অঙ্গুষ্ঠ যোখে বাম হাতে ধব্যা।
নিছিযা ফেলিল পান পবিপাটি কব্যা।।
মস্তকে মণ্ডন দিযা যোখে সাতবাব।
কপালে চন্দন দিযা গলে দিল হাব।।''[৭৫]

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'ও দেখি যে বিয়ে উপলক্ষে পালিত স্ত্রী আচার কাব্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমত রম্ভাবতী জামাতাকে কোলে বসিয়ে মাথায় গন্ধ দ্রব্য দিয়েছেন। লাল রঙের কম্বলে বসতে দিয়েছেন। বিভিন্ন বরণীয় দ্রব্য দিয়ে জামাতা ধনপতিকে বরণ করে নিয়েছেন শ্বশুর লক্ষপতি। তারপর প্রথমে জল পায়ে ঢেলে মাথায় দই দিয়েছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যথারীতি সূতো দিয়ে বরের অধর ও হাত মেপে সেই সূতো দিয়ে বর কনেকে বাঁধা হল -

''সাধু রহিলেন যেন নিগড় বন্ধনে।''[৭৬]

এবং সবশেষে নাটাই সমেত সূতো দিয়ে এয়োরা বর ধনপতিকে সাতফেরে বেঁধে ফেলল, আর ঃ

''সেই সূতা বান্ধি রাখে খুল্লনা অঞ্চলে।''[৭৭]

কোন কোন মঙ্গলকাব্যে বিয়েতে স্ত্রী আচার উপলক্ষে পাশা খেলার বর্ণনাও রয়েছে।

''বিছানাতে বসায়ে বিপুলা লক্ষীন্দরে
স্ত্রী আচারে পাশা খেলে হরিষ অন্তরে।''[৭৮]

শুভদৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে নাপিতের ছড়া বলার মধ্যদিয়ে অশুভদৃষ্টি প্রতিরোধের প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ

''খুঁটি খাঁটা ছেড়ে দাও। ভালোমন্দ লোক থাকো তো
সরে যাও। নইলে আমার মতো হাত হবে। একপালি
চেলের ভাত ছমাস খাবে।। প্রজাপতির নির্বন্ধ। ভালো
ছেড়ে যিনি করেন মন্দ। শ্রী গৌরাঙ্গ হবে তার বাম।
তার মাছের হাঁড়ি ষাঁড়ে খাবে। বেড়ালে চাল ফেরেগ
যাবে।। গ্রীষ্মকালে টেরটা পাবে। অঙ্গফুটে বেরোবে
কাল ঘাম।। তার ঘরের গিন্নী চটা হবে। উঠতে
বসতে ঝাঁটা খাবে। শয়নে সুখ না পাবে। ছারপোকা
-তে করবে ফ্যেরা ফেরি। পুরুষ যদি করে মন্দর চেষ্টা।
দারুণ কষ্ট পাবে শেষটা।। তাল পেকে তার পড়বে
গাছের বেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখবে খেল।। ভেঙ্গে যাবে
তার ভাঙ্গা ডেল্। ঠেস দিলেও পারবেনা রাখতে।
তার নাকটা হবে ঢাকটা ফুলে। ড্যাঙ্গরেতে খাবে
খুলে। পদীপ জ্বেলে হবে তাকে কানতে।
তার ছেলেরে হবে বাল্সা রোগ।
মেঘী জমিতে পড়বে ঘোগ। কু যোগেতে হঠাৎ যাবে মারা।
যেমনি কন্যা তেমনি বর। পার্বতী আর দিগম্বর।।
সখিগন নগেন্দ্র ভুবনে। দুর্গা দুর্গা বলে গো বদনে।''[৭৯]

শুভদৃষ্টির মানে হলো বর কনের জীবন থেকে অশুভ দৃষ্টির ছায়া দূরে সরিয়ে দেওয়া। লোকসমাজে বিশ্বাস ছিল যে শুভ দৃষ্টির সময় কেউ খুঁটি খাটা ধরে থাকলে শুভদৃষ্টি ব্যাহত

হয। ছড়াটিতে তাই অশুভ শক্তি সম্পন্ন মানুষদেব সতর্ক কবে দেওযা হযেছে। এটি আসলে প্রতিবোধ মূলক যাদুব নিদর্শন। প্রায প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই এই শুভ দৃষ্টিব উল্লেখ বযেছে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতি ও খুল্লনাব বিযেকে কেন্দ্র কবে এই শুভদৃষ্টিব উল্লেখ বযেছে ঃ

"পাটে চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ কবে পতি
শুভক্ষণে দুজনে চাওনি।।"[৮০]

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'ও এব উল্লেখ বযেছে ঃ

"চাবিচক্ষু চঞ্চল চাহিল কন্যা ববে।"[৮১]

শুভদৃষ্টিব পব মালা বদল। এহ অনুষ্ঠানেব মধ্য দিযে স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনকে সমস্ত জীবনেব মত এক কবে নেয। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' মালাবদলেব বিববণ সুন্দবভাবে উপস্থাপিত কবেছেন মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীঃ

"দিলেন সাধুবগলে আপনাব কণ্ঠমালে
বামাগনে দিল হুলুধ্বনি।"[৮২]

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'ও এই বিববণ লক্ষণীয ঃ

"ববে প্রদক্ষিণ কন্যা কবে সাতবাব।
দুজনে বদলে মালা পসাবিযা হাত।।"[৮৩]

বিযেতে 'খই পুড়ান' একটা সংস্কাব বযেছে। এই সংস্কাবটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কাবণ এক নাবী তাব সমস্ত পূর্ব সংস্কাব বিসর্জন দিযে নতুন জীবন যাপনেব জন্য যাত্রা কবছে। তাই সেই সময আগুনে খই দিযে পূর্ব সংস্কাব মুক্ত হতে হয।

তাছাড়া বিযেকে কেন্দ্র কবে আবো কিছু সংস্কাব ও বিশ্বাস বাঙালিব লোকজীবনে প্রচলিত আছে যা শুভাশুভ নিরূপণ কবে। 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে দেখি যে বেহুলা লখীন্দবেব বিযেব কথাবার্তা চলাব সময চাঁদ সদাগব এমন কিছু দৃশ্য লক্ষ কবেছেন যা মঙ্গল চিহ্ন রূপেই সমাজে স্বীকৃত। প্রসঙ্গতে তা তুলে ধবা যাক ঃ

"জায সাধু পথ মেলি সুমুখে দেখিল মালি
শ্রীকাল দেখিল বাম পাসে।
দক্ষিণে যায বিষধব দেখিযা কৌতুক বড
কার্য্য সিদ্ধি দেখি চান্দে হাসে।"[৮৪]

আবাব লখীন্দবেব বিযে উপলক্ষে চাবিদিক যখন আনন্দে-উদ্বেল, লখীন্দব মাযেব আশীর্বাদ নিযে যাত্রা শুরু কববে ঠিক তখনই কিছু দৃশ্য তাব চোখে পড়ে। লোকবিশ্বাসে এগুলি অশুভেব পবিচাযক।

"সমুখে যোগীনি মাগে হাতে লইযা থাল।
এবাব উজানি গেলে না হইব ভাল।।
দক্ষিণে কুলিব সর্পে বাহে গড়াগড়ি।
যাত্রাকালে যাত্রাঘট বাহে গড়াগড়ি।।"[৮৫]

বিয়েকে কেন্দ্র করে যে স্ত্রী আচার বাঙালি জীবনে প্রচলিত তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয় সাপেক্ষ। এরকম অনেক পরিবার আছে বাঙালি সমাজে যাদের 'নুন আন্তে পান্তা ফুরোয' অবস্থা। তাদের পক্ষে এই সংস্কার গুলো পালন করা কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। কবি বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখি যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু স্ত্রী আচারের প্রযোজনীয সামান্য গুযা-পান ও তৈল-সিন্দুর পর্যন্ত ঘরে নেই। অথচ এযোতিরা আসবে স্ত্রী আচার করতে কিন্তু তাদেরকে অভ্যর্থনা করার মতো সামর্থটুকু তাদের নেই।

''হাসি বলে চণ্ডী আই তোমাব মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘবে।
এ'যো এসে মঙ্গল গাইতেতারা চাইবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুবে।''[৮৬]

উপরের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালি লোক জীবনের দুটি বিষযের উপস্থিতি লক্ষ করি। প্রথমত বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গলগান করা ও তৈল সিন্দুরের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাঙালি লোকজীবনের স্ত্রী আচারের ব্যাপারটি লক্ষ করা যায ও দ্বিতীয়ত এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যে ভরা তৎকালীন বাঙালি লোকজীবনের সজীব রূপটি স্পষ্ট হযে উঠে।

(৫) **মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচার** ঃ হিন্দু শাস্ত্র মতে মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মার মুক্তির জন্য পরলৌকিক কাজ করতে হয়। আর তা নাহলে সেই আত্মা ইতস্তত ঘুরে বেড়ায। লোকসমাজেও এই ধারণা বদ্ধমূল । তাই মৃত বা মৃতার আত্মার মুক্তি কল্পে শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হত। লোকসমাজের বিশ্বাস যে শ্রাদ্ধ করলেই অতৃপ্ত আত্মা মুক্তিলাভ করে স্বর্গ যাত্রা করে। এছাড়াও এই কাজের জন্য সমাজে এড়ক পূজা বা সমাধি পূজা বা চৈত্য পূজা প্রচলিত আছে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতির পিতৃ শ্রাদ্ধের বর্ণনা রযেছে ঃ

''তিল তুলসী গঙ্গা জল
কুশ বটু রম্ভা ফল
যব দুর্বা কুসুম চন্দন।
ধূপ দীপ ঘৃত দধি
আযোজন নানা বিধি
শ্রাদ্ধ কবে বেনের নন্দন।''[৮৭]

তাছাড়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিয়ে উপলক্ষে 'নান্দী মুখ শ্রাদ্ধের' উল্লেখ আছে। মূলত এটি একটি সংস্কার। এই সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হলো বিয়ের অনুষ্ঠানে পিতৃ পুরুষের আশীর্বাদ কামনা, যার দ্বারা পরবর্তি প্রজন্মের মঙ্গল সাধিত হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছেঃ

''বসুধারাদি মুখে করিলা নান্দীমুখে
তুষিলা ব্রাহ্মণে সবায়।''[৮৮]

'শিবায়ন' কাব্যেও নান্দীমুখের উল্লেখ রয়েছে ঃ

''চেদীরাজ পূজ্যা নান্দীমুখ কৈল সারা।''[৮৯]

যাত্রাকালে বিভিন্ন সংস্কার ও বিশ্বাস ঃ মধ্যযুগের মানুষ যাত্রা প্রকরণে

বিশ্বাস করত। শুধু মধ্যযুগে কেন আজকের দিনেও মানুষের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে যাত্রার সময় যোগ দেখে যাত্রা করলে যাত্রা সিদ্ধ হয়। মঙ্গলকাব্যে তার পরিচয় মেলে ঃ

''পাঁজি বিচারিয়া ওঝা ভাবিয়া লক্ষণে।
শ্রবণাদি ছয় ঋক্ষ না যাই দক্ষিণে।''[৯০]

চাঁদ সদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে কিছু চিহ্ন দেখেছেন যা অমঙ্গল সূচক।

''শুভক্ষণ হৈল ভাল বিলম্বের নাই কাল
সাজে জল আজ্ঞা পায়া।।
নাসিকা পরশ করি যাত্রা করে অধিকারী
সুবর্ণ ঘট পড়িল টলিয়া।।
চরণে উঝাট লাগে সগুনি আইল আগে
শৃগাল যায় দক্ষিণ ভাগে।
সনাবোলে প্রাণনাথ কর প্রভু যোড় হাত
যাত্রায় অমঙ্গল সব লাগে।''[৯১]

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে নাসিকা স্পর্শ করে যাত্রা করার পেছনে লোকবিশ্বাস কাজ করছে। লোকসমাজে প্রচলিত ধারণা যে নাসিকা স্পর্শ করে যাত্রা করা শুভ। কিন্তু যাত্রার সময় পায়ে হুচট লাগা বা পায়ে পায়ে লাগলে তা অশুভের পরিচায়ক। কিংবা যাত্রার সময় শেয়াল যদি ডান দিকে যায় তাহলে তা অশুভ।

''ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী,
দহিলে দহিলে বলে গোয়ালী।।
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি।''[৯২]

কবি মুকুন্দ যাত্রা সম্পর্কে তাঁর কাব্যে নির্দেশ করেছেন ঃ

(ক) 'কৃষ্ণপক্ষ বলি যোগে নাহি যাত্রা ভাল'[৯৩]
(খ) 'তিথি ত্র্যহ স্পর্শ হৈল দশমী করাল।'[৯৪]

বিখ্যাত লোকসাহিত্য সমালোচক বরুণ কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' গ্রন্থে এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ত্র্যহ স্পর্শ তিথিতে যাত্রা করলে কর্মে অসাফল্য ঘটে।

(গ) দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়।[৯৫]
(ঘ) ''অগ্নিকোণে থাকে কাল তিথি ত্রয়োদশী।।
এমন যাত্রাতে গেলে লোক হয় বন্দী।''[৯৬]
(ঙ) তিথি চতুর্দ্দশী রিক্তা ভাল নাহি কয়।
অতঃপর উশনা পাবেন অস্ত ভাব।
এমন যাত্রায় গেলে নাহি করে লাভ।[৯৭]

এই বিধি নিষেধ গুলো শুধু 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেই নয়, মধ্যযুগের সমস্ত মানুষের মানস

পটেও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। তাইতো প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই এগুলোর উপস্থাপনা লক্ষ করা যায় ।

ধনপতি সদাগর সিংহল যাওয়ার আগে আরও কিছু দৃশ্য দেখেছেন যা অশুভ যাত্রার ইঙ্গিতবহ।

> ''গমন কালেতে দেখে অনিষ্ট সূচন।
> শূণ্য কুম্ভ লইয়া আসে সীমন্তিনীগণ।।
> দক্ষিণে শৃগাল দেখে অনুপম যাএ।
> তৈলের পসারি দেখে ডাকিয়া বেড়াএ।
> বাদিয়া এ সর্প ধরি সম্মুখে খেলাএ।
> বাণরিআ ওঝাগণ বানর নাচাএ ।।
> এহি সব দেখি সাধু নাভাবে অন্তরে।
> হালিয়া ঢলিয়া গেল ভ্রমরার তীরে ।।''[৯৮]

এখানে অশুভের ইঙ্গিত হিসেবে শূণ্য কলসীর উল্লেখ রয়েছে। যা লোক সমাজে প্রচলিত একটি সংস্কার (খনার বচন)

> ''শূণ্য কলসী, শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা।
> যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পাও না বাড়াও পা।।''[৯৯]

কানাড়ার সয়ম্বর পালায় দেখি যে সয়ম্বর সভায় যাত্রা কালে মহারাজ কিছু দৃশ্য দেখেছেন যা কুলক্ষণ বলেই লোকসমাজ বিশ্বাস করে ঃ

> ''অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্ম চিল।
> শকুনি গৃধিনী আগে করিছে কিল্ কিল্ ।।
> কিচিকিচি কাল পেঁচা ডাকে কাছে কাছে।
> কোনেতে কচ্ছপ দেখে কপিগন গাছে।।
> বামে কাল ভুজঙ্গ দক্ষিণে দেখে শিবা।
> কেহ বলে না জানি কপালে আছে কিবা।।[১০০]

ধনপতি সদাগরও সিংহল যাত্রা কালে এমন কিছু দৃশ্য লক্ষ করেছে যা অমঙ্গলের বা কুলক্ষণের পরিচায়ক ঃ

> ''ঘরে হৈতে ধনপতি করিল গমন
> উভরাএ খুল্লনা যে জুড়িল ক্রন্দন।
> বাহির হইতে সাধু বাজিল উছটা
> নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল কাঁটা।
> যাত্রার সমএ ডোমচিল উড়ে মাথে
> কাঠুরিয়া কাঠ ভার লৈয়া আইসে পথে।
> সুখানা চালাতে বগ্যা কলবলয়ে কাউ
> যোগিনী মাগএ ভিক্ষা আদখানি লাউ।
> জরট কমট মাছ কৈবর্ত লৈয়া জায়

তৈল লঅ লঅ বলি তেলিয়া বোলায়।
চলিলেন সদাগর দুঃখে কুতূহলী
বামে ভূজঙ্গ দেখে দক্ষিণে শৃগালী।''[১০১]

যাত্রার সময় ডোমচিল মাথার উপর উড়লে তা অমঙ্গল সূচক। শুকনো কাঠে বসে কাকের 'কা' 'কা' রব, বা যাত্রার সময় যোগিনী আধখানা লাউ ভিক্ষা চাইলে কিংবা তেলী তেল লৈবা-লৈবা বলিলে তা নিতান্তই অমঙ্গলসূচক।

''শুকনো কাঠে রটে কাউ, ভাস্তি দাপুনি দেখে লাউ।
যোগী আদ্য, ছুছু কলসী, তা দেখিলে না ঘরে আসি।''[১০২]

তাছাড়া উষা যখন ইন্দ্রের আহ্বানে দেব সভায় নৃত্য করতে যাচ্ছিলেন সেই সময় কিছু অমঙ্গল চিহ্ন তাঁর চোখে পড়েছে ঃ

''দক্ষিণ লোচন নাচে স্বর নহে ভাল।
চরণে উঝাটি লাগে সাথে লাগে চাল।।
বামে সর্প দক্ষিণে শৃগালী রঞা ডাকে।
সগুনি গৃধিনী শিরে ফিরে ঘন পাকে।।
স্থানে স্থানে বিদ্যাধরী দেখে অমঙ্গল।
জগত জীবন গায় সুন্দরী বিকল।''[১০৩]

আবার শিব যখন কালকূট বিষপান করতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই ভগবতী কিছু কুলক্ষণ দেখেছেন ঃ

''মথনে মোহিত যদি হৈলা পশুপতি।
অকালেতে অকুশল দেখে ভগবতী।।
ভবানী বলেন আমি দেখি অলক্ষণ।
আঁখির পুতলি মোর নাচে ঘন ঘন।।
মথনে রহি প্রভু না আইলা ঘর।
আজি কেন রক্ত বৃষ্টি পুরীর ভিতর।।
অম্বর না বহে গায় মুখে উঠে হাই।
সিন্দুর মলিন হৈল দেখিয়া ডরাই।।
ছিরিল গলার হার নাচয়ে নয়ান।
শুনিয়া উলুক ধ্বনি উড়িল পরাণ।।
অমঙ্গল দেখি মোর হীন হৈল পয়।
নয়ন পুতুলি নামে হাসি ভাল নয়।।''[১০৪]

বশীকরণ ঃ বশীকরণ মধ্যযুগের সমাজে একটি বিশেষ বিশ্বাস বলে পরিচিত ছিল। এই বিশ্বাস অনুযায়ী কাউকে নিজের অনুকূলে বা বশে রাখার জন্য ঔষধ বা মন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হত। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখি যে বেহুলার বিয়ের আগেই তাকে বিধান দেওয়া হয়েছে কিভাবে সে স্বামীকে নিজের বশীভূত করে রাখবে ঃ

''কলার মধ্যে কড়া থুইয়া বেহুলারে গিলাও গিয়া
এহি ঔষধ খাওয়াইবা সনিবারে।

অহিকড়া বাটিয়া লখাইর বুকে পিষ্টে লেপিয়া
জামাই ভাড়ু হইয়া বসিয়া রহিব ঘরে।
পরজি পুয়ার ফুল অসতি নারীর চুল
আর দিয়া হাতিয়ালের মাটি।
এহি তিন একত্র করি বুকে পিষ্টে দিয় ভরি
বেউলারে দেখিব গলার কাটি।''[১০৫]

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে খুল্লনার মা রম্ভাবতী ধনপতিকে 'বশীকরণ' করতে চেয়েছেন, কারণ তিনি মনে করেন 'খুল্লনার হবে সাধু নাক বিন্ধা পশু'। আর এর জন্য তিনি নানান দ্রব্যও সংগ্রহ করেছেন ঃ

''ঔষধ করিযা রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দোছটি করিয়া পরে তসরের সাড়ী।।
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি ।
দুর্গার প্রদীপ পুঁতে রেখে ছিল চেড়ী।।
সাধুর কপালে যবে দিব পুনর্ব্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাক বিন্ধা পশু।।
আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি।।
সাপের আঁটুলি আনে খুঁজে বেদের ঘরে।
কই মৎস - পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে।।
কার্পাসের ক্ষেত হইতে আনিল গোমুণ্ড।
দণ্ডাইয়া রবে সাধু তায় দুই দণ্ড।।
খুল্লনা করয়ে যদি সাধুর অপমান।
মৌনে রবে সাধু যেন গোমুণ্ড সমান।।
বিমলা ব্রাহ্মণী হয় রম্ভাবতীর সই।
আভা সরায় আনে গর্দ্দভের দুগ্ধ দই।
ঔষধ করেন রম্ভা খুল্লনার হিত।
খুল্লনার তরে সব হবে বিপরীত।।''[১০৬]

শুধু তাই নয়, লহনাও ধনপতিকে নিজের বসে রাখার জন্য লীলাবতীর কাছ থেকে ঔষধ সংগ্রহ করেছে। লহনা ভালো করেই জানে সে বিগত যৌবনা, বন্ধ্যাও বটে। তাই স্বামী ধনপতি যদি সুন্দরী খুল্লনার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় সেজন্য লীলাবতীর কাছ থেকে ঔষধ সংগ্রহ করতে চেয়েছে স্বামীকে নিজের বসে রাখবার জন্য। আর লীলাবতীও লহনাকে স্বামী বশীকরণের জন্য ঔষধ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস করেছে ঃ

''মোর বোলে লহনা কর অবধান
ঔষদ করিআ তোর সাধিব সম্মান
পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে

ঘৃতের প্রদীপ তথি দিবে প্রতিদিনে।
নিরামিষ্য অন্নখাবে তার পত্র পাড়ি
সাধু হব কিঙ্কর খুল্লনা হব চেড়ি।
পত্রিকা ভাসাইয়া আন্য হরিদ্রার মূল
জতনে আনিহ শ্মশানের তিল ফুল।
ইহা বাট্যা দিহ সাধু খুল্লনার বসনে
খুল্লনা পড়িব সাধুর বিষ নয়ানে।
চুনে পানে খয়েরে করিআ তার খার
গুন্যা বলদেব গাজা ঔষধের সার।
দুর্গার মুখের গো আনিহ হরিতাল
গ্রহণের সমএ আনিবে বেড়া জাল।
দুই বস্তু কপালে ধরিবে সাবধানে
সোহাগ বাড়িব তোর দুর্গার সমানে।

মন্ত্র পড়ি স্বামীরে মারিবে পঞ্চবান।
স্বামী সন্তোষের চান্দ রাখিবে জতনে
বাঘ- তৈল সনে তাহা মাখিবে বদনে।''[১০৭]

আর ঔষধের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

''ঔষধের গুণে স্বামী বোল শুনে
যেন পিঞ্জরের শুরা।''[১০৮]

এছাড়াও তৎকালীন সমাজে যে সমস্ত পুরুষ নিজের স্ত্রী ছাড়াও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত, সেইসব স্বামীদেরকে বশ করার জন্যও বশীকরণ মন্ত্রের প্রচলন ছিল ঃ

''জাহ্নবী জীবন দিল সিতা সদ্য দধি।
স্বামীরে করিতে বশ চিন্তেন ঔষধি।।
স্বামীরে শীতল করি করায়ে শয়ন।
বনবধূ গণে কৈল যত বিবরণ।।
শুন সবে সুন্দরী স্বামীর সঙ্গ সুখে।
মদনে মাতিল মধু পিয়ে মুখে মুখে।।
নাগরী নাগরে যত নিবড় না পান।
হাতে দিয়া ঔষদি কহিল কতখান।।
এই গুঁড়ি অন্নে মাখি দিবে মাষা ছয়।
ভোজনে ভূপতি ভব্য ভুলে যেন রয়।।
পড়ে দিয়া কজ্জল নায়নে দিয়া চারে।
তার সাক্ষী সহসা তখনিপাওয়া যাবে।।''[১০৯]

মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক, তুক-তাক ও অলৌকিকতায় বিশ্বাস ঃ

মঙ্গলকাব্য গুলোতে প্রচুর পরিমাণ মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুক, তুক-তাক ও অলৌকিকতায়

বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যে এরকম লোকবিশ্বাসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মন্থনে হলাহল নির্গত হলে সমস্ত সৃষ্টি যখন সেই বিষ ক্রিয়ায় ধ্বংস হতে চলেছিল, শিব তখন হনুমানের অনুরোধে সেই বিষ নিজ কণ্ঠে ধারণ করে অচেতন হয়ে পড়েন। চণ্ডীর অনুরোধে মনসা তখন মন্ত্র বলে সেই বিষ ক্রিয়া নষ্ট করেছেনঃ

"উত্তর শিযরে রাখে ত্রিদশের ঈশ।
তন্ত্রে মন্ত্রে পদ্মাবতী বিনাশিল বিষ।।
ব্রহ্মজ্ঞানে পদ্মা মারিল হুহুংকার।
কালকূট গরল হইল ছারখার।।
কালকূট গরল হইয়া গেল নাশ।
উঠিয়া শঙ্কর দেব চাহে চারি পাশ।।"[১১০]

শুধু শিব নয় লক্ষীন্দরকে বাঁচানোর সময়ও মনসা মন্ত্র শক্তির প্রয়োগ করেছেন।

"যাগ মন্ত্র পরি পদ্মা জল পড়া দিল।
অস্তি চর্ম লখাইর যে একত্র হইল।।"[১১১]

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখি লাউসেনের জন্মের পর তাকে চুরি করার জন্য ময়না নগরের সবাইকে মন্ত্র বলে অসময়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে। আর এর জন্য ইঁদুরের মাটি মন্ত্রপুত করে ছড়িয়ে দেওয়া হযেছিল গোটা ময়না নগরে। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে বিষয়টি খুব সুন্দর ও বাস্তবতার সাথে উপস্থাপিত করেছেন ঃ

"পড়ামাটি সিঁদকাঠি যতনে লইয়া।
ময়না ঈশান কোনে উত্তরিল গিয়া।।
প্রথম নিন্দাটি দেয় ময়না ভুবনে।
মহাবিদ্যা জপ করে হরষিত মনে।।
বাম হাতে নিল নিন্দা ইন্দুরের মাটি।
তিনবার পরশ করিল সিঁদকাঠি।।
মন্ত্র পড়ি নিন্দাচোর ভাবে মনে মন।
ছ মাসের নিদ্রা আইস ময়না ভুবনে।।
ময়না নগরে আজি যেইজন জাগে।
আমার নিন্দাটি গিয়া তার চক্ষে লাগে।।
শয়নে যেজন জাগে বস্যা যেবা খায়।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা ধর গিয়া তায়।
যুবতীর দুই চক্ষে দড় কর‍্যা ধর।
মনোজ-আগুনে তারা জাগে চারিপর।।
ইন্দুর-মৃত্তিকা তুমি আমি সিঁদাল চোর।
ময়নার ভিতরে পাড়িবে অঘোর ঘোর।।
ছ মাসের নিদ্রা যদি না আস্যে এথাই।
ভোজ রাজার আজ্ঞা কুম্ভকর্ণের দোহাই।।"[১১২]

'ফলা নির্মাণ পালা'য় রঞ্জাবতীকে দাসী উপদেশ দিয়েছে লাউসেনকে গৌড়যাত্রা থেকে নিরত করতে। কারণ ঃ

''দাসী বলে গোলাহাট সুরিক্ষার চেড়ী।
গুয়া পান পাতা আর ঔষধের গুঁড়ি।।
রাত্রে করে মানুষ আর দিবসে করে অজা।
রাণী বলে দূর কর হেনছার ওঝা।।''[১১৩]

আবার 'গোলাহাট পালা'য় লাউসেনকে বিধান মত রান্না করে দেওয়ার পর সুরিক্ষা ঃ

''অন্নে মাখে ঔষধ ব্যঞ্জনে পড়ে মন্ত্র।
পর পুরুষে ভ্রষ্টা নারী করিছে কুতন্ত্র।।''[১১৪]

লাউসেন ও কর্পূর গৌড়যাত্রা করছে। পথে যাতে ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনীর কোন প্রভাব না পড়ে তার জন্য বিবিধ মন্ত্র পাঠ করেছেন রঞ্জাবতীঃ

''ডাকিনী যোগিনী পাছে পথে দেয় পীড়া।
মস্তকের কেশ বাঁধে দিল মন্ত্র পড়্যা।।
লাউসেন কর্পূর বিদায় হয সুখে।
গগন মার্গে গমন করিল গৌড়মুখে।।''[১১৫]

শুধু মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাকই নয় মঙ্গলকাব্য গুলোতে অলৌকিকতার উপস্থিতিও লক্ষ করার মত। এর পিছনে কারণও অবশ্য আছে। মধ্যযুগের মানুষ ছিল দৈবে বিশ্বাসী। তাই অলৌকিক কার্যকলাপে তাদের অগাধ বিশ্বাস। কার্য কারণ পরম্পরায় যখন কোন ঘটনা ঘটত না, তখনই মানুষ তাকে অলৌকিক বা দৈবের লীলা বলে ভেবে নিত। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবী মনসার জন্ম, নেতার জন্ম থেকে শুরু করে পুনর্জীবন লাভ, magic power এমন কি কাব্যে সমুদ্র মধ্যস্থিত যে পুরীর বর্ণনা রয়েছে সব কিছুই অলৌকিক । চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও কালকেতুর জন্ম, খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষা, magic power থেকে শুরু করে ধনপতি কিংবা শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা অংশে কমলে কামিনীর বর্ণনা, ছাগ চরানো প্রসঙ্গে দেবকন্যাদের সাথে খুল্লনার সাক্ষাৎ এমন কি শালবন রাজের মৃত সেনাদের পুনর্জীবন লাভ করা সমস্ত কিছুর মধ্যেই অলৌকিকতার ছাপ রয়েছে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও বিভিন্ন চরিত্রের পুনর্জীবন লাভ, রাণী রঞ্জাবতীর পুত্র কামনায় লৌহ শলাকায় ঝাঁপ দেওয়া, কাটারিও জপমালার সাহায্যে ব্রহ্মপুত্রের জল শুকিয়ে ফেলা ও পশ্চিমে সূর্যোদয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সেই সময়ের মানুষের অলৌকিকতায় বিশ্বাসই বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

সহমরণ বিষয়ক সংস্কার ঃ মধ্যযুগে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য সংস্কার হলো সহমরণ বিষয়ক সংস্কার। সে কালের নারীরা বিশ্বাস করত যেঃ

''স্বামী বণিতার পতি স্বামী বণিতার গতি
বিনে স্বামী অন্য নাহি আর।''[১১৬]

তাই স্বামীর মৃত্যুর পর তারা সহমরণকেই সহজ পথ হিসেবে বেছে নিত। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেখা যায় শিবের মৃত্যুর খবর শুনে ভগবতী আমের পাতা ভেঙ্গে শিবকে দেখতে

এসেছেন। এর একটা কারণ হলো সমাজে এরকম নিযমই প্রচলিত ছিল যে মৃত মানুষ দেখতে গেলে আমের পাতা ভেঙ্গে দেখতে হয। কিন্তু অনেকে আবার মনে করেন যে নারীদের এই আমের পাতা ভাঙার পেছনে সহমরণের যাওয়ার ইচ্ছার কথাই নাকি ব্যক্ত হয।

''ভাঙ্গিযা আমের পাতা চণ্ডিকা হৈম সুতা
প্রভুব উদ্দেশ্যে ভগবতী ।
বিষপান কৈল যথা সেখানে জগৎ মাতা
আসিযা দেখিল প্রাণপতি ।''[১১৭]

এছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'অনুমৃতা পালায' লাউসেনের মৃত্যুর খবর শুনে অর্থাৎ তার কাটা মাযামুণ্ড দেখে রাণীরা আমের ডাল ভেঙ্গেছে ।

''এত বলি মুণ্ড দিল কলিঙ্গাব আগে।
বাজাব বচন শুনে মনে ভয লাগে।।
আম ডাল ভাঙ্গিল বাউত চাবি জন।''[১১৮]

নারীর কলঙ্কে বিশ্বাস ঃ মধ্যযুগে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে খুব একটা মর্যাদার চোখে দেখা হত না। এমনকি পান থেকে চুন খসলেই নারীকে প্রাযই নানান পরীক্ষা দিতে হত। আর সেই সকল পরীক্ষার অন্যতম হল নারীর সতীত্ব পরীক্ষা। নারীর কলঙ্কে বিশ্বাস করে তাকে নানান পরীক্ষার মুখোমুখি করা ছিল সেই সমাজের রীতি। শুধু মধ্যযুগেই কেন, তারও অনেক আগে রামাযণের যুগেও সমাজের সেই একই চিত্র ছিল। বস্তুত রামায়ণের সীতার মত 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বেহুলা, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের খুল্লনাদেরও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কারণ বেহুলা ছযমাস মৃত স্বামীকে নিযে একা একা ছিলেন। নদী পথে দেবসভায় যাওয়ার সময় কত পুরুষের সাথে তার সাক্ষাত হযেছে। পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ তাই বেহুলার শুচিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। আর খুল্লনা বনে বনে একা একা ছাগল চরিয়েছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সে বনে ছিল তাই পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ তার শুচিতা সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ফলত দুজনকেই সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। কবিদের বর্ণনায় তা যথেষ্ঠ বাস্তবতা লাভ করেছে।

মনসা মঙ্গল কাব্যে বেহুলা সতীত্ব পরীক্ষার বর্ণনা -

''পরীক্ষাতে চলিল সুন্দরী।
দুই ভাগ করি কেশ, নাহি জানি পাপ লেশ,
সাক্ষী হও জয় বিষহরী।।
বলে চাঁদ হরষিতে, সর্পের পরীক্ষা নিতে,
শুনি চলে শাহের নন্দিনী।
পরম কৌতুক করি, সর্পের মস্তকে ধরি,
কাড়ি লয় মস্তকের মণি।।
সাপ রহে হেঁটমাথে, বিপুলা হরিষ চিত্তে,
বলে বাক্য শ্বশুর গোচর।
সর্পের পরীক্ষা যিনি, কাড়িয়া লইনু মণি,

দেও আর পরীক্ষা সত্বর।।
লৌহের অঙ্গার করি, সম্পূর্ণ সিন্দুকভরি,
তপ্ত করি অগ্নির আকার।
চারি পাশে প্রজাগণ, দেখি চমকিত মন,
সপ্তবার হাঁটি হও পার।।
হাঁটি ধনি সাত বার, অগ্নিতে হইল পার,
বলে পুনঃ শ্বশুর গোচর।
চাঁদ বলে শুন মাও, কেশ সেতু হাঁটি যাও,
যশ রবে সংসার ভিতর।।
কেশ সেতু ক্ষুর ধার, হাঁটিয়া হইল পার,
আর লয জৌ-ঘৃত কাঞ্চন।
বিমানে মনসা থাকি, বিপুলাকে বলে ডাকি,
মনে কিছু না কর চিন্তন।।
মিলিয়া পণ্ডিত যত, শুধিল কাঞ্চন ঘৃত,
পরিমিত করিলেক তোলা।
অঙ্গুরী ফেলিয়া তাতে, তুলিযা লইল হাতে,
তার মধ্যে ছাঁকিয়া বিপুলা।।
পরীক্ষা করিল জয়, মনসা আছে সদয,
হরষিত বিপুলা সুন্দরী।
অন্তরীক্ষে দেবগণ, দেখিয়া কৌতুকে মন,
রথ ভরে হাসে বিষহরী।।
চন্দ্রধর বলে হাসি, কহিতে সঙ্কোচ বাসি,
আর এক পরীক্ষা লইতে।
বান্ধি চারি হাত পাও, সাগরে ভাসিয়া যাও,
এপার হইতে ওপারেতে ।।
বিচিত্র পাটেতে ছান্দি, চারি হাত পাও বান্ধি,
নামে ধনী সাগর ভিতরে।
না দেখিয়া বিপুলারে, লক্ষীন্দর উচ্চৈঃস্বরে,
কান্দে দুই চক্ষে জল ঝরে।।
দ্বি- ভাগ হইল জল, বিপুলা না হ'ল তল,
মুক্ত হ'ল সকল বন্ধন ।
জলে হাটে পুনি পুনি, পাদেতে না লাগে পানি,
কুলেতে উঠিল ততক্ষণ ।।
হরষিতে সবর্ব জন, ভাসুরের পত্নীগণ,
বিপুলাকে তুলি লয় কোলে।''[১১৯]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও খুল্লনা বাধ্য হয়েছিলেন এরকম অষ্ট পরীক্ষার সম্মুখীন হতে-

'খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতী'[১২০]

অষ্ট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বণিক সমাজের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এসেছিল তা সমস্ত পুরুষ সমাজের পক্ষে লজ্জাকর-

''দেহ এক লাখ ঘুচিবে সকল পাপ
পরীক্ষায নাহি কিছু ফল ।''[১২১]

রন্ধন প্রণালী ও খাদ্য ঃ বাঙালি সাধারণত ভোজন রসিক। সে মধ্যযুগেও যেমন বর্তমান কালও তেমনি। তাই মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে সেই সময়ের অর্থাৎ মধ্যযুগের রন্ধন প্রণালী ও খাদ্য তালিকা স্বাভাবিক ভাবেই স্থান করে নিযেছে। 'মনসামঙ্গল কাব্যে' সনকার রন্ধনের মধ্য দিযে বাঙালির রন্ধন শিল্প ও খাদ্য তালিকার সুস্পষ্ট পরিচয পাওযা যায়ঃ

''স্নানান্তে সনকা রামা পবিযা বসন।
ত্বরিত গমনে গিযা চডায রন্ধন।।
এক মুখে জ্বাল দেয নয মুখ জ্বলে।
নযটী পাতিল চ'ড়ে ঘৃত আব তৈলে।।
বাবমাসি বেগুন তৈলেতে ভাজা করি।
বেত আগা লইলেক ঘৃতেতে সম্ভাবি।।
রান্ধিল কলাব শাক হরিষ বিশেষে।
মোহিত করায সবে ব্যঞ্জনের বাসে ।।
রান্ধযে কচুর শাক কাঁকড়া বিস্তর।
একে একে তুলাইল ঘৃতেব উপর।।
বান্ধিল লুধিয়া শাক লাউ যে কুমড়া।
সম্ভারিল যত দ্রব্য দিযা শস্য পোড়া ।।
মুগ বুট অরহর কলাই মসুর।
খেঁশারী ইত্যাদি ডাল রান্ধিল প্রচুর।।
নিরামিষ্য রান্ধিয়া থুইল একপাশে।
মৎসের ব্যঞ্জন রামা রান্ধয়ে হরিষে ।।
চাকা চাকা করি কত আদ্রক কাটিল।
রুহিতের মুণ্ড দিযা মুড়া পাকাইল।।
বান্ধিল ইলিস মৎস সহিতে বেগুন।
শকুল কাতলা বাটা দাতিনা কাউন।।
কালীখনী মৎস্য আর বাউর খশুল।
রান্ধিল পলতা দিয়া রুহিতের ঝোল।।
রান্ধিল শকুল মৎস বদরী সহিতে।
কাতলের মুণ্ড রান্ধে মুগ দাল সাথে।।
জাতি লাউ রান্ধিলেক কুষ্মাণ্ডের বীজ।

বড বড মৎস দিযা বান্ধিল মবিচ।।
কলাব থোডেব শুক্তা বান্ধিল বিশাল।
আদা শুক্তা বান্ধিলেক হবিদ্রা মিশাল।।
যতেক ব্যঞ্জন বান্ধে আপনাব মনে।
বদবি অম্বল বামা বান্ধিতে নাজানে।।
হেটে পডে অম্বল উপবে উঠে ফেনা।
লাডিতে লডযে তাব দুই কর্ণ সোনা।।
মৎসেব ব্যঞ্জন তবে বান্ধিল বিস্তাব।।
বাসী মাংস বান্ধিলেক ঘৃতেতে ভাজিযা।
মদ্য মাংস বাখা বাছিযা বাছিযা।।
ছাগলেব মাংস দিযা অম্বল বন্ধিল ।
কৌতব হংসেব মাংস ভাজিযা লইল ।।
একে একে বান্ধিলেক পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
পঞ্চবর্ণ পিঠা বান্ধে হবষিত মন।
কলসে কলসে দুগ্ধ ঘনা বর্ত্ত কবি।
মিষ্ট অন্ন বান্ধিলেক সনকা সুন্দবী।
নানা বর্ণ পিঠা বান্ধে মনেব হবিষে।
আতপ তণ্ডুল অন্ন বান্ধে অবশেষে।''[১২২]

মনসা মঙ্গল কাব্যে সনকাব সাধভক্ষণেব মধ্য দিযাও তৎকালীন বাঙালি সমাজেব খাদ্য তালিকাব পবিচয পাওযা যায ঃ

''দুগ্ধ গুড নাবিকেল শর্কবা নবাত। বিবিধ পিষ্টক সজ্জা কবে নানা মত।
উত্তম তণ্ডুল গুডি দুগ্ধ চিনি দিযা। দুগ্ধ ফেনি সজ্জকৈল প্রচুব কবিযা।
আসিকা ভিজায দুগ্ধে বাখিল প্রচুব । খিব পুলি দুগ্ধ চুষি বাখিল প্রচুব।
নাবিকেল পুলিমুগ সামলি বিস্তব। কটী সক চাকলী কবিল বহুতব।
বান্ধিল শাকেব ঘণ্ট ডালি আব মৎস্য। কতেক প্রচাব ভাজা কবিল অসচ্য।
লাউব অম্বল বান্ধে তাহে গুড দিযা। পবমান্ন বান্ধে বধূ হবষিত হইযা।
দুগ্ধে চিডা দিযা কাটি দিল বহুতব। অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল দিলেক তাবপব।
পশ্চাতে শর্কবা দিযা ওলায্যা বাখিল। আব বধূ এক হাডি ঘৃত চডাইল।
সুপক্ক হইল ঘৃত দেখিযা সত্ত্বব। পবমান্ন দিল নিযা তাহাব উপব।
লবঙ্গ মবিচ জিবা আব জাযফল। এলাইচ দাল চিনি গুডাইযা সকল।
আগে নাবিকেল চালিলো পাত্রেতে। শাল্যা তণ্ডুলেব অন্ন বান্ধে হবষিতে।
প্রস্তুত কবিল অন্ন আনন্দিত মনে। পবে ভোজনেব স্থানে কবিল মার্জনে।
বিচিত্র কাঞ্চন পিঁডি তাহাতে বচিযা। সনকা বসায অতি সাদব কবিযা।
সুবর্ণেব থালে অন্ন কবিযা চযন। প্রথমে দিলেক শাক হবষিত মন।
ক্রমে ক্রমে দিল সুখে যতেক ব্যঞ্জন । হবিষে সনকা বাখা কবযে ভোজন।

কতেক প্রকাব দিল পিষ্টক আনিযা। দুগ্ধ গুড দিল বাখা প্রচুব কবিযা।
বাটি ভবি পবমান্ন দিলেক হবিষে। অমৃত সমান দ্রব্য অশেষ বিশেষে।”[১২৩]

এছাডা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব দুটি খণ্ডেই এবকম অনেক উদাহবণ বিদ্যমান। যেমন নিদযাব সাধভক্ষণ উপলক্ষে যে খাদ্য তালিকা তুলে ধবেছেন কবি মুকুন্দ তা নিতান্তই লৌকিক। যেমন ঃ

(ক) হেলাঞ্চ ও কলমী শাক।
(খ) পলতাব শাক সাঁতলান।
(গ) ফুল বডি ও মবিচেব ঝাল দিযে পুঁই ডগা ও মুখী কচু বান্না।
(ঘ) বাই সবিষা গাছেব ডগা ভাজা।
(ঙ) মূলা, বেগুন, সীম নিম ও ডুমুব দিযে শুক্ত।
(চ) পোডা মাছে জামিবেব বস।
(ছ) বোযাল মাছেব ঝোল।
(জ) একটু বেশী লবণ দিযে ‘নকুল গোধিকা পোডা ।’
(ঝ) হংস ডিমেব বডা।
(ঞ) চিংডি মাছেব বডা।
(ট) সজাক শিক পোডা।

কবিব বর্ণনায -

‘‘ আপনাব মত পাই তবে গ্রাস কত খাই
পোডামাছে জামিবেব বস।
নিধানী কবিযা খই তাহাতে মহিষা দই
কুল কবঞ্জা প্রাণহেন বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতাব ঝোল।
প্রাণপাই পাইলে আমসি।।
আমাব সাধেব সীমা হেলঞ্চি কলমী গিমা
বোযালী কুটিযা কব পাক।
ঘনকাটি খব জ্বালে সাঁতলিবে কটুতেলে
দিবে তাতে পলতাব শাক।।
পুঁই-ডগা মুখী-কচু তাহে ফুল বাডি কিছু
আব দিবে মবিচেব ঝাল।
হবিদ্রা-বঞ্জিত কাঞ্জী উদব ভবিযা ভুঞ্জি
প্রাণপাই পাইলে পাকাতাল।।
লবণ কিছু দিযা বাডা নকুল গোধিকা পোডা
হংস-ডিমে কিছু তোল বডা।
কিছু ভাজ বাই-খডা চিঙ্গুডিব তোল বডা
সজাক কবহ শিক পোডা।

....

মূলাতে বেগুন সীম তাহে কিছু দিহ নিম
আব দেহ উড়ুম্বব ফল।।''[১২৪]

'আখেটিক খণ্ডে' গৌবীব বান্নাব বিববণও কবিকঙ্কন অতি বাস্তবতাব সাথে উপস্থাপন কবেছেন, যাব মধ্যে তাব নিজস্ব অভিজ্ঞতা মিলে মিশে এক হযে গেছে। কাব্যে দেখি যে শিব গৌবীকে নিজস্ব পছন্দেব যে 'পদ' গুলি বান্না কবাব অনুবোধ কবেছেন। সেগুলোব মধ্য দিযে সেই সমযেব বন্ধন প্রণালী ও খাদ্য তালিকা সুস্পষ্ট ভাবে উঠে এসেছেঃ

''আজি গণেশেব মাতা বান্ধ মোব মত।
নিমে সিমে বেগুনে বান্ধিযা দিবে তিত।।
সুকুতা শীতেব কালে বডই মধুব।
কুমডা বার্ত্তাকু দিযা বান্ধিবে প্রচুব।।
নটীযা-কাঁটাল-বিচি সাব গোটা দশ।
ফুল বডি দিবে তাহে আব আদা-বস।।
কটু তৈল দিযা বান্ধ সবিষাব শাক।
বাথুযা ভাজিযা তৈলে কব দৃঢ পাক।।
বান্ধিবে মুসবি ডাল দিবে টাবা-জল।
খণ্ড মিশাইযা বান্ধ কবঞ্জাব ফল।।
ঘৃতে ভাজি দুগ্ধেতে ফেলিবে ফুল বডি।
চডি চডি কবিযা বান্ধ পলতাব কডি।।
বান্ধিবে ছোলাব ডালি তাহে দিবে খণ্ড।
আলস্য তেজিযা জ্বাল দিবে দুই দণ্ড।।
মানেব বেসাবে দিবে কুমডাব বডি।
ভাঙ্গিযা কাঁটাল-বিচি দিবে চাবি কুডি।।
ঘৃত জিবা সন্তলনে বান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কব গৌবী নাকব বিলম্ব।।
আপনে উদ্যোগ যদি কব তুমি গৌবী।
অবশেষে বন্ধন কবিবে কিছু ক্ষীবি ।।''[১২৫]

'কালকেতুব ভোজন' অংশেও অনেক খাদ্যেব উল্লেখ পাওযা যায। যেমন ঃ

(ক) ''একশ্বাসে সাত হাঁডি আমানি উজাডে ।।''[১২৬]

(খ) চাবি হাডি মহাবীব খায খুদ-জাউ ।
ছয হাণ্ডি মুসুবী-মুগ মিশ্যা তথি লাউ।।''[১২৭]

(গ) ঝুডি দুই তিন খায আলু ওল-পোডা।
কচুব সহিত খায কবঞ্জা আমডা।।''[১২৮]

তাছাড়া ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন অংশে 'কাঁচডা ক্ষুদেব জাউ' ও বণাতি-শাকের উল্লেখ রযেছে।

বলা বাহুল্য এ সমস্তই লোকখাদ্য। মুকুন্দ চক্রবর্তী এখানে স্বীয অভিজ্ঞতায লোকজীবনের খাদ্য বিষযে সানুপুঙ্খ বর্ণনা দিযেছেন।

'বণিক খণ্ডে'ও দেখি যে ধনপতির নির্দেশে খুল্লনা রান্না করেছে। রান্না শুরু করার আগে সে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করেছে এইজন্য যে রান্নার কাজ যেন সে মনোযোগ সহকারে নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতে পারে। কাব্যে পাই ঃ

''প্রভুব আদেশ ধরি রান্ধযে খুল্লনা নারী
স্মরিয়া সৰ্ব্ব মঙ্গলা।''[১২৯]

খুল্লনা প্রথমেই রান্না করেছে সুক্তা। সুক্তার উপকরণ হিসেবে বেগুন, কুমড়া, কলা, হিং, জিরা, মেথি ও ঘি এর উল্লেখ রয়েছে। সুক্তার পর শাক। শাকের উপকরণ হল নটে শাক, কাঁঠাল বিচি, নালিতা শাক, বাথুয়া শাক, বড়ি ও চিংড়ি মাছ। শাকের পর দুধ-লাউর তরকারি ।

এরপর ক্রমান্বয়ে মুগডালের সুপ, কই মাছের ভাজা, রুই মাছের ঝোল, তেঁতুল দিয়ে পাঁকাল মাছর ঝষ এবং সবশেষে ক্ষীর রান্না করল। আমরা লক্ষ করি যে কবি মুকুন্দ এমন জীবন রসিক ছিলেন যে রান্নার খুঁটিনাটি পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। কোন তরকারিতে কোন মসলা লাগবে এবং তাতে তেল লাগবে না ঘি লাগবে এমনকি তা রান্না করার সময় আগুনের তাপ কতটুকু লাগবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মুকুন্দ তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেনঃ

''বৰ্ত্তাকু কুমুড়া কচাঃ তাহে দিয়া কলা মোচাঃ বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।
ঘৃতে সন্তোলনতথিঃ হিঙ্গু জিরা দিয়ে মেথিঃ সুক্তার বন্ধন পরিপাটি।।
ঘৃতে ভাজে পলাকড়িঃ নটেশাকে ফুলবড়িঃ চিঙ্গড়ী কাঁটাল বীচি দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাকঃ তৈলেতে বেথুয়া পাকঃ খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া।
দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ডঃ জ্বাল দিল দুই দণ্ডঃ সাঁতলান মউরির বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষু রসঃ কই ভাজে গণ্ডাদশঃ মরিচ গুঁড়িয়া আদা রসে।।
মসূরি মিশ্রিত মাষঃ সূপ রান্ধে রসবাসঃ হিঙ্গু জিরা বাসে সুবাসিত ।
ভাজে চিতলের কোলঃ রোহিত মৎস্যের ঝোলঃ মান কচু মরিচ ভূষিত।।
বোদালি হিলঞ্চ শাকঃ কাটিয়া করিল পাকঃ ঘন বেসার সন্তোলিয়া তৈলে।
কিছু ভাজে রাইখাড়াঃ চিঙ্গড়ীর তোলে বড়াঃ খরসুলা ভাজি কিছু তোলে।।
করিয়া কণ্টকহীনঃ আম্র যোগে শোলমীনঃ খর লোন ঘন দিয়া কাঠি।
রান্ধিল পাঁকাল ঝষঃ দিয়া তেঁতুলের রসঃ ক্ষীর রান্ধে জ্বাল দিয়া ভাটি।।
কলাবড়া মুগ সাউলিঃ ক্ষীর মোননা ক্ষীর পুলিঃ নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে সবশেষেঃ শ্রী কবিকঙ্কন ভাষেঃ পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে।।''[১৩০]

তাছাড়া খুল্লনার সাধভক্ষণের বর্ণনাতেও অনেক খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ লক্ষ করা যায় ঃ

''বাথুয়া ঠনঠনি তেলেতে পাক। ডগি ডগি ভাল ছোলার শাক।।
মীন চড়চড়ি কুমড়া বড়ি। সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ী।।
যদি ভাল পাই মহিষা দই। ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খই।।
পাকা চাঁপা কলা করিয়া জড়। খেতে মনে সাধ করেছি বড়।।
কনক থালেতে ও-দন শালি। কাঁজির সহিত করিয়া মেলি।।

হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায। কচি কচি মূলা বেগুন তায।।
আমড়া নেযাড়ি পাকা চলিতা। আমসী কামন্দিকুল কবঞ্জা।।
থোড় ডুমুব ইচলা মাছে। খাইলে মুখের অরুচি ঘোচে।।
হিয়া ধক ধক অন্তবে ভোক। মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক।।
মনে কবি সাধ খাইতে পিঠে। নাবিকেল ছাঁই খাইতে মিঠে।।
দুধে তিল গুঁড়ি মিশাযে লাউ। দধিব সহিত ক্ষুধেব জাউ।।
চিঁড়া পাকা কলা দুগ্ধেব সব। কহি দুযা এই শুন গো আব ।।
ঝুনা নাবিকেল চিনিব গুঁড়া। কবি আপনাব সাধেব চূড়া।''[১৩১]

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'ও তৎকালীন সমাজের অর্থাৎ মধ্যযুগের বাঙালি লোকজীবনের অনেক খাদ্য দ্রব্যের উপস্থাপনা লক্ষণীয। রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণ উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত খাদেব পরিচয দেওযা যাক ঃ

''ক্ষীবখণ্ড ছানা ননী চিনি চাপা কলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুব পাযেস পাত খোলা।।
মজা মত্তমান মিছিবি মিশাইযা দই।
কাছে বসি হবিষে খাওযায কোন সই।।''[১৩২]

তখনকাব সময বিযের সম্বন্ধ পাঠাতে হলে ভাটকে নানা উপঢৌকনেব সাথে কন্যা পক্ষের কাছে পাঠান হত। আর সেইসব উপঢৌকন নিযে ভাট বিযের প্রস্তাব কবত। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'র *'কানাড়ার সযম্বর'* পালায গৌড়রাজ সিমুলায ভাটের সাথে নানা উপঢৌকন পাঠিযেছেন। সেই উপঢৌকনে অনেক খাদ্য দ্রব্যও ছিল, সেগুলো হলো ঃ

''উপহাব দিলভাব বিশাসয বহু।
লাড়ু কলা চিনি ফেনি ক্ষীব খণ্ড দহ্।।
মজা মত্তমান মিছবি খাসা ক্ষীব খণ্ডা।
মনোহবা মতিচুব খাসা মৃত মণ্ডা।।
পনস উত্তম আম নাবিকেল গুযা।
আমলকী সুগন্ধী চন্দন চারু চুযা।।''[১৩৩]

রন্ধন প্রণালী যে একটি বিশেষ শিল্প এবং বাঙালি যে ভোজন প্রিয তার প্রমাণ 'শিবায়ন' কাব্যেও পাওযা যায। 'গৌরীর বিবাহ্ খেলা' অংশে লক্ষণীয গৌরী খেলার ছলে নারাযণ-লক্ষ্মীর বিয়েতে খাওযার যে আযোজন করেছেন তা নিতান্তই বাঙালি ঘরের খাবার। জীবন রসিক কবির বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা গৌরীর মাধ্যমে কাব্যে রূপ লাভ করেছে। লক্ষ্মী-নারাযণের বিয়েতে রান্নার পরিচয় ঃ

''সবাকার সম্মুখে পাতিয়া কচুপাত।
ধরণীর ধূলা তাতে আন্যা দিল ভাত।।
শাক দিল শাক মুরি সজিনার পাতা।
সূপ দিল তপ্ত বালি ত্রিভুবন মাতা।।
বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ।

কলামূলা ভাজা দিল কাট্যা কাঁটা সিজ।।
পুঁটি মৎস্য ভাজা দিল ভাল খোলা কুচি।
সফরীতে সবার সুন্দর হবে রুচি।।
বৃহৎ সুসিদ্ধ দিল রোহিতের মোড়া।
চিন্তিনি অম্বল দিল চেমনের চূড়া।।''[১৩৪]

আবার পার্ব্বতীর গৃহস্থালি বর্ণনায় 'শিবের ভোজন' অংশেও কবি নিতান্তই সাধারণ পরিবারের চিত্র এঁকেছেন । পরিবারের গৃহিনী পার্ব্বতী, এই গৃহিনী সুনিপুন ভাবে স্বামীর ঘর সংসারের কাজ শেষ করেন । তিনি রান্নাতে পটু তাই রান্না করেন -

''চর্ব্ব্যচুষ্য লেহ্য পেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ব মধু চতুর্বিধি ব্যঞ্জনের গণ।।''[১৩৫]।

আবার আনন্দের সাথে স্বামী পুত্রকে পরিবেশনও করেন। পার্ব্বতীর এই খাদ্য পরিবেশনের বর্ণনা থেকে যে সকল খাদ্যের নাম পাওয়া যায়, সে গুলো হল ঃ

(ক) 'সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায্য হস্ত দিল শাকে।'[১৩৬]
(খ) 'ঈষদুষ্ণ সূপ দিলা বেসারির পরে।।'[১৩৭]
(গ) 'দড় বড় দেবী আন্যা দিল ভাজা দশ।'[১৩৮]
(ঘ) 'সিদ্ধিদল কমল ধুতুরা ফুল ভাজা।'[১৩৯]
(ঙ) ''সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে।।''[১৪০]

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে মঙ্গলকাব্যের সমকালীন জীবনের রন্ধন প্রণালী ও ভোজন রসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যায তা জীবন রসিক কবিদের লোক চরিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয়কেই দ্যোতিত করে।

লোকক্রিড়া ঃ মধ্যযুগে বাঙালি লোকজীবনে বিভিন্ন ধরণের খেলা প্রচলিত ছিল যেমন ঃ পাশা খেলা, পায়রা ওড়ানো, কড়ি খেলা, কুস্তি, ডাংগুলি খেলা, নৌকা বাইচ, ষাড়ের লড়াই, জলখেলা, বৎস হরণ খেলা ইত্যাদি। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এ ধরণের বিভিন্ন খেলার উল্লেখ রয়েছে। বয়সের তারতম্য অনুসারে খেলাগুলি বিভক্ত ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে উল্লিখিত খেলাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলাগগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১)**পাশাখেলা ঃ** এই খেলাটি বিশিষ্ট লোক ক্রীড়ার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত। পৌরাণিকযুগ থেকেই সমাজে এই খেলার প্রচলন ছিল। মহাভারতে নিজের স্ত্রীকে বাজি রেখে পাশা খেলেছিলেন যুধিষ্ঠীর। কবি কঙ্কনের সময়েও সমাজে পাশা খেলার প্রচলন ছিল। তাঁর সময়ে পাশা খেলা ছিল অন্দরমহলের বিশেষ অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা। খুল্লনা ধনপতিকে বলছে ঃ

''দূর কর প্রাণনাথ রতি-রস-আশা।
আইস যামিনী যোগে দোহে খেলি পাশা।
সদাগর বলে প্রিয়ে পরম মঙ্গল।
পাশায় হারিলে দিব ভাণ্ডার সকল।।
তুমি যদি হার তবে দিতে রতিপণ।

সদাগবে কিছু বাখা কবে নিবেদন।।''[১৪১]

জলখেলা ঃ মধ্যযুগে জলখেলাও খুব জনপ্রিয ছিল। বাডীব অন্দবমহলে বা পুকুব ঘাটে জলখেলাব আযোজন কবা হত। শিশু এবং নাবীবাই এই খেলায অংশ গ্রহণ কবত। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'ব বণিকখণ্ডে মেযেদেব জল খেলাব বর্ণনা বযেছে। যেখানে নগবেব বধূদেব আমন্ত্রণ কবে জল খেলা কবানো হযেছে। কবিকঙ্কন তাঁব কাব্যে জলখেলাব যে বিববণ দিযেছেন, তাতে দেখা যায জলেব সাথে বালি-কাদা এগুলো মিশিযে এক নাবী অন্য নাবীব গাযে ঢেলে দেয । কাব্যে দেখি যে লহ্নাকে কযেকজন নাবী মিলে তাব গাযে কাদা জল ঢেলে দেয । লীলাবতী তা দেখে পালিযে যাওযাব চেষ্টা কবলে দুর্বলা তাকে ধবে ফেলে। এই বর্ণনা কবি কঙ্কন খুব দক্ষতাব সাথে তাঁব কাব্যে উপস্থাপিত কবেছেনঃ

''কেহ বায কেহ গায   কেহ কাদা দেয গায
কেহ নাচে দিযা কবতালি।
কেহ বা লুকায কোনে   কোন বধূ ধবে আনে
তাব সাথে দেয জল ঢালি।''[১৪২]

এই জল খেলায যে কি পবিমাণ কৌতুক ছিল তাব পবিচযও দিযেছেন কবিকঙ্কন ঃ

''যতেক যুবতী মিলি   জল খেলে কুতূহলী
লাজ পেযে পুরুষ পালায।
পূর্বেব হাব্যাসে বুডি   ধবিযা বেতেব বাডি
হাসে নাচে গডাগডি যায।''[১৪৩]

শিশুদের ছোটবেলার খেলা ঃ মধ্যযুগে বচিত মঙ্গলকাব্য গুলোতে শিশুদেব বিভিন্ন প্রবণেব খেলাব পবিচয পাওযা যায। যে খেলাগুলো ঐতিহ্য পবিম্পবায এক প্রজন্ম থেকে পববর্ত্তি প্রজম্মে চলে আসছে। বিশেষ কবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব 'শ্রীমন্তেব বাল্যক্রীডা' অংশে এই খেলাগুলোব উল্লেখ বযেছেঃ

''চাবি বৎসবেব যবে বেনিযাব বালা।
শিশুগণ সঙ্গে কবে ভাগবত খেলা।।''[১৪৪]

আবাব কৃষ্ণ লীলাব অনুসবণেও বিভিন্ন খেলাব বিববণ দিযেছেন কবি মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী। শিশুদেব মধ্যে কেউ পুতনা বাক্ষসী হযে স্তন পান কবায, কেউ যশোদা হযে কাউকে কোলে নিতে গিযে ভাব সহ্য কবতে না পেবে পডে যায, আবাব কেউ দধিভাণ্ড ভেঙে নন্দেব নন্দন হয তখন অন্যজন যশোদা হযে কৃষ্ণকে বেঁধে ফেলেন। আব ঃ

''কোপ কবি কোন শিশু হয অঘাসুব
কেহ গোপ শিশু হয কেহ বা বাছুব।।''[১৪৫]

তাছাডা শিশুদেব নিযে শ্রীমন্তেব 'বাছুব হবণ কবা' খেলাব বিববণও কবিকঙ্কন তাঁব কাব্যে দিযেছেন ঃ

''গড়ান দুপুব বেলা   তৃষ্ণায় শুকাল গলা
শুনভাই মোর নিবেদন ।

সব শিশু করি খেলা চিড়াখণ্ড দধি কলা
এই চারি করিব ভোজন ।।

শ্রীপতি বলেন ভায়া বাছুর আনিব চ্যায়া
সবে সুখে করহ ভোজন ।।''[১৪৬]

ভোজন শেষ হলে শ্রীমন্ত খুব তাড়াতাড়ি 'চলিল বাছুর অন্বেষণে'। এবং তারপরঃ

''ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি।
আর নহে কার কর্ম্ম বিধাতার কৃতি।
কৃষ্ণের চবণে ছিরা আরোপিযা মন।
মাযায় করিল বালক বৎস গণ।''[১৪৭]

আর তাছাড়া ভাগবতের কাহিনিকে আশ্রয় করে শিশুদের মধ্যে প্রলম্ববধ ক্রীড়ার প্রচলনও লক্ষ্যণীয়। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' ছাড়া 'শিবায়ন' কাব্যেও বিভিন্ন লোকখেলার উপস্থিতি লক্ষণীয়। কবি রামেশ্বর গৌরীর বাল্য খেলা বর্ণনায় সে কালের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খেলার তালিকা তুলে ধরেছেন ঃ

''খেলে দশ পঁচিশ দু'কড়া লযে কড়ি।
দানকর্ম্ম বুঝি দান ফেলে বড়া বড়ি।।
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে।
বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া দিযা হড়ে।।
খেলি ফুলঘুটি প্রখুর দেই গায।
বেনা গাছে দড়ি বেঁধে গড়া গড়ি যায়।।
আটুলি বাঁটুল খেলে পসারিয়াপা।
আর লীলা খেলা যত কত কব তা।।''[১৪৮]

লোকবাদ্য ঃ মঙ্গল কাব্য গুলোতে বিভিন্ন ধরণের বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ আছে যা বাঙালি লোক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে গুলি হলো যথাক্রমে ঃ

ঢাক, ঢোল, বাঁশীল, ঝাঁঝর, মৃদঙ্গ, কাশি, করতাল, মন্দিরা, সেতার, দোতারা, সানাই, তবল, ডম্বরু, বীণা, দুন্দুভি, মরুজ, পড়া, মুহুরি, রসাল, ভেউর, করনাল, ডিণ্ডিম, কাহাল, দুগরি, কপিলাস, ঘণ্টা, দুমরি, মঙ্গলা, সপ্তস্বরা, দগড়, দামা, দড়মাসা, সানি, টমক, বরগোল, কাড়া, পাখজ, রণশিঙ্গা, বিষান, ভেরি, রবাব, বেনি, জোড়াদামা প্রভৃতি।

প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই এরকম অনেক বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় । বিশেষ করে যুদ্ধ বর্ণনায় এগুলির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাইশ কবির 'পদ্মপুরাণ' এ দেখা যায় ঃ

''সাজে কাজি নৃপবর, সঙ্গে সৈন্য বহুতর,
নিশাল চালায় শীঘ্রগতি।
নিজ ঠাট সঙ্গে করি, কাজি চলে ত্বরা করি,

করিয়া বিভিধ বাদ্য ধ্বনি।
বাজে ঢাক জয় ঢোল করি মহা গণ্ডগোল,
শব্দ শুনি কাঁপয়ে মেদিনী।
সৈদ কাজী বহুতর, রায় বাঁশীয়া বিস্তর,
যুদ্ধ হেতু চলিল তখনি।
পিনাক বিপুল বাঁশী, ঝাঁঝর মৃদঙ্গ কাঁসি,
করতাল বাজে পুনি পুনি।।
মন্দিবা সেতার বাজে, নানা বর্ণে সৈন্য সাজে,
দোতারা সানাই করে বা।
তবল ডম্বরু নানা, বাজে বহু সংখ্যা বীণা,
শুনি উল্লাসিত সর্ব্ব গা।।''[১৪৯]

শুধু 'মনসা মঙ্গল' নয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাদ্য যন্ত্রের যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে' 'কালকেতুর বনযাত্রা' পর্বে দেখি যে কালকেতুর শিকার যাত্রা উপলক্ষে কালকেতু কিছু মঙ্গল চিহ্ন দেখেছে। সেইখানে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার উল্লেখ রয়েছে। ঃ

''মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় কেহ নাচে কেহ গায়
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি।''[১৫০]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক খণ্ডে সিংহল রাজের সমর সজ্জায় এরকম অনেক বাদ্য যন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে ঃ

''কোটালের কথা শুনি কাঁপে সর্ব্বগা।
সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা।।
চলিলেন যুবরাজ রাজার আরতি।
লেখা জোখা নাহি যত চলে সেনাপতি।।
আস্তে ব্যস্তে দুলিয়া চৌদল করে কাঁধে।
ধরণী কম্পিতা হৈল বাজনার নাদে।।
রামবীণা-গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা।
দগড়-দোগড়ী বায় শতশত জনা।।
হস্তীর গলায় ঘণ্টা শুনি ঠনঠনি।
কাংস্য করতাল বাজে বিপরীত শুনি।।
জয় ঢাক বীরঢাক রাক্ষসী বাজনা।
প্রলয় সময় যেন পড়ে ঝনঝনা।।
হাতে দামা কান্ধে ঢোল তরল নিশান।
দামামা দগড় বাজে বাজে সিন্দু যান।।''[১৫১]

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের যুদ্ধ যাত্রা উপলক্ষেও বাদ্য যন্ত্রের যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঃ

''রাজ আজ্ঞা পেয়ে পাত্র দিল হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে শিঙ্গায় শুধু সাড়া।।
কাড়া পাড়া ঠমক খমক করতাল।

জগঝম্প বাজে ডম্ফ খাদল বিশাল।।
রণভেরী মুহরি বিজয় ঢাক ঢোল।
রণশিঙ্গা কাঁসব সঘনে শুনি রোল।।
ঘন রণদামামা দগড়ে পড়ে কাঠি।
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটি।।
ধাঙ ধাঙ ধাঙসা বাজে ডিগডিগ দগডি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি।।''[১৫২]

শুধু যুদ্ধ যাত্রা নয় আনন্দানুষ্ঠানেও বাদ্য যন্ত্র সমানভাবে ব্যবহৃত হত। 'মনসামঙ্গল কাব্যে' বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ে উপলক্ষেও বাদ্য যন্ত্র বাজার উল্লেখ রযেছে ঃ

''নারীগন জয কারে সুললিত ধ্বনি।
বাদ্য শব্দে তোলপাড় নগর উজানী।।''[১৫৩]

কালকেতুর বিবাহ উপলক্ষেও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর উল্লেখ রয়েছে ঃ

''বর যাত্রা পড়ে সাড়া বাজয়ে চেমচা কাড়া
চারিদিকে বাজয়ে বাজন।''[১৫৪]

শ্রীমন্তের বিবাহ উপলক্ষেও বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষণীয় ঃ

''সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ্ দুন্দুভিবেনী
আনন্দিত নৃপতি কেশরী ।।''[১৫৫]

বা

''বাজায মৃদঙ্গ পড়া দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থি ছড়া
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী ।''[১৫৬]

রঞ্জাবতীর বিবাহ উপলক্ষে বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করি ধর্মমঙ্গল কাব্যে ঃ

''উল্লাস বাজনা বাজে আসন উপরে ।''[১৫৭]

বা

''সুপদ্য বাজে বাদ্য মাদল মুর জাদ্য
মঙ্গল জয় হুলাহুলি ।''[১৫৮]

'শিবায়ন' কাব্যে 'শিবের বরযাত্রা' পর্বেও অনেকগুলো বাদ্য যন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করি ঃ

''ত্রিদশ দুন্দুভি বাজে - বাজায় বিশাল।
বেনু বিনা মৃদঙ্গ মন্দিরা বার তাল।।
ঢাক ঢোল দগ ডঙ্কা সড় ধামা ভেরী।
মঙ্গল মুরচঙ্গ (?) কত মোহন মুরারী।।''[১৫৯]

এখানে বলাবাহুল্য হবে না যে লোক সমাজের অনুষ্ঠান ভেদে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আনন্দ উৎসবে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত, যুদ্ধ যাত্রায় সেগুলো বাজানো হত না। যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন - 'জয়ঢাক বীরঢাক রাক্ষসী বাজনা'[১৬০] অর্থাৎ বিকট শব্দ যুক্ত বাজনাই যুদ্ধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত।

ধাঁধা ঃ- মঙ্গলকাব্য গুলোর মধ্যে ধাঁধার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। এই ধাঁধার মধ্যে চিরন্তন বাঙালি জীবনের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধার বাইরের পরিবর্তন সাধন শুরু হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। কিন্তু তবুও ধাঁধার আভ্যন্তরীন গঠন উপাদান আজও অপরিবর্ত্তিত। একথা স্পষ্ট হয়ে যায় লোকসমাজে এগুলির জনপ্রিয়তা ও প্রচলন দেখে। প্রসঙ্গত সমালোচকের কথা প্রনিধান যোগ্য।

> ''বাহিরের দিক দিয়া সমাজ যতই পরিবর্তিত হউক, ইহার অন্তরের দিক দিয়া এমন একটি নিভৃত স্থান আছে, সেখানে ইহার কোন পরিবর্তনই সম্ভব হয় না। ধাঁধাগুলি সমাজের নিভৃত লোকেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে, সেইজন্য বাহিরের পরিবর্তন ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারেনা।''[১৬০]

মঙ্গল কাব্যগুলিতে তাই যে সকল ধাঁধা আমরা পাই সে গুলিও লৌকিক ধাঁধারই সহিত্যিক রূপ। এখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগ্‌তে পারে যে বাইরের দিক দিয়ে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে ধাঁধা গুলো কি স্বকীয়তা হারাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন লৌকিক ধাঁধার সঙ্গে তার সাহিত্যিক রূপের পার্থক্য এই যে, লৌকিক মন হইতে মূলত এগুলো উৎপন্ন হলেও এরা একটি সাহিত্যিক রূপ লাভ করেছে। লৌকিক স্তর থেকে এগুলিকে সংগ্রহ করলেও মঙ্গল কাব্যের কবিরা তাদের রচনা শক্তি অনুযায়ী এগুলির বাইরের দিকে একটি পরিণত সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন।এখানেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মঙ্গলকাব্যগুলি লৌকিক ভিত্তি ভূমির উপরই প্রতিষ্টিত। মঙ্গল কাব্য গুলোতে ব্যাপক হারে ধাঁধার ব্যবহার অন্তত তা ই প্রমাণ করে।

এবারে আমরা মঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব । মুকুন্দচক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিকখণ্ডে ব্যাধের হাতে বাকশক্তি সম্পন্ন একটি শুকপাখিকে ধরার পরে পাখির নির্দেশেই ব্যাধ তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যায়। পাখিটি সেখানে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়েরাজাকে কিছু প্রশ্ন করে। রাজার সভাসদরা সে প্রশ্ন গুলোর মীমাংসা করেছে। বলা বাহুল্য এই প্রশ্ন গুলো ধাঁধারই পরিচায়ক-

শুক বলেছে ঃ

(১) ''বিধাতা নির্মাণ ঘর নাঞিক দুয়ার
জুগি পুরুষ তাহে আছে অনাহার।
জখন পুরুষ তাহে হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভাঙ্গ্যা করে খান খান।''
উত্তরে বলা হয়েছে - ডিম্ব।

(২) ''শিরস্থানে নিবসে পুরের দুই সার
ভালমন্দ সবাকার কর এ বিচার।
বিচার করিআ সেই রহে মৌনশালী
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালি।''
উত্তর - চক্ষু, লেখনী

(৩) দেখিতে রূপ দুফ মুখ এক কায়

এক মুখে উগারএ আর মুখে খায়।
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে
বুঝ বুঝ পণ্ডিত সভা মাঝে বৈশ্য।।"
উত্তর - উনুন।

(৪) "নীরেতে জনম তার নীর তার কায
নীর দেখিলে পুনু হালেতে ডরায।
আপুনি বিকাই আ চারি পুরে চিন্তে হিত
হেয়া পক্ষিতে বলে বুঝহ পণ্ডিত।"
উত্তর - লবণ

(৫) "বিষ্ণুপদে সেবা করে বৈষ্ণব সে নয
গাছ পল্লব নয অঙ্গে পত্র হয।
পণ্ডিত বলিতে পারে দুই চারি দিবসে
মূর্খ বলিতে নারে বৎসর চল্লিশে।"
উত্তর পাখি।

(৬) "মস্তকে ধরিআ আনে হয্যা যত্নবান
অপরাধ বিনে তার করে অপমান।
অপমানে গুম তার দূর নাহী জায
অবশ্য করিআ দেহ সম্বল উপায।"
উত্তর - ধান ।

(৭) "বেগে ধায রথ নাহী চলে এক পা
নাচযে সারথি তাহে পাসরিআগা।
হেযালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি
অন্তরিক্ষে চলে রথ ভূতলে সারথি।"
উত্তর - ঘুড়ি।

(৮) তরু নয বনে রয নাহি ধরে ফুল
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।
পবনে করিআ ভর করও ভ্রমণ
বনেতে থাকিযা করে বনের দোষণ।"
উত্তর - দাবানল,জলের পানা।

(৯) "মৎস্য মকর নহে পানি পানি বুলে
কুম্ভীর হাঙ্গর নহে দেখিলে সে গিলে।
গিলিআ উগারে পুনু দেখে জগ জন
হেযালি-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন।"
উত্তর - নৌকা।

(১০) "তৃষায আকুল বড় জল খাইলে মরে
স্নেহ না করিলে সে তিলেক নাঞি ভরে।
উগারের অন্য বস্তু অন্য করে পান

সখা সনে আলিঙ্গনে তেজপে পবাণ।''
উত্তব প্রদীপ।

(১১) ''জিযন্ত জে মৌন সেই মৈল ভাল ডাকে
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিপাকে।
অবশ্য আমএ নব মঙ্গল বিধানে
হেযালি প্রবন্ধে কবি কঙ্কন ভনে।''
উত্তব শাঁখা।

(১২) ''বঙ্গে বৈসে চাবি ভাই ভ্রমে নানা ঠাঞি
জীবন কালে ভিন্ন ভিন্ন মবণে এক ঠাঞি।
হেযালি প্রবন্ধে কবি কঙ্কন ভনে
পণ্ডিত বুঝিতে নাবে মূর্খে কিবা জানে।''
উত্তব পাশাব গুটি।

(১৩) ''একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায।
আপনি বুঝিতে নাবে পবেব বুঝায।।
শ্রী কবি কঙ্কন গায হিঁয়াল বচিত।
বাব মাস ত্রিশ দিন বান্ধবে পণ্ডিত।।''
উত্তব কবিতা।

(১৪) ''এক ঘবে জম্মতাব দুই সহোদব।
এক নাম ধবে সে দুই কলেবব।।
প্রবল জীবন সেই নাধবে জীবন।
হিঁযালি প্রবন্ধে কহে শ্রী কবিকঙ্কন।।''
উত্তব - নাসিকা।

(১৫) ''দেখি ভযঙ্কব অতি বিপবীত কায।
ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডবায।।
শ্রী কবিকঙ্কন কহে বিপবীত বানী।
ধবাধব নহে সেই ববিষযে পানী।।''
উত্তব - কুজ্ঝটিকা।

(১৬) ''আঁখিতে জনম তাব নহে আঁখিলাম।
মাবিকাটি বান্ধি ধবি নহে দুষ্ট খল।।
মাবিলে মধুব বোলো নহে সাধুজন।
হিঁযালি প্রবন্ধে কহে শ্রী কবিকঙ্কন।।''
উত্তব - ইক্ষু।

(১৭) জন্ম হৈতে গাছ বায রুধিব ভক্ষণ।
দুই জনে জড হৈলে অবশ্য মবণ।।
মবণ সময নর ছাড়ে হুহুঙ্কাব।
শ্রী কবিকঙ্কন গান হিঁযালিব সাব।।''
উত্তব - উকুন।

শুধু 'চণ্ডী মঙ্গল কাব্য' নয় 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'র 'গোলাহাট পালা'য দেখি যে লাউসেন ও কর্পূর সেন যখন সুরিক্ষার গরে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনেকটাই বাধ্য হযেছেন তখন ধর্মঠাকুরের কৃপায তাঁরা উদ্ধার পেলেও সুবিক্ষা তাদেরকে হেঁযালি সমস্যা' জিজ্ঞাসা করেছে। তাদের মধ্যে শর্ত হযেছিল যে যদি সুবিক্ষা হারে তাহলে তাদের মুক্তি আর যদি জযী হয তাহলে তাদেরকে সুরিক্ষার নির্দেশ পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্নগুলো উল্লেখ করা যাক। যেগুলো প্রকৃতিতে মূলত ধাঁধা।

(১) "যতন কবিযা জীবন গৃহ করে বন্ধ।
গৃহস্থজনাব মৃত্যু গৃহ সাঙ্গ হলে।
উত্তব - তসব গুটিব রুমি বা গুটি পোকা।

(২) কমলে কমল বিপু জন্ম লযে উঠে।
দেবতাব মাথায মুকুটে বৈসে ছুটে।
উত্তব - অৰ্দ্ধ চাঁদ।

(৩) নাস্তি মুখ মস্তকাদি নাস্তি হস্ত পা।
নাস্তিতু আকাব ভূমে নাস্তি বাপ মা।
নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে থাহার করে মনুষ্যের বক্ত।।"
উত্তর - চিন্তানল।

(৪) কাটিতে ঘাঘর ঘন কনু ঝুনু বাজে।
কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে।।
সুরিক্ষা বলেন রায শুনে লাগে ধান্দা।
আপনি প্রবেশ বনে জট থুয়ে বান্ধা।।
বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
জনেক পুরুষ তার জট ধরে টানে।।
সুরিক্ষা কহেন কহ হেঁয়ালির সন্ধি।
বিরল বাটে বন পালাল জল জন্তু বন্দী।।"
উত্তর - ধীবরের জাল।

(৫) "যার গর্ভে জন্ম লয় নাহি তার মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া।।
বাসিন্দা সবল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ।।
সবার সে হিত করে নয় দুষ্ট টক।"
উত্তর - আগুন।

(৬) "সুরিক্ষা কহেন শুন পুনঃ ওহে রায়।
জীবজন্তু নহে কিন্তু তপ্ত তপ্ত খায়।।
না পাইল শান্ত হয়ে চুপ করে থাকে।
খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি ডাকে।।

পেটের ভরে বমন করে গুঁজে নাকে মুখে।
নারীগুলা গলায় গেলায় বসে বুকে।।
যদি তায় নাহি খায় করয়ে প্রহার।''
উত্তর -চরকা।

(৭) খায় সে সহস্রমুখে পাক নাহি পায়।
উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায়।।
তার প্রহারের ঘায়ে পরিত্রাহি ডাকে।
আহার উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে।।''
উত্তর - মাকু।

সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন করেছিল সুরিক্ষা লাউসেনকে, যার উত্তর লাউসেনেরও অজানা। শুধু লাউসেন কেন, মহেশ্বরী ছাড়া কোন দেবতাই তা জানতেন না, পরে শিবের মাধ্যমে হনুমান সে উত্তর জেনে লাউসেনকে বলার ফলে লাউসেন সেই সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিলেন। প্রশ্নটি এরকম ঃ -

''বল দেখি আদি রস অঙ্গনার অঙ্গে।
কোন খানেবৈসে ধাতু সুরতি প্রসঙ্গে।।
সর্ব্বকাল থাকে কোথা ধরে কোন গুন।
শুনি সুচিন্তিত সেন বচন দারুণ।।''

উত্তর - ''নারীর বদন-বিধু মদন আলম।
তথা নিত্য নয়ন যুগলে ধাতু রয।।''

যদিও এর ভিন্ন পাঠও আছে। সেই মতে তা হলোঃ

''কামেশ্বর কামিক্ষা আছে কামিক্ষাতে।
নারীর ধাউত বসে রাম লোচনেতে।।''

এছাড়া রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে'র 'গোলাহাট পালা'য়ও সুরিক্ষা গণিকা মুক্তির শর্ত হিসেবে আরো একটি ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছে লাউসেনকে ঃ

''কাঙুরের কামাখ্যা কামিনীরূপে আইসে।
সর্বাঙ্গ থাকিতে নারীর ধাউত কোথা বৈসে।।''
উত্তর - যুবতীর চোখে।

এ থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে ধাঁধা বাঙালি লোকজীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল আছে।

প্রবাদ-প্রবচন ঃ প্রবাদ-প্রবচন লোক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে প্রবাদের জন্ম এবং তাদের মুখে মুখেই এগুলি লালিত হয়। এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষের, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মুখে মুখে বিচরণ করে পরবর্তি সময়ে এগুলো সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। প্রবাদের আভিধানিক অর্থ হলো 'প্রচলিত কথা', 'জনশ্রুতি', 'ডাকের কথা' ইত্যাদি। প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন ঃ

'প্রবাদ হলো গোষ্ঠী জীবনেব অভিজ্ঞতাব সংক্ষিপ্ততম সবস অভিব্যক্তি।'[১৬১]

ইংবাজীতে যাকে 'প্রভাব' বলে, বাংলা ভাষায তাই প্রবাদ। প্রবাদ সম্পর্কে স্পেন দেশীয একটি সংজ্ঞাব ইংরাজী অনুবাদ এই রকম ঃ

"A proverb is a short sentence based on long experience."[১৬২]

প্রবাদে মূলত দুটি অর্থ থাকে। একটি বাচ্যার্থ ও অন্যটি ব্যঙ্গার্থ। বাচ্যার্থ হলো আভিধানিক অর্থ এবং ব্যঙ্গার্থ হলো ব্যঞ্জনার্থ। প্রবাদের মূল্য এই ব্যঞ্জনার্থের জন্যই। বিভিন্ন বিষযকে কেন্দ্র কবে প্রবাদ গুলো গড়ে উঠে, যেমনঃ সমাজ, ইতিহাস, পুবাণ, ব্যক্তি, সামাজিক বীতি-নীতি ইত্যাদি। আরো বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা প্রবাদে প্রতিফলিত হয নি।

প্রবাদে সমাজ জীবন অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে চিত্রিত হযেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যেঃ

''আমাদেব কর্মময জীবনেব সুষ্ঠু প্রকাশ, বৈচিত্রময জীবনেব অভিজ্ঞতা, নীতি কথা, তত্ত্বকথা, বসিকতা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিবাশা, প্রেম-প্রীতি, মিলন-বিচ্ছেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, নিন্দা-প্রশংসা, যাত্রা-অযাত্রা, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, কৃষি, স্বাস্থ, শিল্প-বাণিজ্য, মেঘ-বৃষ্টি, খডা-বাদল, আকাল-সুকাল, চুবি-ডাকাতি, শত্রুতা-মিত্রতা, প্রভৃতি কোন কিছুই প্রবাদ কাবেব আওতাব বাইবে নয।''[১৬৩]

মঙ্গলকাব্য গুলোব মধ্যে এরকম অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচনের সন্ধান পাওযা যায। লোকজীবন থেকে সংগৃহীত এই প্রবাদ-প্রবচন গুলি লোকজীবন সম্পর্কে কবিদেব গভীর অভিজ্ঞতারই প্রকাশ। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ নিযে আলোচনা করলেই বিষযটি স্পষ্ট হবে।

(১) 'স্ত্রীবে যে আপন বলে সে জন বর্বর' - বিজয গুপ্তের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে ব্যবহৃত এই প্রবাদের মধ্য দিযে পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয কবা যায। নারী সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সূচক এই উক্তির মধ্য দিযে অন্তত একথা স্পষ্ট হযে যায যে সমাজে তখন নাবীদের খুব মর্যাদার চোখে দেখা হত না।

(২) 'সহমৃতা হইতে আম্রের ডাল ভাঙ্গে' - মধ্যযুগে নারীরা স্বামীর সাথে সহমরণে যেত। আর সহমরণে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হত আমের ডাল ভেঙ্গে। সমাজের এই নিষ্ঠুর সত্যটিই ভাষায় রূপ পেয়েছে প্রবাদের মাধ্যমে।

(৩) 'উর্দ্ধ আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি'-এই প্রবাদের মধ্যে দুটি অর্থ প্রতীযমান। বাক্যটির বাচ্যার্থ হলো ঘি সংগ্রহের জন্য আঙ্গুলকে কিছুটা বাঁকা করার প্রযোজন আর এর ব্যঙ্গার্থ হলো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করতে কূট বুদ্ধির প্রয়োজন।

(৪) 'দৈবের নির্ব্বন্ধ তান না যাযে খণ্ডন' - দ্বিজমাধব।

(৫) 'দৈবের নির্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়' - বিজয় গুপ্ত।

(৬) 'বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন' - দ্বিজমাধব।

প্রবাদ সংখ্যা (৪) (৫) ও (৬) এর মধ্য দিয়ে মানুষের অসহায়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে। যখনই কোন কিছু মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তখনই মানুষ দৈবের উপর নির্ভর করে, পরিণামে যা কিছু ঘটে তাকে দৈবের নির্বন্ধ বলে মেনে নেয়।

(৭) 'জনম হইলে হয অবশ্য মবণ'-
(৮) 'জনম লভিলে তবে অবশ্য মবণ'-
(৯) 'জন্মিলে মবণ আছে এডাবাব নই'-
(১০) 'জন্মিলে মবণ আছে এডাবাব নয'

প্রবাদ সংখ্য (৭) (৮) (৯) ও (১০) এ জীবনেব একটি চিবন্তন সত্য উদ্ঘাটিত হযেছে। মানুষ সুদীর্ঘ কাল ধবে উপলব্ধি কবেছে যে এ সংসাবে যা কিছু আছে সবকিছুবই শেষ আছে। এই বিশ্ব সংসাবেব সকল প্রাণীবই জন্ম হয এবং একটা নিদৃষ্ট সময পর্যন্ত তাবা বেঁচে থাকে। অবশেষে একদিন তাবা এই পৃথিবী থেকে বিদায নেয। মানুষও এব থেকে আলাদা নয । দীর্ঘ দিন থেকে সঞ্চয় কবা অভিজ্ঞতা থেকেই এই প্রবাদেব সৃষ্টি।

(১১) 'ব্রাহ্মণেব বাক্য আমি নাবী খণ্ডাইবাবে'-মধ্যযুগেব বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায ব্রাহ্মণবা ছিলেন সবাব শীর্ষে। এক সময ছিল যখন ব্রাহ্মণেব কথা বেদবাক্যেব মত পালন কবা হত। তাবাই ছিলেন সমাজেব বিধান দাতা। তাই তাদেব বাক্য এডানোব সাধ্যও কাবোব ছিলনা। তাই প্রবাদটিতে ভয ও ভক্তি দুটোবই প্রকাশ লক্ষণীয।

(১২) ''কাকেব মুখেতে যেন শোভে পাকা বেল
বানবেব মুখে যেন ঝুনা নাবিকেল।''
(১৩) ''বানবেব হাতে দিলা ঝুনা নাবিকেল
খাইতে না পাবে বানব গাযে নাই তাব বল।''
(১৪) ''বালকেব মুখে যেন ঝুনা নাবিকেল
কাকেব মুখেতে জেন দেখি পাকা বেল।'' -

প্রবাদ সংখ্যা (১২), (১৩) ও (১৪) তে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপেব প্রকাশ লক্ষ্যণীয। বাইশ কবি পদ্মাপুবাণে বর্ণিত আছে যে গৌবীকে লুকিযে কমল বনে যাবাব জন্য শিব বওযানা হলে গৌবী ডোমনী বেশে নৌকায বসে থাকেন। শিব এসে ডোমনীব রূপে মুগ্ধ হযে তাব সাথে 'বতিক্রিডা' কবাব প্রস্তাব দিলে ডোমনীরূপী গৌবী শিবকে ব্যঙ্গ কবে এই প্রবাদটি বলেছিলেন। এর ব্যঞ্জনার্থ হলো 'যোগ্য নয এমন'।

(১৫) 'মৎস্য হইযা কুম্ভিবেব সনে কব বাস' -

প্রবাদটিতে সমাজেব সবল ও দুর্বলেব কথা বলা হযেছে। সবল আব দুর্বল বলতে 'হেভ' এবং 'হেভ নট্' এব কথাই সম্ভবত বলা হযেছে কুমীব ও মৎস্যেব রূপকে। জলে কুমীব মৎস্যদেব প্রতি যে অত্যাচাব কবে। যখন তখন মৎস্য শিকাব কবে উদবপূর্তি কবে। ঠিক তেমনিভাবে আমাদেব সমাজেও কুমীবরূপী সবল মানুষদেব করুণাব উপবই মৎস্যরূপী দুর্বল মানুষদেব বাঁচা না বাঁচা নির্ভব কবে। মানুষেব উপলব্ধিজাত এই অভিজ্ঞতাই প্রবাদটিতে ব্যক্ত হযেছে।

(১৬) 'বিপত্যেব কালে কেহ না মিলে সখা'-

এই প্রবাদটিতেও মানুষেব দীর্ঘদিনেব অভিজ্ঞতা কাজ কবেছে। মানুষ প্রত্যক্ষ কবেছে যে সুসমযে সবাই কাছে থাকে। কিন্তু সময খাবাপ হলে অর্থাৎ হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হলেই তাবা ধীবে ধীবে কেটে পডে। এই ধ্রুব সত্যটিই এই প্রবাদে তুলে ধবা হযেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মনসা মঙ্গলকাব্য

মনসা মঙ্গলকাব্য ও লোককথা

মঙ্গলকাব্য ধারায় সবচেয়ে প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্য। কাব্যটির প্রাচীনতম রচয়িতা কানা হরিদত্ত। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাসপিপ্‌লাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ কবিরা মনসামঙ্গল রচনায় যথেষ্ঠ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কাব্যটি লৌকিক ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে রচিত। যদিও পুরাণ অপেক্ষা লৌকিক ঐতিহ্যের উপস্থিতি কাব্যে খুব বেশি লক্ষ করা যায়। কাব্য কাহিনিকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে 'মনসামঙ্গল' এর কাহিনি গঠনে পুরাণের উপস্থিতি খুবই স্বল্প। সর্পকূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা, যিনি নাকি শিবের কন্যা ও জরতকারু মুনির পত্নী। দেবী মনসার পদ্মপাতা থেকে জন্ম তাই তাঁর অপর নাম পদ্মা। একদিন কালিদহ থেকে শিবের সাথে মনসা এসে উপস্থিত হন শিব গৃহে। শিব তাকে ফুলের ঝারির মধ্যে লুকিয়ে রাখলেও চণ্ডী তাকে দেখে ফেলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পুনঃপুন আঘাতে জর্জরিত করেন। যার ফলে মনসার একটি চোখ কানা হয়ে যায় । মনসাও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের বিষ দৃষ্টি দিয়ে চণ্ডীকে হত্যা করেন। পরে পিতা মহাদেবের অনুরোধে তিনি মাতা চণ্ডীকে পুনর্জীবীত করেন। পুনর্জীবন লাভ করেও চণ্ডী মনসার সাথে কোন ধরণের সমঝোতা না করে শিবকে বলেন মনসাকে তাড়িয়ে দিতে। তখন শিব মনসাকে নিয়ে বেরুলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। যেতে যেতে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পথের মধ্যে পর্বতের উপর একটি সিজ বৃক্ষের নিচে ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর হঠাৎ ঘুম ভাঙলে শিব মনসাকে সেখানেই রেখে আসার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের সন্তানকে এভাবে ফেলে আসতে শিবের মন সায় দিচ্ছিল না। দুঃখে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, এবং সেই বেদনাশ্রু মাটিতে গড়িয়ে পড়লে তার থেকে জন্ম হয় নেতার। জন্মের পর নেতা শিবকে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। অবশেষে মহাজ্ঞানের অধিকারি শিবের কাছ থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেই সে শিবকে ছাড়তে রাজি হল। বিশ্বকর্মা সুজুয়া পর্বতে পদ্মার জন্য পুরি নির্মাণ করে দিলেন। মনসা ও নেতা সেখানেই থাকতে লাগলেন।

এদিকে ঋষিদুর্বাশার শাপে ইন্দ্র লক্ষী হারা হলেন। লক্ষীর সঙ্গে ইন্দ্রের ঐশ্বর্যও ক্ষীরোদসাগরে আশ্রয় নিলে দেবতারা সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হলেন। মন্দার পর্বত ও বাসুকির সাহায্যে মন্থনের কাজ শেষ হলে লক্ষী সহ ঐরাবত চন্দ্র সমস্ত কিছুই উঠে আসল। সবশেষে অমৃত হাতে ধন্বন্তরির আবির্ভাব হলো। বিষ্ণু মোহিনী বেশ ধারন করে অসুরদের প্রতারিত

করে সমস্ত অমৃত দেবতাদেরে দিয়ে দেওয়ায় দৈত্য কুল অসন্তুষ্ট হল। অসন্তুষ্ট হলেন শিবও। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের কপটতায় দ্বিতীয়বার সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হয় বিষ। অসুর এবং বাসুকী সেখান থেকে পালিয়ে গেলে, হনুমানের অনুরোধে শিব সেই বিষ পান করে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে নারদের কাছে খবর পেয়ে চণ্ডী মনসার শরন্নাপন্ন হলে বিষমন্ত্র উচ্চারণ করে মনসা শিবকে বাঁচিয়ে তুললেন।

তারপর যথাসময়ে মনসার বিয়ের জন্য বর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন শিব। পাত্র খুঁজেও পেলেন। ধ্যানলব্ধ পাত্র জরৎকারু ও বশিষ্ঠের সাথে মনসা ও নেতার বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিয়ের পর মনসার সাহচর্য থেকে বিদায় নেন জরৎকারু। তারপর কাহিনির অগ্রগতিতে দেখি যে মনসার গর্ভে জরৎকারুর ঔরসজাত সন্তান আস্তিক ভুমিষ্ঠ হলো। মনসা তাকে সিজুয়া পর্বতে মাসীর তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন। পরবর্তি সময়ে এই আস্তিকই জম্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞের আগুনে নির্মূল হওয়া থেকে নাগ কূলকে বাঁচিয়ে ছিলেন, এই পর্যন্ত বর্ণিত কাহিনি পৌরাণিক। কিন্তু তারপর চাঁদসাগরের কাহিনি যেখান থেকে শুরু সেখান থেকে কাব্যের শেষ অবধি পুরোপুরি লৌকিক কাহিনি।

'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসার যে জম্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, বল্লুকার তীরে শিব ধর্মনিরঞ্জনের দর্শনের আশায় বারো বছর কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। আর ধর্ম এদিকে শিবের বাসায় এসে শিবের সাক্ষাৎ না পেয়ে চলে গেলেন। এরপর থেকে শিব জপ্-তপ্, ধ্যান সব কিছুই ঘরে বসে করতেন। অভ্যাসবশত শিব প্রত্যেক দিন কালিদহে ফুল তুলতে যান। এমনিভাবে একদিন বসন্ত কালে কালিদহে ফুল তুলতে গিয়ে সর্বত্র বিহগলীলা দেখে শিব কামতপ্ত হয়ে পড়লে পদ্ম পাতায় তার স্খলন হয়, এর পর পদ্মপাতা থেকে জলে এবং সেখান থেকে তা পাতালে চলে যায়। বাসুকীর মা নির্মাণ কুশলী, তিনি সেখানে সেই রেত বিন্দু থেকে অত্যন্ত যত্নের সাথে সৃষ্টি করেন মনসাকে। এই জম্ম বৃত্তান্ত লোকসাহিত্যে super natural birth motif নামে অভিহিত। শুধু মনসা নয় নেতার রূপবদলের ও উল্লেখ আছে মনসামঙ্গল কাব্যে।

সাধারণ ভাবে 'মনসামঙ্গল' বলতেই কোনো পৌরাণিক কাহিনি আমাদের মনের মনিকঠোয় উঁকিমারে, কিন্তু আদৌ তা নয়। কাব্যটি পাঠ করলেই বুঝা যায় যে পৌরাণিক থেকে লৌকিক বিষয় বস্তুই এরমূল উপজীব্য। একথা বলাই বাহুল্য যে মনসামঙ্গলের কাহিনি বিভিন্ন ব্রতকথা, লোককথা, পাঁচালি, রূপকথা থেকে গৃহীত। দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংকলিত ঠাকুরদার ঝুলির 'মালঞ্চমালা' গল্পে দেখা যায় যে ষষ্ঠীর রাত্রে শিশু রাজপুত্রের শিয়রে 'ধারাতারা' বিধাতার আবির্ভাব ঘটেছে। শিশুর ললাটে তারা ভাগ্যলিপি এঁকে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'ধারাতারাই' মানুষের ভাগ্যলিপি নির্দ্ধারন করে থাকেন। গল্পে পাই ঃ

> ''ঘরে গিয়া প্রথমে ধারা বিদ্যার আঁক, বুদ্ধির আঁক, ধনজন যত ঐশর্য্যের আঁক দিলেন, হাতে পতাকা, গায়ে পদ্ম সকল দেখিয়া দেখিয়া এক প্রহর ধরিয়া লিখিয়া লিখিয়া যত কলম ধারার ফুরাইয়া গেল।''[১]

ফুরাইয়া গেলে তারা আসিয়া কলম নিলেন, নিয়া এক কলম দিয়া কপালে ছুঁয়াতেই তারা কলম ফেলিযা দিয়া উঠিলেন, ধারা বলিলেন কি দেখিলে? মুখ ফিরাইয়া তারা বলিলেন, 'কি আর দেখিব চল যাই, রাজপুত্রের আয়ূ মাত্র বারোদিন''[২]

প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে ধারা তারা প্রদত্ত ভাগ্যলিপি অখণ্ডনীয়, কিন্তু এই অসম্ভব কে সম্ভব করেছে কোটালকন্যা মালঞ্চমালা। বারো বছরের মালঞ্চমালার সাথে বারোদিনের রাজপুত্রের বিয়ে হয়, বিয়ের রাতেই রাজপুত্রের মৃত্যু হয়। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে মালঞ্চমালা মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছে। সেজন্য অবশ্য তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এই ধারনা মঙ্গল কবিরা লোক কথা থেকে নিয়েছেন একথা ভাবা অসঙ্গত নয়। মনসামঙ্গল কাব্যেও দেখা যায় বাসর রাতে স্বর্পদংশনে মৃত স্বামীকে বেহুলা অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে পুনর্জীবিত করে তুলেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে লোক সমাজ অদৃষ্টে বিশ্বাসী, সেই লোকসমাজই ললাট লিখনের উপর স্থান দেয় ইচ্ছা শক্তিকে, যার মাধ্যমে মালঞ্চমালা মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছে, বেহুলার মধ্যেও সেই ইচ্ছাশক্তি প্রবল, তাই মালঞ্চমালার মত সেও সফল হয়েছে নিজের অভীষ্ট সাধনে। তাদের এই ইচ্ছাশক্তি পুরুষ্কারেরই নামান্তর, মালঞ্চমালা, বেহুলা দুজনেরই ত্যাগ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সংগ্রামশীলতায় পুরুষ্কারের পরিচয়ই লভ্য।

মনসামঙ্গল কাব্য সম্পর্কে আলোচনায় কালরাত্রি সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিয়ের পরবর্তি রাত হলো কালরাত। এই কালরাতে নবদম্পতির সহবাস নিষিদ্ধ। সিংহল রাজকন্যা সুমিত্রাকে বিয়ে করে ফেরার সময় রাজা দশরথ কালরাত্রিতে সুমিত্রার সঙ্গে সহবাস করেছিলেন। আর তার ফলে রামায়ণ কাহিনির অগ্রগতিতে আমরা দেখেছি যে রাজা দশরথকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি পুত্র বিচ্ছেদের নিদারুন শোকে অকালে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে। কালরাত্রি সম্পর্কিত এই লোকবিশ্বাস থেকে মৈমনসিংহ গীতিকার মলুয়া পালায় বলা হয়েছে ঃ

''কাল রাত্রে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা।
এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখা শুনা''[৩]

'মনসামঙ্গল' কাব্যেও দেখি কাল রাত্রিতেই লক্ষীন্দরের মৃত্যু হয়। ফলে কবিদের এই ভাবনা যে লোককথা জাত তা ভাবতে অসুবিধে হয় না। এখানে মঙ্গল কবিরা লোককথা থেকে ঋন গ্রহণ করেছেন তাছাড়া দৈবকৃপায় পুত্রলাভের ব্যাপারটিও পুরোপুরি লোককথা থেকেই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। 'ঠাকুরদাদার ঝুলির' 'মধুমালা' গল্পের রাজা নিঃসন্তান ছিলেন, পরে দৈব কৃপায় তিনি পুত্র লাভ করেছেন। গল্পে দেখি যে সন্ন্যাসী ছদ্মবেশধারী বিধাতা পুরুষের নির্দেশে বংশ পাখীর মাংস খেয়ে রাজা সুযোগ্য বংশধর লাভ করেছেন। তাছাড়া ঠাকুরমার ঝুলির 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পের সাত রানীও নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন রানীর নদীর ঘাটে স্নান করতে গেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী বড় রানীর হাতে একটি শিকড় দিয়ে বললেনঃ

''এইটি বাটিয়া সাত রানীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।''[৪] বাস্তবে হয়েছেও তাই।

'মনসামঙ্গল' কাব্যেও দেখি যে ছয় ছেলেকে হারানোর পর রাজা চন্দ্রধর মনসার কৃপায়ই পুত্ররূপে লক্ষীন্দরকে লাভ করেছিলেন।

লোক কথায় অনেক সময় দেখা যায় যে পরিবারের ছোটরা অসাধ্য সাধন করেছে। যাকে (successful youngest son/daughter or daughter in law motif) বলে। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে দেখিযে কোন এক রাজার সাতরানী। বড় ছয় রানীর কোন সন্তান নেই, শুধু ছোট রানীর গর্ভে একে একে সাত ছেলে ও এক মেয়ে হলে, বড় ছয় রানী মিলে সবকটি ছেলে মেযেকে পাঁসগাদাতে পুতে ফেলল এবং রাজাকে বলল ছোট রানী ইঁদুর কাঁকড়ার জন্ম দিয়েছে। রাজা তখন ছোট রানীকে তাড়িয়ে দিলেন। আর ছোট রানী অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, ঘুটে কুড়োনীর কাজ করে আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কখন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত করতে পারবে। অবশেষে সময় একদিন এলো। কারণ যে পাঁশগাদাতে ছোট রানীর ছেলে মেয়েকে পুঁতে ফেলা হয়েছিল সেখানে সাতটি চাঁপা ও একটি পারুল গাছ জন্মাল। স্বভাবতই তাতে ফুল ফুটল, রাজ কর্মচারীরা সেথায় ফুল আনতে গেলে সেই গাছগুলি বলে উঠে "আগে আসুক রাজার ঘুটে কুড়োনী দাসী তবে দেব ফুল।"[৫] অবশেষে রাজার আদেশে ঘুটে কুড়োনী দাসী এলে সেই সাতটি চাঁপা ও পারুল গাছ মা'বলে সাত ভাই ও বোন হয়ে ঝাপিয়ে পড়ল মায়ের কোলে। রাজা তখন সমস্ত কিছু বুঝতে পারলেন, তাই বড় রানীদের প্রানদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এইভাবেই ছোট রানী অসহনীয় যন্ত্রনা সহ্য করে সত্য উদ্‌ঘাটন করল। এছাড়াও বাংলাদেশেও আরো অনেক লোককথা আছে, যেখানে রাজা তার কনিষ্ঠা রানী ও সন্তানকে বনে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় যে এই কনিষ্ঠা রানীর সন্তাই নানা অসাধ্য সাধন করে রাজা সহ সকলের প্রাণ রক্ষা করেছে, তার ফলে তারা রাজার অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও লোক কথায় দেখি যে সাত পুত্রের জনক রাজা কিংবা সদাগরের কাহিনিতে একমাত্র কনিষ্ট পুত্রই নায়কত্ব লাভ করে থাকে। অন্যান্য পুত্রদের কোন পরিচয় প্রকাশ পায় না। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদসাগরের কাহিনিতে তাই দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর সাত পুত্র ও পুত্রবধু ছিল কিন্তু এর মধ্যে থেকে তার কনিষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূই কাহিনির মধ্য দিয়ে নিজেদের সুস্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ছোট বধূ মৃত স্বামী সহ ছয় ভাসুর ও চৌদডিঙা মধুকর পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিল। এই ধারনাও মনে হয় মঙ্গলকবিরা লোককথা থেকেই গ্রহণ করেছেন।

মনসামঙ্গল কাব্যে লখীন্দর ও তার ছয় ভাই এর পুর্নজীবন লাভ ও শঙ্করগাড়ুরী- নেতা কর্তৃক মৃত মানুষ বাঁচিয়ে তোলার মধ্যদিয়ে Resuscitation motif বা পুর্নজীবন লাভের অভিপ্রায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, লালবিহারীদের 'ফোক টেইলস অব বেঙ্গল' গ্রন্থে দেখি যে সন্তানহীন রাজার রানীকে ফকির ঔষধ দিয়ে গেল সন্তান লাভের জন্য। ডালিমের রসে মেড়ে ঔষধটি খেতে হবে। যথাসময়ে রানীর ছেলে হলো নাম রাখা হলো ডালিমকুমার। ফকির বলেছিলেন যে তার প্রাণ বাঁধা থাকবে সামনের ঐ দীঘির একটি বুয়াল মাছের কলজেতে কাঁচের কৌটোর মধ্যে সোনার হারের সঙ্গে। ধীরে ধীরে ডালিম কুমার বড় হল। রাজার অন্য আরেক রানী ছিল, সে ছেলেকে ভালবাসেনা কারণ তার নিজের কোন সন্তান

ছিল না। সেই রানী ডালিম কুমারের প্রাণের খবর কোনো ভাবে পেয়ে যায়। তাই অসুখের ভান করে কবিরাজের সঙ্গে মিলে একটা ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী রানীর অসুখ ভালো হবার জন্য বোয়াল মাছের প্রয়োজন। যথাসময়ে বোয়াল মাছটিকে ধরা হলো এবং মাছের কলেজ থেকে সেই কৌটো বের করে আনা হল। সেটা থেকে সেই হার বের কর রানী গলায় পরলে ডালিম কুমারের মৃত্যু হয়ে যায়। আবার হার খুলে রাখলে ডালিম কুমার পুনরায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। এভাবেই দিন চলতে থাকে অবশেষে একদিন কোটাল স্ত্রী কৌশলে হারটি নিয়ে এল, ডালিম কুমার আবার বেঁচে উঠল। পুর্নজীবন লাভের এই ধারনা মঙ্গলকবিরা লোককথা থেকেই সম্ভবত নিয়েছিলেন। বিভিন্ন উপায়ে এই পুর্নজীবন লাভ হতে পারে। ইংরাজি লোক কথায় একটা কথা আছে যে ঃ

The parts of the dismembered corpse are brought together and revised. [১]

লখীন্দর ও তার ভাইদের পুর্নজীবন লাভ লম্ভবত এই ধারণা থেকেই হযেছে। অতএব একথা বলা যায় যে মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনির পরিণতিতে লোক সাহিত্যেরই একটি বিষয় অবলম্বন করা হয়েছে। মঙ্গল কাব্যে এই বিষয়ে কোন মৌলিকতা নেই।

লালবিহারীদের 'Folk tales of Bengal' গ্রন্থের 'The man who wished to be perfect' গল্পেদেখি ঃ

> ''বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে, অন্দর মহলের উঠানে বড় রাজ পুত্র একটি গাছ পুঁতে মা বাবাকে আর ভাইকে বলল, এই গাছটি আমার প্রাণ। যতক্ষণ একে সবুজ সতেজ দেখবে বুঝবে আমি খুব ভালো আছি, যদি কখনো দেখো গাছের খানিকটা জায়গা শুকিয়ে গেছে, বুঝবে আমার অবস্থা ভালো নয়। গাছটাব আগা গোড়া শুকালে বুঝবে আমি আর নেই।''[২]

পরবর্তি সময়ে রাজপুত্র যখন বিপদে পড়েছে, সত্যিই তখন গাছেরও পাতা শুকাতে শুরু করেছে, গাছের সঙ্গে যোগ রয়েছে রাজপুত্রের প্রাণের । রাজপুত্রের অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে গাছেরও অবস্থা পরিবর্তিত হযেছে। এখানে গাছ হয়ে উঠল জীবন চিহ্ন। অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এ ধরণের বিশ্বাস সক্রিয়।

মনসামঙ্গল কাব্যেও দেখি যে সর্পাঘাতে মৃত স্বামীর দেহ কলার মান্দাসে নিয়ে ভেসে যাওয়ার আগে বেহুলা শাশুড়িকে জানিয়েছে ঃ

> ''হের দেখি শাইল ধান সিজান সুখান
> ভাজা কলাই দেহ করে ঠন ঠন।
> আর দেখ হরিদ্রা সিজান সুখান।
> এই তিন দ্রব্যে দেক থুইলাম বিদ্যমান।
> সিজান ধানেতে যদি মেলয়ে অঙ্কুর
> তবে জানিবা বেউলা গেল দেবপুর।
> সিদ্ধ হরিদ্রায় যদি মেলিলেক গেজ
> তবে জানিবা বেউলা সাধলেক নিজকাজ

ভাজা কলাই যদি মেলিলেক পাত
তবে জানিবা বেউলা জিয়াইল প্রাণনাথ।
আকসালে চড়াইদিভাত হেটে নাই জ্বাল।
সম্পূর্ণ জল দিয়া এড়িদি চিরকাল।
বিনা জ্বালে ফোটে যদি সেই ভাত হাড়ি।
তবে সে জানিবা বেউলা দেশেতে বাহুরি।।''[৮]

কোন কিছুকে জীবন চিহ্ন হিসেবে কল্পনা করার এই অভিপ্রায মঙ্গল কবিরা লোককথা থেকে যে গ্রহণ করেছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার লোকসাহিত্যে একটি জিনিষ লক্ষ করার মত যে প্রায় প্রতিটি জাতির মনে একটি বিশ্বাস বদ্ধ পরিকর যে মানুষ মরে যাবার পর তার দেহ ধ্বংস হযে গেলেও আত্মা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায না। সেই আত্মা কোন ক্ষুদ্রতর জীবকে আশ্রয করে থাকে। একজন পাশ্চাত্য লোকশ্রুতিবিদ বলেছেনঃ

"Sometimes it is thought of as having the form of a mouse, or bird or butterfly which leaves the mouth at the supreme moment"[৯]

মনসামঙ্গল কাব্যেও দেখি যে উষা - অনিরুদ্ধ আগুনে ঝাপ দিযে আত্মহত্যা করলে তাদের দেহ পুড়ে ছাই হওয়ার সাথে সাথে দুটি ভ্রমর উড়তে লাগল । বিষ্ণু পালের কাব্যে পাই ঃ

''সোনার পুতুলি দুটি ছাই হঞা গেল ভ্রমর-ভ্রমরী দুটি উড়িতে লাগিল।''[১০]

সুতরাং এখানেও যে মঙ্গল কবিরা লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তা বলাই বাহুল্য। আর পুর্নজীবন লাভের বিষয়টি লোককথারই সাধারণ বিষয। মার্কিন লোক সাহিত্যে "Enchanted Prince" শীর্ষক কাহিনিতে দেখতে পাওয়া যায যে ঃ

"At the prince's birth it is propheised that he will meet his death from a serpent. To forestall this fate he is confined to his tower, when he grown up, however he sets out on adventures a finds a king who will gives his daughter in marriage -- the marriage takes place. In later parts of the story the princes saves his wife from a snake"[১১]

পাশ্চাত্যের এই লোককথায় সাথে মনসামঙ্গল কাব্য কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে। আর সর্পদংশনে লখীন্দরের মৃত্যু এবং অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সাধ্বী স্ত্রী বেহুলার সহায়তায় স্বামীর পুর্নজীবন লাভ, এই ধারণা মঙ্গল কবিরা লোককথা থেকেই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।

প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিটি ভাষার লোকসাহিত্যে দেখা যায় যে সতী নারীরা অলৌকিক শক্তির অধিকারিনী হয়। যার ফলে তারা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়। 'মনসামঙ্গল' কাব্যেও দেখি যে বেহুলা অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ঃ সর্পপরীক্ষা, ক্ষুরধার পরীক্ষা, জল পরীক্ষা, শূণ্য পরীক্ষা, তুলা পরীক্ষা-এরকম বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেহুলাকে নিজের শুচিতার পরিচয় দিতে হয়েছে। এছাড়াও

গোদা, ধনামনা, ঘাটওয়ালা, টেট্‌না প্রভৃতির পাপ অভিলাষ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেহুলা যেভাবে দেবপুরিতে গেছেন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অলৌকিক শক্তির অধিকারীনি বলেই বেহুলার পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। রামায়ণে সীতাকে শুচিতা প্রমাণের জন্য অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল । তাই একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে রামায়ন কাহিনি থেকে আনুপ্রাণিত হযে মঙ্গল কবিরা হযত এমনটা করেছেন। কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়, কারণ রামায়নে সীতার অগ্নিপরীক্ষার তুলনায় বেহুলাকে যে অনেক বেশী পরীক্ষাদিতে হয়েছে একথা ভুললে চলবেনা। অষ্টপরীক্ষার মধ্য দিয়ে বেহুলা তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করেছেন। রামায়নের প্রভাবে যদি তা হত তাহলে বেহুলাকে শুধু অগ্নীপরীক্ষাই দিতে হত। পাশ্চাত্য লোকসাহিত্যবিদ্‌গন এই বিষযটিকে "chasity test motif" বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য লোকসাহিত্য সমালোচক বলেছেন ঃ

"Many forms of testing are found in folklore and legend ; they are generally connected with ordeal. The test by fire is the most common"[১১]

সুতরাং একথা বলা যেতেই পারে যে মঙ্গল কবিরা এই ধারনা লোকসাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্র থেকে নিয়েছেন ।

'মনসামঙ্গল' কাব্যের মূল বিষয় হলো মনসার প্রতিহিংসা চরিতার্থতা। সাপের প্রতিহিংসা প্রত্যেক দেশের লোক সাহিত্যের সাধারণ বিষয়। ইংরাজিতে তাকে বলে "revengeful serpent motif" 'injured snake avenges' নামেও লোকসাহিত্যের একটি motif আছে। যাকে মনসামঙ্গল কাহিনির ভিত্তি বলে স্বীকার কার যায়, এ সম্পর্কে বিখ্যাত লোকসাহিত্য সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন ঃ

"injury বা আঘাত যে সর্বদাই শারীরিক হইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই, সর্পের পক্ষে যে আঘাত শারীরিক, সর্পের অধিষ্টাত্রী দেবীর পক্ষে তাহাই মানসিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অতএব ইহাও মনসামঙ্গল কাব্যের মৌলিক বিষয় বলিয়া গন্য হইতে পারে।''[১৩]

সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য যে এখানেও মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি লোকসাহিত্যের প্রেরণা থেকে জাত।

মনসামঙ্গল কাব্যে আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মত তা হলো দেবীর বহুরূপ ধারন। কখনো মানবী হয়ে মহাজ্ঞানহরন, আবার কখনও বা ব্যাঘ্ররুপ ধারন, এই যে রূপ বদল করা লোকসাহিত্যে একে বলে transformation motif। শুধু মনসা নয় নেতার রূপবদলের উল্লেখ আছে মনসামঙ্গল কাব্যে -

''পদ্মার বচন নেতা শুনিয়া শ্রবণে
গাভী রূপ ধরি গেলা ওঝার ভবনে।।''[১৪]

মনসামঙ্গলের কবিরা এই ধারনা যে লোক কথা থেকে নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ লোককথায় এরকম অনেক কাহিনি আছে যেখানে রাক্ষস নিজের রূপ পাল্টে মানুষ হয়ে যায়। এরকম একটি গল্প হলো দ্য স্টোরি অব দ্য রাক্ষস্‌স'। সেখানে দেখি এক

অলস বামুন। খুব গরীব। পাশের রাজ্যের রাজার মায়ের শ্রাদ্ধ। তাই বৌ তাকে ঠেলে পাঠাল সেখানে, কারণ সেখানে গেলে হয়ত কিছু পাওয়া যাবে। বোকা বামুন রাস্তা ভুল করে চলে যায় রাক্ষসদের রাজ্যে। সেখানে গিয়ে দেখে একটি সুন্দরী মেয়ে একটি ঘরে বসে আছে। সে ব্রাহ্মণকে ডাকল। ক্ষুধার্ত বামুন সেখানে গেলে সেই সুন্দরী মানবী বেশধারী রাক্ষসী বামুনকে বলল। সে নাকি তার বউ। তাই অন্য বউকে নিয়ে সেখানে পাকাপাকি ভাবে চলে যেতে বলল। রাক্ষসীর মায়ায় ভুলে গিয়ে ব্রাহ্মণ তার বউকে নিয়ে সে রাজ্যেই গিয়ে থাকতে লাগল। সেখানে দিনগুলো তাদের সুখেই কাটছিল। একদিন বামনীর সন্দেহ হলো যে ওই মেয়েলোকটা নিশ্চয় রাক্ষসী। কারন বামুন হরিণ মেরে আনে আর রাক্ষসী লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা মাংস খায় । ইতিমধ্যে বামনীর ও রক্ষসীর গর্ভে বামুনের দুটি ছেলে হলো । একদিন রাক্ষসী বামুনের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে যাবে বলে তাকে খেয়ে ফেলে। অবশেষে একদিন রাক্ষসীর ছেলেই রাক্ষসীকে মেরে ফেলে। লোককথায় এ ধরনের অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। মঙ্গল কবিরা হয়ত এর থেকেই রূপবদলের বিষয়টি গ্রহণ করে থাকবেন।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের লোক কথায় খুব পরিচিত একটা motif (মোটিফ) হলো abandoned children motif. কখনও একটি, কখনও দুটি আবার কখনও বা সাতটি এমন কি কখনো কখনো সব সন্তানও পরিত্যক্ত হয়। যে কারণে পরিত্যক্ত হয় সেগুলো হলো আর্থিক অনটন, সামাজিক নির্দেশ, রুগ্নতা, নিষিদ্ধ সম্পর্কজাত পিতৃত্ব-মাতৃত্ব, দুর্ভিক্ষ, ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা, কোন কোন সময় ভবিষ্যৎ বাণী সফল হওয়ার আশায় পিতা-মাতা সন্তানদের পরিত্যাগ করে, এর বিনিময়ে অশেষ ধন-সম্পদ লাভ হয়। সৎ মায়ের ঈর্ষার ফলেও শিশু পরিত্যক্ত হয়। আর অনেক সময় এইসব পরিত্যক্ত শিশুরাই ভাগ্যবান হয়ে ফিরে আসে, অসাধ্য সাধন করে।

বাংলা লোক সাহিত্যে প্রচলিত একটি লোক কথায় দেখি যে ভবিষ্যৎবাণী থেকে মুক্তি লাভের জন্য ও সৎমা'র প্ররোচনায় পিতা নিজের সন্তানকে কিভাবে পরিত্যাগ করেছেন। কাহিনিটি সংক্ষেপে এরকম - দেবতার আরাধনা করে নিঃসন্তান রাজার দুই রাণী পুত্রবতী হলেন। সুয়োরাণীর প্রথমে ছেলে হল, তারপরে দুয়ো রাণীর। এক জ্যোতিষী এসে বলল যে ছোট ছেলের মুখ দর্শন করলে রাজা অন্ধ হয়ে যাবেন। ভবিষ্যৎ বাণী শুনা মাত্র রাজা দুরের এক প্রাসাদে দুয়ো রাণী আর তার ছেলেকে নির্বাসন দিলেন। এই নির্বাসনের পেছনে অবশ্য সুয়োরাণীর প্ররোচনা কাজ করছিল। যাই হোক ছোট ছেলে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে মায়ের সাথে একটু একটু করে বেড়ে উঠছিল। একদিন এক সন্ন্যাসী ছোট ছেলেকে একটা তরবারি দিলেন। তরবারি যেখানে মন চাইবে সেখানে নিয়ে যাবে। সব যুদ্ধে সে জয়ী হবে। এদিকে রাজা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন ঃ একটি দোতলা বাড়ি, তার চারিদিকে নানা ধরণের ফুলের বাগান, বাড়িতে শুয়ে রয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। তার রূপে চারিদিকে আলোকিত। তার নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে ফুলের মত আগুন বেরোয়, আর প্রশ্বাসের সময় আগুন নিভে যায়। এই স্বপ্নের দেখা পাওয়ার জন্য রাজা ব্যাকুল, কিন্তু কেউ

কোন হৃদিশ দিতে পারছেনা। অবশেষে বড় ছেলে ও ছোট ছেলে আলাদা আলাদাভাবে বেড়িয়ে পড়ল স্বপ্নের দেখা দৃশ্যের সন্ধানে। বহু বাধা বিপত্তি পেরিয়ে শেষ কালে ছোট রাজপুত্রই স্বপ্নের হৃদিশ পেল। স্বপ্নে দেখা সেই মেয়ে হলো স্বর্গের পরি তিলোত্তমা। অবশেষে রাজার সঙ্গে দুয়ো রাণী আর ছোট রাজপুত্রের পুর্নমিলন হল। সুয়োরাণী ও বড় রাজপুত্রকে রাজা তাড়িয়ে দিলেন।

'মনসা মঙ্গল' কাব্যের দেবী মনসাকেও সৎমা চণ্ডীর প্ররোচনায় শিব সিজুয়া পর্বতে পরিত্যাগ করে আসেন। 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের কাহিনির অগ্রগতিতে দেখি যে সেই মনসাই অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে নিজেকে দেব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন এবং শিব চণ্ডী তাকে নিজেদের সন্তান বলে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে লোক সাহিত্যে প্রচলিত abandoned children motif। মঙ্গল কবিরা এই ধারণা লোক সাহিত্য থেকে যে নিয়েছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাছাড়া ইউরোপের chivalry যুগের সাহিত্যে নানান অলৌকিক প্রাসাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "The literature of Chivalry must have been a great stimulus to tales about remarkable castles-castles of gold or silver or even of diomond castles suspended on chains or upheld by giants or built on the sea"[১৫]

প্রাচীন বাংলার বর্হিবাণিজ্যের যুগও chivalry'র যুগের মতই বর্হিমুখী ও কর্মবহুলযুগ ছিল, তাই সেই সময়ে এই দেশের লোকসাহিত্যের মধ্যেও অনুরূপ প্রেরণা কার্যারী থাকাটাই স্বাভাবিক। রেভাঃ লালবিহরী দের 'The folk tales of Bengal' গ্রন্থের 'The Origin of Robies' গল্পে দেখা যায় যে ভাইদের যন্ত্রনায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ছোট রাজপুত্র চুনীর সন্ধানে সমুদ্র তলে যাওয়ার পর সেখানে এক যাদু-প্রাসাদের সন্ধান পেয়েছে। সেখানে সোনার কাঠি - রূপার কাঠি অদল বদল করে সে মৃত রাজ কন্যাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। সুতরাং মনসামঙ্গলকাব্যে সমুদ্র মধ্যস্থিত পুরীর বর্ণনা তাই লোকসাহিত্যেরই প্রেরণাজাত বলে মনে হয়।

চরিত্র চিত্রণে লোক উপাদান

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে অরবিন্দ পোদ্দার এক জায়গায় বলেছেনঃ

> "এখানকার আবহাওয়া ও ভাবাকাশ সম্পূর্ণ মানবিক। কবিগণ তাদের সমকালীন সমাজ জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন, স্থান কালে ধরা সমাজ সম্পর্কের মধ্যে তারা বিচরণ করেছেন, তাই একে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জানার, ব্যক্তিগত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বোঝার অবকাশ তাদের হয়েছিল। আর সমাজকে জানার সঙ্গে সঙ্গে তারা জেনেছিলেন সমাজের অন্তর্গত মানুষকে ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা ও স্বপ্নকে।"[১৬]

যদিও চণ্ডীমঙ্গল সম্পর্কেই তিনি এই উক্তি করেছিলেন, তবুও শুধু চণ্ডীমঙ্গল নয়, বস্তুত সেই সময়ের সকল মঙ্গল কাব্য সম্পর্কেই এই অভিমত প্রযোজ্য। সমালোচক কথিত সমাজ

বলতে মঙ্গল কাব্য রচনার সময়কেই বুঝে নিতে হবে, এবং সেই সমাজের মানুষ নিঃসন্দেহে গ্রামবাংলার লোকায়ত মানুষ তাই তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপই লৌকিক আচার-বিশ্বাস-প্রথা সংস্কারের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চবিত্রগুলি আপাদমস্তক লৌকিক। চাঁদ সদাগর একেবারে বাঙালি ঘরের কর্ত্তা, যে আপন বলিষ্ঠ পৌরুষে উজ্জ্বল, শিব শিথিল গার্হস্থ্য, সনকা ব্যথাতুরা মাতৃমূর্তি আর বেহুলা যেন চিরকালীন বাঙালির পতিব্রতা সতী নারী। চরিত্র গুলোর আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক -

চাঁদ সদাগর ঃ চাঁদ সদাগর শুধু মনসামঙ্গল নয়, মূলত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী পুরুষ চরিত্র। জাতিতে বনিক চাঁদ সদাগরকে এক বলিষ্ঠ পুরুষ হিসেবেই মনসামঙ্গলের কবিবা কাব্যে উপস্থাপিত করেছেন। লক্ষণীয় এই চাঁদ সদাগরের মনোলোক গঠনেও বণিক সম্প্রদাযের সমকালীন বিশ্বাস সংস্কারকে কাজে লাগিযেছেন মঙ্গল কাব্যের কবিরা। চাঁদসদাগর লখীন্দরের বিযে উপলক্ষে যাত্রা কালে দেখতে পান -

"জায সাধু পথ মেলি সুমুখে দেখিল মালি
শ্রীকাল দেখিল বাম পাশে।
দক্ষিণে জায বিষধব দেখিযা কৌতুক বড়
কার্য্য সিদ্ধি দেখি চান্দো হাসে।"[১৭]

এই বর্ণনায সেই সময়ের একটা লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওযা যায় যা চাঁদসদাগরের মনেও বদ্ধমূল। যাত্রাকালে কিছু কিছু দৃশ্য দর্শন শুভের ইঙ্গিত বহন করে এইযে ধারণা তা নিঃসন্দেহে লৌকিক। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'The Folk tales of Bengal' গ্রন্থের 'Adventure of two thieves' গল্পে দেখি যাত্রাকালে মৃতদেহ দেখে ডাকাত বলছে ঃ

"বাঃ আজকের কাজের শুরুতে দেখছি ভারী শুভলক্ষণ।"[১৮]

যাত্রাকালে কোন দৃশ্য দেখা যেমন শুভ তেমনি অশুভ লক্ষণও বিদ্যমান,

শুভক্ষণ হৈল ভাল বিলম্বের নাই কাল
সাজে জল আজ্ঞা পাযা ।
নাসিকা পরশ করি যাত্রা করে অধিকারী
সুবর্ণ ঘট পড়িল টলিযা ।।
চরণে উঝাট লাগে সগুনি আইল আগে
শৃগাল যায় দক্ষিণ ভাগে।
সনা বোলে প্রাণনাথ করু প্রভু যোড়হাত
যাত্রায় অমঙ্গল সব লাগে।"[১৯]

যাত্রকালে এইরূপ অশুভ লক্ষণ থাকলে তা নিরসনের কিছু কিছু বিধান আছে। সেই সংস্কার অনুযায়ীই অশুভ নাশের জন্য যাত্রাকালে ব্রাহ্মণকে দিয়ে মঙ্গলও করিয়েছেন চাঁদ সদাগর।

"সত্তরে জানাইল মোঙ্গা চান্দোর গোচর ।
শুভক্ষণে জাত্রা করিল সদাগর ।

জাত্রা মঙ্গল তবে করয়ে ব্রাহ্মণ।
ধান্য দূর্বা লইয়া মঙ্গল করয়ে নারীগন।।
জাত্রা মঙ্গল সাধু করিলা সকাল।
বামে কাল সর্প দেখে দক্ষিণে শ্রীকাল ।''[২০]

ব্রাহ্মণ ডেকে এই মঙ্গল কাজ করানো লৌকিক আচার হিসাবেই পরিচিত । চাঁদ সদাগর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী । দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে, অথচ সিদ্ধান্তে অটল চাঁদ সদাগর -। কারণ তিনি শঙ্করের প্রসাদ প্রাপ্ত । তাই যে হাত দিয়ে শিবকে পূজা করেন সেই হাত দিয়ে অন্য কারো পূজা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । দুষ্ট 'কাণীকে' তিনি তাই ভর্ৎসনা করে তার পূজা প্রত্যাখান করেন এবং তাকে প্রহার করতে উদ্যত হন । আর ফল স্বরূপ দেবী হয়েও মনসাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র লৌকিক চাঁদের ভয়ে থরথর করে কাঁপতে হয় -

''তর্জ্জে গর্জ্জে চান্দ হেতাল লইয়া লাফে
কলার বাকল হেন পদ্মার প্রাণ কাঁপে ।
দন্তে দন্তে দশন করে কড়মড় ।
প্রাণ লইয়া মনসা উঠিয়া দিল রড়
ত্রাসেযায় পদ্মাবতী আলুথালু চুলি,
পাছে পাছে ধায় চান্দ ধর ধর বলি ।''[২১]

প্রতিশোধ পরায়না মনসা চাঁদ সদাগরের শেষ সম্বল তাঁর সাত রাজার ধন মানিক লখীন্দরকে বিয়ের বাসরে হত্যা করালে পুত্র হারানোর শোকেও চাঁদ সদাগর আদর্শচ্যুত হননি। কাব্যের একেবারে শেষের দিকে বেহুলা যখন দেবসভায় নৃত্য করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করলেন ছয় ভাসুর সহ লখীন্দর ও সপ্তডিঙা মধুকর ফিরিয়ে নিয়ে এসে চাঁদ সদাগরকে মনসার পূজা দিতে অনুরোধ করেছেন, তখন চাঁদ তার অনুরোধ প্রত্যাখান করতে পারেননি, কারণ এই নয় যে, তিনি তাঁর ছয় পুত্র, লখীন্দর ও হারানো সম্পত্তি ফিরে পেয়েছেন, কারণ হলো কন্যাসম পুত্রবধূদের মুখের ম্লানিমা দূর করার জন্যই বেহুলার অনুরোধ প্রত্যাখান করতে পারেন নি চাঁদ সদাগর কাব্যের শুরু থেকেই অর্থাৎ চাঁদ সদাগর বৃত্তান্ত যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকেই আমরা দেখি যে মনসার সঙ্গে লড়াইয়ে তার চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য। মনসাকে পূজা করার মধ্য দিয়ে তা ম্লান হয়ে যায়নি । এই চরিত্রের গভীরে গেলে দেখা যাবে যে চাঁদের এই পরাজয় দেবীর কাছে নয়, এ পরাজয় মানুষের কাছে, স্নেহের কাছে ভালোবাসাব কাছে । আর এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে চাঁদ সদাগর অর্জন করেছে বিজেতার গৌরব ।

বেহুলা ঃ বেহুলা মনসামঙ্গল কাব্যের মুখ্য নারী চরিত্র । চরিত্রটি মূলত সৃষ্টি হয়েছে লৌকিক দেবী মনসার অভীষ্ট সাধনের জন্য । তাই কবিরাও বেহুলা চরিত্রটিকে লৌকিক ভিত্তিভূমির উপরই স্থাপন করেছেন । মনসার উপর বেহুলার অগাধ বিশ্বাস, তাই বিপদেও সে মনসাকে কাছে পেয়েছে সবসময । লোহার কলাইও মনসার কৃপায় রান্না করতে সক্ষম হয়েছে -

"কাঁচা হাঁড়ি কাঁচা সরা আনাইয়া তখন ।
সন্ধ্যা করিয়া পোজে পদ্মার চরণ ।।
আড়াইটা ইক্ষুর পত্রে বাড়াইয়া জ্বাল ।
তবে সে লোহার কলাই লইল উথাল ।
বেউলায়ে রন্ধন করে পাইয়া পদ্মার বর ।
ফুটিয়া হইল কলাই ভাত সমোসর ।।"[২২]

স্বামীর মৃত দেহ নিয়ে ছয় মাস ভেলায় ভাসতে ভাসতে অনেক দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি সহ্য করার মধ্য দিয়ে মৃত স্বামীর পুনর্জীবন লাভের প্রচেষ্টা বেহুলাকে সমকালীন সামাজিক সংস্কারের ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে । সামাজিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিয়ে সে দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথকেই বেছে নিয়েছে । ইচ্ছে করলেই ছয় জায়ের মত সেও শ্বশুর বাড়ীতে থাকতে পারতো, বা নিছনি নগরে নিজের পিতা সায়বেনের বাড়িতে সে মহাসুখেই দিন কাটাতে পারতো, কিন্তু তার মধ্যে সেই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে, "পতিছাড়া বণিতার জীবন বৃথা ।" সেই সামাজিক সংস্কারকে মূল্য দিয়েই সে গাঙুড়ের জলে মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভেসেছে এবং ছয় মাস পরে স্বামী সহ ধনে জনে পরিপূর্ণা হয়ে ফিরে এসেছে। এখানেই তার পরীক্ষার শেষ নয় । তারপরও তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

"প্রথমে পরীক্ষা দিব ঘৃত কাঞ্চন,
আর পরীক্ষা জৌত ঘর করিয়া নির্মাণ ।
আর পরীক্ষা রাম দিলেন সীতারে ।
এই তিন পরীক্ষায় শুদ্ধ হইতে পারে ।"[২৩]

বলা বাহুল্য বেহুলা অষ্টপরীক্ষা দিয়ে সতীত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন । তা ছাড়া মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভেসে যাওয়ার আগে বেহুলা শাশুড়ি সনকাকে বলেছে যে ধান রেখে গেছি, তাতে যদি অঙ্কুর হয় তবে বুঝবে বেহুলা দেবপুরে পৌছে গেছে, সিদ্ধ হরিদ্রায় যদি গেজ মেলে তবে বুঝবে বেহুলা নিজ অভীষ্টসাধনে সফল হয়েছে, ভাজা কলাই যদি পাতা মেলে তবে বুঝবে যে বেহুলা নিজের স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছে । কোন কিছুকে জীবন চিহ্ন হিসেবে দেখার যে ধারণা বেহুলার মনে গ্রথিত তাও লোক সাহিত্য লব্ধ । বলতে গেলে এই সংস্কারগুলো বেহুলার মানসপটকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে । সুতরাং সবশেষে একথা অবশ্যই বলা যায় যে বেহুলা চরিত্রটির মনোলোক নির্মিত হয়েছে লোক উপাদানের সমন্বয়ে।

সনকা ঃ একদিকে স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও অন্যদিকে আরাধ্যা দেবী মনসার প্রতি অবিচল ভক্তি সনকা চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। আরাধ্যা দেবীর সাথে স্বামীর বিরোধের ফলে একে একে ধনজন সবকিছু হারালেও তিনি মনসায় আস্থা হারাননি। মনসা নিষ্ঠুর ভাবে তার ছয় পুত্রকে হত্যা করেছেন, কালিদহে স্বামীর সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়েছেন,

অবশেষে বিয়ের বাসর রাতে বেঁচে থাকা একমাত্র পুত্র লখীন্দরকেও হত্যা করিয়েছেন কিন্তু তবু মনসার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। সনকা মনে প্রাণে একটি কথাই বিশ্বাস করেন যে তাঁর আরাধ্যা দেবী মনসা তাঁর কোন ক্ষতি করবেন না, করতে পারেন না। তাই ছয় পুত্রকে হত্যার পরও সনকা যখন বলেন ঃ

''.......... শুনরে নির্বোধ সদাগর
ফল মুষ্টি কত হয়, দিলে ছয় পুত্র রয়
সানন্দে যাউক পদ্মাঘর।''[২৪]

তখন মনসার প্রতি সনকার যে অগাধ ভক্তি বিশ্বাস তা ই প্রমাণ করে, শুধু তা ই নয়, লখীন্দরের মৃত্যুর পরও সনকার ভক্তি শ্রদ্ধায় কোন ফাটল ধরেনি। তাঁর অকপট স্বীকার উক্তি, ''তোমা পুত্র পাইল কঠোর ব্রত করি''[২৫], থেকে তা বুঝা যায়।

সনকা চরিত্রের মনোভূমিতে রয়েছে চিরাচরিত লৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস। তাই বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে কিছু শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখে চাঁদ সদাগর ও সনকার মধ্যে কথাবার্তায় সনকার সেই মনোভূমিকেই উম্মোচিত করে ঃ

''চলিলেক সদাগর দক্ষিণ সদর
হরসিত করিল গমন।
বামনাকে বহেসর প্রাণ করে ধড়পড়
বামচক্ষু কাম্পীএে ঘন ঘন।।
দুই হস্ত জোড় করি বোলে সোনাএী সুন্দরী
শুন প্রভু নারির বচন।

তারপর,

প্রহিত বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে জায় জেবানরে
জাতি প্রাণ নষ্ট হয় ধন।''[২৬]

তাই আরাধ্যা দেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে সনকা স্বামী চন্দ্রধরকে অনুরোধ করেছেনঃ

''ধনজনে নাই ভাল বাদ করে কতকাল
মনসাতে দেহ ফুল জল ।
আমার বচন ধর তবে যাও দেশান্তর
ধনে মনে হইবে কুশল।।''[২৭]

যাতে নতুন করে অন্য কোন ধরণের বিপদ না হয়। মনসার প্রতি সনকার যে ভক্তি তা অবশ্যই ভয় মিশ্রিত ভক্তি। তা না হলে পুত্র-পুত্রবধূকে বাসর ঘরে পাঠিয়েও সনকা সঙ্কিত। তাই রাত্রি শেষে চাঁদকে বলেছেন ঃ

''কুমঙ্গল দেখি মোর মন নাহি স্থির।''[২৮]

সনকা বাংলার শাশ্বত মায়ের প্রতিভু। তাই তাঁর পুত্র স্নেহও অতুলনীয়। একে একে ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর বহুসাধনায় লব্ধ লখীন্দরকে ক্ষণকাল না দেখলে তাঁর প্রাণ চঞ্চল হয়ে

উঠে, তিনি যেন মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভাব করেন। কাব্যে পাই ঃ

"পুত্র না দেখিযা সনা কান্দিযা বিকল।"[২৯]

সেই পুত্র লখীন্দর মনসার ছলনায যখন সর্প দংশনে মারা যায় তখন সনকার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে। কবি সনকার এরকম অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন -

"পড়িল সাগরে মোর আঁচলের সোনা।
কে দিবে তুলিয়া বন্ধু আছে কুন জনা।।
সনা বলে প্রাণ পুত্র না পাইব আর।
অন্ধকাব দেখি আমি সকল সংসার।"[৩০]

শুধু লখীন্দরের জন্যই নয, স্বামীর মৃতদেহ সঙ্গে নিযে বেহুলা যখন ভেলায ভেসে যাচ্ছিলেন তখনও সনকাব জননী হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিল।

কাব্যে পাই ঃ

"ছযবধূ সহিতে সনা ধবণী লোটায।"[৩১]

তারপর ছযভাসুর সহ লক্ষিন্দরের পুণর্জীবন লাভের পর বেহুলা যখন ডোমনী বেশে বাড়ী ফিরে এল এবং ঝাউযাবতী যখন সনকাকে বেহুলার ডোমনী বেশ ধারণের কথা জানাল তখন সনকার মধ্যে বেদনার ঝংকার আমরা দেখতে পাই। তিনি পুত্রবধূকে সনাক্ত করেছেনঃ

"হা হা পুত্রবধূ বহি অন্যে নাহি মনে।
চিন্তিতে গণিতে অস্থি বিঁধিলেক ঘুণে।"[৩২]

হাড়ে ঘুণ ধরলে যে কষ্ট হয় সনকা যেন সেই রূপ কষ্ট অনুভব করেছেন। তিনি ভেবেছেন বেহুলা হয়ত কোন ডোম পুরুষকে বিয়ে করে জাত খুইয়েছেন। তাই তিনি বেহুলাকে সরাসরি প্রশ্ন করেছেন ঃ

"কোন বাঁকে পুত্র মোর দিলে ভাসাইযা।"[৩৩]

সনকার এই যে বাৎসল্য, সর্বংসহা পতিব্রতার গুণেই তিনি আদর্শ লৌকিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। সমালোচক শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন ঃ

"মনসা মঙ্গলের সনকা শোকাতুরা সবংসহা পতিব্রতা বাঙালী রমনীর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। মধ্যযুগ অনেকদিন চলে গিযেছে, কিন্তু এখানকার বাঙালি সমাজে সনকার মত মাতৃ মূর্তি কিছু দুর্লভ নয়।"[৩৪]

মনসা ঃ 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল মনসা। দেবী হলেও তার চরিত্র লৌকিক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যযুগের সমাজ পরিবেশে পিতৃ -মাতৃ পরিচয়হীন স্বামী পরিত্যক্তা এক নারী যা যা করতে পারে মনসাও তাই করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন চমৎকার (miracel), ভোজ বাজি (magic), হনন প্রক্রিয়া আর মন্ত্র শক্তি (spell) ও প্রয়োগের বিদ্যার (witch craft) মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জীবন দেওয়ার ক্ষমতা প্রদর্শন ও মানুষের অনুরূপ বিদ্যা হরণের সক্ষমতা। শুধু তাই নয়, মানব সমাজে পূজা লাভের জন্য তাকে

মিথ্যাচাব, কপট, মাযা, হিংসা ও ষড়যন্ত্রেবও সাহায্য নিতে হযেছে।

কাব্যেব শুরুতেই দেখি মনসাব মধ্যে বযেছে এক অনন্য শক্তি, লোক সাহিত্যে যাকে বলে magic wisdom। এই শক্তিব সাহায্যে মনসা নিজেব বিষ দৃষ্টি দিযে চণ্ডীকে মেবে আবাব তাকে বাঁচিযে তুলেছেন। দ্বিতীয মন্থনে যে হলাহল নির্গত হযেছিল শিব তা পান কবাব পব মনসা মন্ত্র বলে বাঁচিযে তুলেছেন।

"উত্তবে শিবযে বাখে ত্রিদশেব ঈশ।
তন্ত্রে মন্ত্রে পদ্মাবতী বিনাশিল বিষ।।
ব্রহ্মজ্ঞানে পদ্মা মাবিল হুহুংকাব।
কালকূট গবল হইল ছাবখাব।।
কালকূট গবল হইয়া গেল নাশ।
উঠিযা শংকব দেব চাহে চাবি পাশ।।"[৩৫]

এই মনসাই চাঁদেব মহাজ্ঞান চুবি কবাব জন্য ছলনাব আশ্রয নিযেছিলেন। কাবণ চাঁদেব মহাজ্ঞান চুবি না কবলে চাঁদসদাগবেব সাথে তিনি কিছুতেই পেবে উঠবেন না। তাই 'শালিরূপ' ধাবণ কবে মনসা চাঁদসদাগবেব মহাজ্ঞান চুবি কবেছেন। এই মহাজ্ঞান চুবি কবাব ব্যাপাব লৌকিক উপাদান হিসেবেই পবিচিত।

তাছাড়া মনসা নিজেব রূপ পবিবর্তনেও পাবদর্শী ছিলেন। লোক সাহিত্যে যা transformation motif বলে পবিচিত। মনসামঙ্গল কাব্যেও দেখি যে উদয কাল ধন্বন্তবিকে দংশন কবলে ধনামনা দুই ভাই যখন ধন্বন্তবিকে বাঁচানোব জন্য ওষুধ নিযে আসছিল তখন মনসা নিজেব রূপ পবিবর্তন কবে ব্রাহ্মণ রূপ ধবে তাদেব ছলনা কবেন। মনসা তাদেবকে বলেন যে ধন্বন্তবি মাবা গেছে। মনসাব মুখে মিথ্যে কথা শুনে ধনামনা ওষুধ ফেলে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায, আব মনসা সেই ওষুধ সবিযে ফেলেন ফলত ধন্বন্তবিব মৃত্যু হয।

"পুনবপি মনসা ব্রাহ্মণ রূপ হইযা
ধনামনা আগে বলে মাযায মোহিযা
অত্যন্ত বেথিত হইযা জিজ্ঞাসেন কথা,
এত বাতে দুই ভাই গিযাছিলা কোথা।।
ধনামনা প্রবোধ বলযে হেনকালে।
মনসা বিবাদে সঙ্কে দংশে উদযকালে।।
ঔষধ লইযা যাই তখিব কাবণে।
তবে সেই দ্বিজ বলে মহাবিদ্যমানে।।
কিসেব ঔষধ লইযা যাও তবাতবি।
এখনি মবিল সঙ্ক সেই ধন্বন্তবি।।"[৩৬]

এবকম অনেক লৌকিক উপাদানেব সমন্বযে মনসা চবিত্রটি অত্যন্ত বাস্তবতাব সাহায্যে চিত্রিত হযেছে মনসামঙ্গল কাব্যে।

তাছাড়া নেতা, ধন্বন্তবি, শঙ্কর গারড়ী প্রভৃতি চরিত্রও লৌকিক উপাদানের ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাব্যে নেতার জন্ম বৃত্তান্ত, কাযা পরিবর্তন ও পুনর্জীবন দেওয়ার যে ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয তাও লৌকিক উপাদান হিসেবেই বিশেষ পরিচিত। তাছাড়া কাব্যে ধন্বন্তরিকে দেখি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে। মনসার সঙ্গে চাঁদের বিরোধ বাঁধলে মনসার কূপে বিনষ্ট হযে যাওযা চাঁদের সমস্ত সম্পত্তি যে ফিরিযে দিয়েছে মন্ত্র বলে। মন্ত্র শক্তি ও এর মাধ্যমে সর্পদংশনের চিকিৎসা তার জীবন কেন্দ্রে স্থাপিত। আর তাঁব মৃত্যু কৌশল ও বর্ণিত হযেছে লোককথায রাক্ষস নিধনের জন্য ভ্রমর ভ্রমরীকে মাটিতে না ফেলে হাতে পিষে মারার মতই।

শঙ্কর গারড়ীও অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। চাঁদ সদাগরের সাথে লড়াই করে জয পেতে হলে তাঁর পার্শ্বচর বন্ধুদের সরাতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা প্রায অসম্ভব। তাই মনসা কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ছলনা করে শঙ্কর গারড়ীর স্ত্রীর নিকট থেকে শঙ্কর গারড়ীর মৃত্যু রহস্য জেনে নেন। তক্ষক সাপ যদি তাঁর ব্রহ্মতালুতে দংশন করে তবেই তিনি মরবেন, এই মৃত্যু রহস্য জেনে মনসা ছলনা করে শঙ্কর গারড়ীকে প্রাণে মেরে ফেলেন।

এইভাবে মনসা মঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের মনোলোক কবিরা নির্মাণ করেছেন লোক উপাদানের সমন্বযে।

চতুর্থ অধ্যায়
চণ্ডী মঙ্গলকাব্য

চণ্ডী মঙ্গল কাব্য ও লোককথা

চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের কাহিনি দুইটি সমান্তরাল কাহিনির দ্বারা সম্পৃক্ত, প্রথমত 'আখেটিকখণ্ড' ও দ্বিতীযত 'বণিকখণ্ড'। 'আখেটিকখণ্ডে' কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে ও বণিক খণ্ডে ধনপতি-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্তদের কাহিনি বর্ণনা করা হযেছে। দুটি কাহিনিই লোককথা নির্ভর।

'আখৌটিক খণ্ডে' অর্থাৎ কালকেতুর উপাখ্যানে যে কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো চণ্ডী মর্ত্তলোকে নিজের পূজা প্রচারে ইচ্ছা প্রকাশ করলে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিযে মর্তে পাঠানোর কথা শিবকে বললেন। শিব বিনা অপরাধে নীলাম্বরকে শাপ দিতে অসম্মত হলে চণ্ডী ছলনার আশ্রয় নেন। তিনি কীট হযে শিবপূজার ফুলের মধ্যে লুকিযে থাকেন। পরে ইন্দ্র সেই ফুল দিযে শিব পূজা করলে কীটরূপী দেবীচণ্ডী শিবকে দংশন করেন। এতে ব্যথা পেযে শিব নীলাম্বরকে অভিশাপ দেন। কারণ শিব পূজার জন্য চয়ন করে নিয়ে এসেছিলেন নীলাম্বর। শিবের অভিশাপে নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধের ছেলে হিসেবে জন্ম গ্রহণ কবেন। নাম রাখা হয কালকেতু। আর তার পত্নী ছাযাও অন্য এক ব্যাধের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয ফুল্লরা। কালকেতু ছোটবেলা থেকে অসীম সাহসের অধিকারী ছিল। এগারো বৎসর বয়সের সময় ফুল্লরার সাথে তার বিযে হয়। কালকেতু শিকারে খুব পটু ছিল। প্রতিদিন সে প্রচুর পশুপাখী শিকার করত, এবং পরে তা নগরে বিক্রি করে দিযে জীবিকা নির্বাহ করত। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সকল পশু মিলে চণ্ডীর কাছে গেল। চণ্ডী হলেন পশুর দেবতা। তাই পশুদের দুর্দশার কথা শুনে চণ্ডী তাদের অভয় দিলেন। পরদিন হাতে তীর ধনু নিয়ে শিকারে বেরোলে চণ্ডী ছলনা করে সকল পশু পাখীকে লুকিয়ে রেখে নিজে গোধিকা হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকেন। যাত্রা পথে স্বর্ণ গোধিকা দেখে কালকেতুর মন খারাপ হয়ে গেল। কেননা গোধিকা যাত্রার পক্ষে অশুভ। দেবীচণ্ডীর ছলনায় পূর্বের দিনও কালকেতু কোন শিকার পায়নি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কালকেতুর রাগ হলো, ক্রুদ্ধ কালকেতু তাই গোধিকাটিকে ধনুর্গুনে বেঁধে রাখল, আর মনে মনে ভাবল, আজ যদি অন্য শিকার না পায় তবে এই গোধিকাটিকেই পুড়িয়ে খাবে। দেবীর ছলনায় সমস্ত বনঘুরে সেদিনও সে কোন শিকার পেলনা। অবশেষে সেই গোধিকাকে নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরেই ফুল্লরাকে বলল যে গোধিকাটির ছাল ছাড়িয়ে রাঁধতে। আর প্রতিবেশী বিমলার কাছ থেকে কিছু ক্ষুদ ধার করে আনতে, বলেই বাসি মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে চলে গেল। কালকেতু বাজারে চলে যাবার পর ফুল্লরাও বিমলার ঘরে চলে গেল। ঠিক এই সময়ের

মধ্যে গোধিকা রূপিনী চণ্ডী সুন্দর যুবতীর রূপ ধারণ করলেন। এদিকে বিমলার ঘর থেকে ফিরে এসে ফুল্লরা তাদের গৃহাঙিনায় সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার আগমনের হেতু জানতে চাইল। উত্তরে সেই সুন্দরী যুবতী জানান যে কালকেতুই তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে। এখন থেকে তার কুটিরেই তিনি থাকবেন। নিত্য দুঃখের সংসারে ফুল্লরার একমাত্র ভরসা স্বামী কালকেতু, তাই অপরূপা সুন্দরী যুবতী দেখে সে সত্যি সত্যিই এবার চিন্তায় পড়ে গেল। কত ভাবে সে সুন্দরীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে পরগৃহে থাকাটা অনুচিত। নিজের বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য সীতা-সাবিত্রীর উদাহরণ দেখিয়ে অনেক নৈতিকতার কথাও শুনিয়েছে। অবশেষে সবকিছুতে ব্যর্থ হয়ে সে ছুটে চলল স্বামীর কাছে। কালকেতু এসেও সুন্দরী নারী রূপিনী চণ্ডীকে পরগৃহে বাস থেকে নিবৃত্ত করতে চাইল। কিন্তু সেও ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে ক্রোধে ধনুকে শর চড়াল। এবার তাড়াতাড়ি দেবী স্বরূপে আর্বিভূতা হলেন। তার সেই অপূর্ব মূর্ত্তি দেখে অবিভূত হয়ে গেল কালকেতু-ফুল্লরা। দেবী তখন কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও একটি অঙ্গুরী দিয়ে নগর পত্তনের পরমার্শ দিলেন।

কালকেতুও গুজরাটে বন কাটিয়ে নগর পত্তন করল। কিন্তু ধূর্ত ভাড়ুদত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গাধিপতি গুজরাট নগর আক্রমণ করলে যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হল। কারাগারে বসে দেবীচণ্ডীর স্তব করায় দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে আদেশ দেন কালকেতুকে মুক্ত করে দিতে। অবশেষে কলিঙ্গরাজের সহায়তায় আরো সুদৃঢ় ভাবে রাজ্য স্থাপন করে ফুল্লরাকে নিয়ে সুখে দিন যাপন করতে লাগল। অবশেষে একদিন শুভক্ষণ দেখে নীলাম্বর ও ছায়ারূপে তারা স্বর্গে ফিরে গেল। এই কাহিনী প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ঃ

> "আখোটিক খণ্ডের কাহিনী মুকুন্দ লৌকিক গল্পের মধ্যে পাইয়া থাকিবেন, ২৯ সংখ্যক পদের ভনিতায় 'শ্রী কবিকঙ্কন গান গীত ভৃগুবংশ', অনুধাবনীয়, ... ফুল্লরা নামটিও সাক্ষাত লৌকিক (অবইত) হইতে নেওয়া বলিয়া বোধ করি।"[১]

বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে রচিত প্রসিদ্ধ অবধান গ্রন্থ-মহাবস্তুতে যে 'গোধা জাতক' কাহিনি আছে ডঃ সেন তার সঙ্গে খুব নিকট সাদৃশ্য দেখেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তী বর্ণিত গোধা বৃত্তান্তের। বৌদ্ধ কাহিনিটি এরকম ঃ

কোন এক সময় বারাণসীতে এক রাজা ছিল। নাম তার সুপ্রভ। তাঁর একমাত্র পুত্র সুতেজ। রাজ্যের পাত্র মিত্র সকলের কাছে সুতেজ খুব প্রিয় পাত্র ছিল, তার এই জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে রাজা সুতেজকে হিমালয়ের পাদদেশে বনবাসে পাঠিয়ে দেন। কারণ রাজার মনে ভয় ছিল যে প্রজারা তাকে সরিয়ে অবশেষে সুতেজ কে যদি সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। সুতেজ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে তৃণ কুটির নির্মাণ করে ফলমূল ও শিকার করা মাংস খেয়ে দিনযাপন করতে থাকে। সুতেজ আশ্রমের বাইরে থাকা অবস্থায় একদিন এক বিড়াল একটি গোধিকা মেরে ফেলে গেল তার স্ত্রীর কাছে। পরে ফলমূল পাতা আহরণ করে সে কুটিরে ফিরে এসে মৃত গোধিকাকে দেখতে পেয়ে তাঁর ছাল ছাড়িয়ে সিদ্ধ করে উঠানের গাছে ঝুলিয়ে রাখল। গোধিকাটি সিদ্ধ করা হয়ে গেলে সুতেজ পত্নী এটি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে জল আনতে চলে গল। সুতেজ ভাবল যতক্ষণ সিদ্ধ করা হয়নি ততক্ষণ তার পত্নী

সেটা ছুঁয়েও দেখেনি। তার পত্নী যদি সত্যিই তাকে ভালোবেসে থাকে তাহলে শিকার থেকে আসার আগেই সে তা রান্না করে রাখতে পারতো। তাই সে একাই গোধিকাটিকে খেয়ে নেয়, পরে স্ত্রী এসে জিজ্ঞাসা করলে বলে গোধিকাটি পালিয়ে গেছে। তখন তাঁর স্ত্রী বুঝতে পারলো যে স্বামী তাকে ভালোবাসে না, কারণ সে এতটুকু নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারে যে সিদ্ধ গোধিকা কোন ভাবেই যেতে পারেনা।

পরবর্তি সময়ে রাজা সুপ্রভ দেহত্যাগ করলে পাত্রমিত্র সবাই মিলে সুতেজকে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসাল। স্বভাবতই সুতেজ পত্নী রাজ রাণী হলেন, কিন্তু তবু পূর্বের কথা তিনি কিছুতেই ভূলতে পারলেন না। তাই স্বামীর প্রতি তার বিদ্বেষ ভাবও জেগে রইল। সুকুমার সেন চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের কালকেতু কাহিনির সাথে এই জাতকের গল্পের অন্তরঙ্গ মিলের কথা বলেছেন। সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে আমরাও দেখবো যে কিছুকিছু বিষয়ে দুটো কাহিনির মধ্যে অবশ্যই মিল রয়েছে। যেমন ঃ

(১) কালকেতু ও ফুল্লরার মতো সুতেজ ও তার স্ত্রীও তৃণকুটিরে বসবাস করে । দুটো পরিবারই মূলত শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে।

(২) কালকেতু উপাখ্যনের মতো জাতকের গল্পেও দেখাযায় গোধিকা প্রাপ্তির পর কালকেতু ও সুতেজ দুজনেই রাজ্য লাভ করেছে।

জাতকের গল্প ছাড়া উড়িষ্যায় প্রচলিত ''খুদু-রুকুনী ওষা'' নামক ব্রতকথার সাথে কালকেতু কাহিনির সাদৃশ্যও লক্ষ্য করেছেন সমালোচক -

> ''মনে হয ব্রতকথার আকারে কাহিনীটি বাংলা এবং উড়িষ্যা উভয় প্রদেশেই প্রচলিত ছিল। ..... বাংলাদেশে এই কাহিনীটি একটি বিশেষ আঞ্চলিক রূপ লাভ করিয়া মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে।''[২]

শুধু কালকেতুর কাহিনি নয় বণিক খণ্ডের 'ধনপতি উপাখ্যান'ও এমনিভাবে বিভিন্ন লোক কথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বণিক খণ্ডের কাহিনি অনেকটা এরকম, উজানি নগরের ধনী বিলাসী যুবক ধনপতি একদিন জনার্দন ওঝার সাথে পায়রা ওড়াচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ শকুনের তাড়া খেয়ে পায়রাটি খুল্লনা নামে এক সুন্দরীর আঁচলে আশ্রয় গ্রহণ করল। ধনপতি খুল্লনার কাছে পায়রাটি ফেরৎ চাইল। খুল্লনা তাতে সম্মত না হয়ে পায়রাটি নিয়ে চলে গেল । রূপসী খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে ধনপতি তাৎক্ষণিক ভাবে কিছু বলল না। কিন্তু পরে জনার্দন ওঝাকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে, ধনে বংশে কৌলিন্যে শ্রেষ্ঠ ধনপতি খুল্লনার পরিবার থেকে অতি সহজে সম্মতি আদায় করে নিল। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর আপত্তিও তাদের বিয়েতে কোন বাঁধা সৃষ্টি করতে পারেনি। যাই হোক দুই সতীন মিলে তাদের সংসার বেশ ভালই চলছিল, অবশেষে দুর্বলা দাসীর প্ররোচনায় লহনা খুল্লনার প্রতি অত্যাচার শুরু করে। কারণ স্বামী ধনপতি ইতিমধ্যে গৌড়ে চলে গেছে রাজ আজ্ঞায় সোনার খাঁচা আনার জন্যে। ফলত খুল্লনার প্রতি লহনার অত্যাচার এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তাকে ঢেঁকিশালে শুতে দেওয়া হয়। একবেলা আধপেটা খাওয়ার দেওয়া হয় ও জঙ্গলে ছাগল চরাতে যেতে বাধ্য করা হয়। ছাগল চরানোর সময় একদিন সে ঘুমিয়ে পড়লে চণ্ডী তাকে স্বপ্নে দেখান যে তার

সর্বশী ছাগল শিয়ালে খেয়ে নিয়েছে। স্বপ্ন দেখে খুল্লনার ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখে সত্যিই সর্বশী ছাগল নেই। লহনার অত্যাচারের ভয়ে বনের মধ্যে ছাগল খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পঞ্চদেব কন্যার দেখা পেল। তাদের কাছ থেকে চণ্ডীপূজা শিখে নিয়ে খুল্লনা দেবী চণ্ডীর পূজো করলে তিনি তাকে দেখা দিলেন। মাচণ্ডী লহনাকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে খুল্লনার প্রতি ভাল ব্যবহার করতে আদেশ দিলেন। লহনা এতে অনুতপ্ত হল ও তারপর থেকে খুল্লনাকে ঠিক নিজের বোনের মত দেখতে লাগল। দেবী চণ্ডী ধনপতিকেও স্বপ্নে লহনার অত্যাচারের কথা বললে সে সত্বর বাড়িতে চলে এলো। ধনপতি বাড়ীতে ফিরে এলে অনেক লোক তাঁর বাড়িতে এলেন। চণ্ডীর বরপুষ্ট খুল্লনার রান্না করা খাদ্য সামগ্রী খেয়ে সকলেই ধন্য ধন্য করতে লাগল। কিছুদিন পর ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে আবার স্বজাতিবর্গ এলেন আমন্ত্রিত হয়ে। মালা ও চন্দন দেয়া নিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ধনপতি ও স্বজাতি বর্গের মধ্যে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। স্বজাতিবর্গের বক্তব্য হলো খুল্লনা অনেকদিন একা একা বনে ছাগল চরিয়েছে সুতরাং তার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ দেখ দেয়। তাই ধনপতিকে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে তাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য অন্যথায় খুল্লনাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। ধনপতি এক লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলেও খুল্লনা তাতে রাজি হলনা। অবশেষে তাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হল। জলে ডুবিয়ে, সর্পদংশনে, জ্বলন্ত লৌহ দণ্ড বিদ্ধ করে এমনকি জতু গৃহে বন্দী অবস্থায় অগ্নি সংযোগ করেও তার কোন ক্ষতি করতে পারলো না। সে সসম্মানে সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো।

কিছুদিন পর খুল্লনা গর্ভবতী হলো, কিন্তু তাকে এই অবস্থায় রেখেই ধনপতি সদাগরকে সিংহল যেতে হলো। কারণ রাজভাণ্ডারে চন্দনাদি দ্রব্যের অভাব দেখাদিয়াছে। অশুভ সময়ে ধনপতি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে তাই তার মঙ্গলের জন্য খুল্লনা দেবী চণ্ডীর আরাধনা করেছে। পরম শৈব ধনপতি তা সহ্য করতে পারল না, তাই যাবার আগে পাদিয়ে চণ্ডীর ঘট ফেলে দিয়ে যাত্রা করল। চণ্ডী এতে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন এবং বদলা নেওয়ার জন্য অকুল সমুদ্রে ধনপতির ছয় ডিঙা ডুবিয়ে দিলেন। শুধু মধুকর ডিঙা নিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ধনপতি সিংহল পৌছলেন। যাওয়ার সময় রাস্তায় দেবীচণ্ডী ধনপতিকে ছলনা করে 'কমলে কামিনী'র দৃশ্য দেখালেন। ধনপতি সিংহল রাজের কাছে 'কমলে কামিনী'র দৃশ্যের কথা বললে সিংহল রাজ তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে তাকে সত্যি যদি ধনপতি সওদাগর সে দৃশ্য দেখাতে পারেন তা হলে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দিবেন। কিন্তু চণ্ডীর ছলনায় ধনপতি তা দেখাতে ব্যর্থ হলে রাজা তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

এদিকে যথাসময়ে খুল্লনার একটি পুত্র সন্তান হলো। মালাধর গন্ধর্ব শিবের অভিশাপে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত রূপে জন্ম গ্রহণ করল,ধীরে ধীরে শ্রীমন্ত বড় হয়ে উঠতে লাগলো। পাঠশালায় পড়ার সময় একদিন গুরু মশাই তার জন্ম সম্বন্ধে কটাক্ষ করলে বাড়িতে এসে তাই সে মায়ের কাছে তার বাবার সমস্ত বিবরণ জানতে চাইল। মায়ের কাছ থেকে সব শুনে সে সিংহল যাত্রা করল, যাত্রাপথে সেও রাস্তায় 'কমলে কামিনী'র দৃশ্য দেখল এবং তার বাবার মতই একইভাবে সিংহল রাজকে 'কমলে কামিনী' দৃশ্যের কথা বলল। রাজা

তাকেও বললেন সত্যি যদি সে তা দেখাতে পারে তাহলে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজ কন্যা তাকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু সেও তা দেখাতে ব্যর্থ হলো, ফলে তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওযা হলো প্রাণদণ্ড দেওযার জন্য। শ্রীমন্ত তখন চণ্ডীর স্তব করলে দেবী ভূত-প্রেত নিযে স্বযং সেখানে উপস্থিত হযে রাজার সৈন্যদেব হারিযে দেন। অবশেষে দেবী চণ্ডীর কৃপায় সিংহল রাজও কমলে কামীনির দৃশ্য দেখেন। তাই শর্ত মতে রাজকন্যা সুশীলার সাথে শ্রীমন্তের বিযে হয। পিতা পুত্রের মিলনও হয। বাড়ি ফিরার পথে রাস্তায ধনপতির ডুবে যাওযা ডিঙি গুলোও ফিবে পেলো দেবীব কৃপায এবং উজানি নগরের রাজাকে কমলে কামিনীর দৃশ্য দেখিযে মুগ্ধ কবে তাব মেযে জযাবতীকেও বিযে করল শ্রীমন্ত। এরপর স্বর্গ ভ্রষ্ঠ ব্যক্তিরা যথাসমযে ফিরে গেলেন স্বর্গে।

'চণ্ডী মঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত দুটি কাহিনিই লোককথার ভিত্তি ভূমিব উপর প্রতিষ্ঠিত। কাব্যটিব কিছু কিছু ঘটনা নিযে যদি বিস্তৃত আলোচনা করা যায তাহলেই স্পষ্ট হযে যায চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা লোককথার ব্যবহারে যথেষ্ট কুশলী। প্রথমত চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্ব আমাদেরকে মনে করিযে দেয পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে থাকা লোক অভিপ্রাযের কথা । চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্বটি এরকম ঃ

''না আছিল ববী শশী সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি
না আছিল এ মেক মন্দাব।
না আছিল সুবাসুব বাক্ষস কিন্নব নব
সকলি আছিল শূণ্য কার ।।
অক্ষয অব্যয সেই মহাশয
নিবঞ্জন পুরুষ প্রধান।
আপনি সদয হইযা বেড়াযে জলে ভাসিযা
সৃষ্টি সৃজিতে দিলা মন।।
(প্রভু) সৃষ্টি সৃজিতে চাহে গাযেব মৈল ফেলাযে
তথি করিলা পদভর।''[৩]

এই জাতীয সৃষ্টিতত্ত্ব রাঢ় বাংলার সীমান্তবর্তী বহু অঞ্চলের আদিম সংস্কার লালনকারী লোক সমাজের মধ্যে যে প্রচলিত তা কোন কোন সমালোচক লক্ষ করেছেন -

''সম্ভবত রাঢ় বঙ্গের লোকায়ত সমাজ, আদিম কাল থেকে যে পূরাকানিহীর ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে এবং যেসব ধারনার ঐতিহ্য আজও সীমান্ত বাংলা ও তার প্রতিবেশী রাজ্যের লোকসমাজে প্রচলিত আছে, মঙ্গল কাব্যের লিখিত রূপের মধ্যে দেখতে পাই সেই লোকায়ত ধারা তথা অভিপ্রায়কেই।''[৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর জন্মবৃত্তান্তটি নিম্নরূপ ঃ

''মক্ষিকা রূপ ধরি প্রবেশে নীলাম্বর
ঔষধি দিল দেবী নাকে।।
নিদয়া পায়ে পড়ি দিলেক চালুবড়ী
নগদ কড়ি চারিপন ।''[৫]

এই যে জন্ম বৃত্তান্ত তা লোককথায় super natural birth motif নামে অভিহিত। মঙ্গল কবিরা এই ধারণা লোককথা থেকেই নিয়ে থাকবেন । তাছাড়া খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত রূপে মালাধর গন্ধর্বের জন্মও লোকসাহিত্যে super natural birth motif নামে অভিহিত। 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের বেহুলার মতো চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের খুল্লনাকেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

> ''পরীক্ষা দেখাব আমি নাহি কোন দায়।
> প্রণতি করিয়া নাথ বলিহে তোমায়।।
> ধন দিয়া পরীক্ষা করিবা নিবারণ।
> উজানী জুড়িয়া মোর রহিবে গঞ্জন।।
> পরীক্ষা লইতে নাথ যদি কর আন।
> গরল ভক্ষিয়া আমি ত্যজিব পরাণ।।''[৬]

তাকে জলে ডুবিয়ে, সর্পদংশনে, জ্বলন্ত লৌহদণ্ড বিদ্ধ-করে এমনকি জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে তার সতীত্বের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য লোক সাহিত্য বিদগন এ বিষয় টিকে chastity test motif বলে উল্লেখ করেছেন। মঙ্গল কবিরা এই ধারণা লোককথা থেকেই যে নিয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। লোককথায় একটি বিষয় আছে যে, পরিবারের ছোটরা অসাধ্য সাধন করে যাকে successful youngest son (Daughter or Daughter in law) মোটিফ বলে। ''দ্য বয় হুম মেড্ন মাদারস্ সাকলড্' গল্পে দেখি যে এক রাজার সাতরাণী, কিন্তু তবু তাদের সুখ নেই, কারণ রাজার কোন ছেলে মেয়ে নেই। কোন একদিন এক সাধু বাড়ীতে এসে বলল বাগানে একটা বড় আম গাছে সাতটা আম আছে। রাজা যদি নিজে আমগুলো পেড়ে সাত রাণীকে খেতে দেন তাহলে রাণীদের ছেলে হবে। এ দিকে শিকারে গিয়ে রাজা আরো এক সুন্দরী মেয়েকে প্রাসাদে এনে বিয়ে করলেন। সাত রাণীই তখন সন্তান সম্ভবা। নতুন রাণী রাজাকে বলল সাতরাণীকে অন্ধকরে মেরে ফেলতে হবে। রাজা মন্ত্রীর উপর সেই দায়িত্ব দিলেন । মন্ত্রী তাদের না মেরে গুহায় লুকিয়ে রেখে নিজেও নিরুদ্দেশ হলেন। রাণীদের যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে কোন খাবার ছিল না। কিছুদিন পর বড় রাণীর ছেলে হল। তখন সেই ছেলেকে মেরে সবাই ভাগ করে নিল, বড় ছয় রাণী তাদের ভাগ খেয়ে নিল, কিন্তু ছোট রাণী তার ভাগ তুলে রাখল। বড় ছয় রাণীর বেলায় একই হল । ছোট রাণীর ছেলে হলে সবাই যখন তাকে মেরে নিজেদের অংশ নিতে চাইল তখন ছোট রাণী তুলে রাখা ছয় অংশ তাদেরকে দিয়ে দিল। শুকনো মাংসের টুকরো দেখে সবাই প্রশ্ন করলে ছোট রাণী বলল সবাই মিলে এটিকে বাঁচিয়ে রাখি। বড়রা রাজী হল। তখন সাত রাণীর বুকের দুধ খেয়ে ছেলে বড় হতে লাগল।

এদিকে রাজা শিকারে গিয়ে যে সুন্দরী বউ এনেছিলেন সে আসলে মানুষ নয়, রাক্ষসী। রাজ্যের সমস্ত মানুষ, পশু-পাখিকে এক এক করে খেতে লাগল । ইতিমধ্যে অনেক সময় পেরিয়ে গেল ছোট রাণীর ছেলে বড় হল। বড় হয়ে সে রাজবাড়িতে প্রথমে চাকরের ছদ্মবেশে এলো, এসেই সে সব বুঝতে পারলো যে তার সতমা রাক্ষসী। রাক্ষসীও তাকে ভাল করে দেখে নিল, কিন্তু রাত ছাড়া তাকে তো খাওয়া যাবে না। রাজপুত্রও ভীষণ চতুর

সে রাত হবার আগেই দূরে বাড়িতে চলে যায়। এমনি করে আসা যাওয়া করতে করতে একদিন সে জানতে পারলো পাখির বুকে তার রাক্ষসী মায়ের প্রাণ। একদিন সে পাখিটিকে মেরে ফেলল, সাথে সাথে রাক্ষসীও মারা পড়ল । সবার সঙ্গে আবার তাদের মিলন হল।

গল্পটিতে দেখি যে ছোট রাণীর গর্ভে জন্ম নেওয়া ছেলে সন্তান অসাধ্য সাধন করেছে। যে নাকি ভাইদের মধ্যেও সবচেয়ে ছোট এই যে পরিবারের ছোট দ্বারা অসাধ্য সাধন করা লোককথায় এটি একটি অভিপ্রায়, যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। চণ্ডী মঙ্গল কাব্যেও দেখি কাহিনির সূচনা এবং গতি সঞ্চারিত হয়েছে খুল্লনাকে কেন্দ্র করে। ধনপতি সদাগরের বংশ রক্ষার কাজটিও সম্পাদিত হয়েছে খুল্লনার মাতৃত্ব লাভের মধ্য দিয়েই। আর এই সন্তানই পরবর্ত্তি সময়ে সিংহল রাজের কারাগারে বন্দী থাকা পিতা ধনপতিকে উদ্ধার করেছে অসাধ্য সাধনের মধ্য দিয়ে, সুতরাং একথা স্পষ্ট যে মঙ্গল কবিরা লোককথা থেকেই এই ধারণাটি গ্রহণ করেছেন।

Magic Power ও লোককথার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রায়। রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে'র 'The Falk tales of Bengal' গ্রন্থের 'The Story of Rakshasas' গল্পে এক রাক্ষসী ছিল। সেই রাক্ষসী যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে নৌকায় চড়ে তিন বার আঙুল মটকে মন্ত্র উচ্চারণ করেছে ঃ

"হিজল কাঠের নাওগো আমার
মন-পবনের দাঁড়
যেথায় কেশবতী সিনান করে
চল সেই ঘাটের পার।"[৭]

বলতে না বলতেই জলের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত নৌকা ছুটে চলল। কত নগর, গ্রাম, জনপদ পার হয়ে অবশেষে একঘাটে এসে নিজেই নৌকা ভিড়ল। দাসীরূপী রাক্ষসী বুঝল এই ঘাটেই কেশবতী সিনান করে। যাদুশক্তির বলেই যে তা সম্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই

'চণ্ডী মঙ্গল' কাব্যেও দেখি যে খুল্লনার মা রম্ভাবতী ধনপতিকে যাদুর সাহায্যে বশ করতে চেয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল -

"খুল্লনার হবে সাধু
নাক বিন্ধা পশু"[৮]।

তেমনি আবার ধনপতিকে নিজের বশে রাখার জন্য লীলাবতীর কাছ থেকে বশীকরণ করবার সমস্ত ঐন্দ্রজালিক প্রথাকে মেনে নিয়েছে লহনা। মঙ্গল কাব্যে যাদু শক্তির এই প্রয়োগ লোককথারই প্রেরণাজাত বলে মনে হয় ।

দেবদেবীর পশু শরীর গ্রহণ বা মানবীরূপ গ্রহণ লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রায়। লোকসাহিত্যে তাকে Transformation motif বলে। 'আখেটিক খণ্ডে' 'পশুদের গোহার' অংশে দেখা যায়, কালকেতুর অত্যাচারে বন্য পশুরা বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে চণ্ডীর

শরনাপন্ন হয়েছে। পশুদের প্রবোধ দিয়ে দেবী চণ্ডী গোধিকা রূপ ধারণ করেছেন কালকেতুকে ছলনা করার উদ্দেশ্যে। কাব্যে পাই ঃ

"পশুগনে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা
ততক্ষণে সুবর্ণ গোধিকা রূপ হইলা।।"[৯]

এছাড়াও দেবীর মৃগ রূপ ধারণের কথাও পাওয়া যায় চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে । যেমন ঃ

"সব শোক দুঃখ খণ্ডি বনে দেখা দিলা চণ্ডী
মায়া মৃগী রূপে ততক্ষণ।।"[১০]

এছাড়াও দেবীর জড়তী বা বৃদ্ধার রূপ ধারণের বর্ণনাও কাব্যে পাওয়া যায়। দেবদেবীর এই রূপবদলের ধারণা মঙ্গল কবিরা লোককথা থেকেই যে নিয়েছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা।

ধনপতি উপাখ্যানে 'বাক্‌পটু' শুক শারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। লোক সাহিত্যে তাকে বলে Talking bird motif । লালবিহারী দের 'The Falk tales of Bengal' গ্রন্থের 'দ্য স্টোরি অব হীরামন' গল্পে দেখি যে এক ব্যাধের ফাঁদে পড়ল এক হীরামন পাখি, কথা বলা পাখি। ব্যাধ রাজার কাছে পাখিটিকে বিক্রি করতে গেলে পাখিটি তার দাম বলল দশ হাজার টাকা, রাজা পাখি কিনলেন। রাজার ছয় রাণী। রাজা পাখিকে ভালোবাসতেন বলে রাণীদের খুব হিংসে। রাণীরা তাকে মারতে গেলে সে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের এক সুন্দরীর প্রশংসা করে উড়ে পালিয়ে গেল। রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এলে পাখী আবার এলো। তারপর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজা ও হীরামন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পৌছলেন এবং হীরামনের সাহায্যে সেই দেশের সুন্দরীকে বিয়ে করে নিজে দেশে ফিরে এলেন।

চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে কথা বলা শুকশারীর উপস্থিতি লোককথারই প্রেরণা জাত বলে মনে হয়। যার উদ্ভব লোক বিশ্বাস থেকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক সাহিত্যে আরণ্যক জীবদের পরিচয় প্রসঙ্গে পশু সম্মেলনের বর্ণনা আাছে। বাংলাদেশেও সুপ্রাচীন কাল থেকে এ ধরণের গল্প প্রচলিত। চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের প্রথম ভাগেই পশু সম্মেলনের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে এই ধারণা লোক কথাথেকেই আহরিত ।

Chivalry যুগে লোকজীবনে প্রচলিত ছিল নানা অলৌকিক আখ্যান। চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত কমলে কামিনীর বর্ণনা সেইরূপ ঐশ্বর্যমণ্ডিত কল্পনারই পরিচয়।

চরিত্র চিত্রণে লৌকিক উপাদান ঃ

কালকেতু ঃ কালকেতু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মুখ্য চরিত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই চরিত্রটির মনোলোক গঠিত হয়েছে আদিম সহজ সরল কৌম সমাজজীবী মানুষের গুণাবলীর সমন্বয়ে। তার দেহাবয়বের বর্ণনাদিতে গিয়ে কবি বলেছেন ঃ

"নাখ মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেন নিরমান
দুই বাহু লোহার সাবল

শীলরূপ গুণবাড়া বাড়ে যেন হাতি কড়া
জিনিশ্যাম চামর কুণ্ডল।
বিচিত্র কপাল তটি গলাএ জালের কাঠি
করে জুত লোহার শিকলি
উব শোভে বাঘ নখে অঙ্গেরাখা ধূলি মাখে
তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলি।''[১১]

এই যে শারীরিক গঠন বর্ণনা তা অবশ্যই একজন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের। শুধু তাই নয় তার মানসলোক গঠনেও সমকালীন সমাজ প্রসূত লোকায়ত-বিশ্বাস-সংস্কার এর ভূমিকাও যথেষ্ট।

''গণ্ডিশর লইয়া বীর চলিল কানন ।।
ভবনে দেখএ কেতু অতি শুভক্ষণ।
দধি লইয়া গোযালিনী ডাকে ঘনঘন।।
বামেতে দেখএ শিবা চাহে মহাবলে।
দেখএ খঞ্জনযুগ খেলে শতদলে।।
কেতু বোলে দেখি আজি অতিশুভ চিন।
পাইমু অসংখ্য পশু পশিলে কানন।।''[১২]

কিন্তু তার পরই যখন বামেতে গোধিকা দেখলো তখন মনে মনে দুঃখিত হলো কালকেতু। কবির বর্ণনায় পাই ঃ

''দেখিল রুচির তনু রূপে যিনি হেম ভানু
সুবর্ণ গোধিকা বাম ভাগে।
সুবর্ণ গোধিকা দেখি চিতে বীর হইলা দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশন
দেখিল মঙ্গল জত সকাল হইল হত
বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বন।''[১৩]

তারপরই বলেছে,

''বীরে বোলে গোধিকার তরে
পন্থ ছাড়ি যাহ অভ্যন্তরে।''[১৪]

কেন অভ্যন্তরে যাওয়ার প্রশ্ন আসছে, কারণ তার মনের মধ্যে এ ধারণা গেঁথে রয়েছে যে গোধিকা অশুভ যাত্রার প্রতীক । তাই কালকেতু মনে মনে বিরক্ত হয়ে বনে প্রবেশ করেছে। বনে প্রবেশ করে কালকেতু সেদিন যখন একটি পশুও খুঁজে পেলনা তখন আক্ষেপ করে সে বলেছে ঃ

''গুরুবারে দক্ষিণস্বরে রজনী প্রভাতে।
এহার কারণে মোর স্পন্দিল দক্ষিণহাতে।।
ইহার কারণে খঞ্জন দেখিলু কমলে।''[১৫]

তার জন্মের সময় যে সব লৌকিক বিশ্বাস সঞ্জাত আচার-সংস্কার পালন করা হয়েছে সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তবুও লৌকিক চরিত্র আলোচনার প্রয়োজনে পুনরায় উল্লেখ করা হল মাত্র।

"চালফুড়ি আতুড়ি জ্বালিল ততক্ষণে
সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে।
গোমুণ্ডে স্থাপিল ষষ্ঠি দ্বার ডানিভাগে
পূজা করি ধর্মকেতু তাঁরে বরমাগে।
তিন দিনে করে রামা সুপথ্য পাচন
ছয়দিনে ষ্যাঠারা করিল জাগরন।
আটদিনে আট-কড়াইয়া করিল ধর্মকেতু
নয় দিনে নর্তা কৈলা সত-শুভ হেতু।
আনরূপ ব্যাধসূত দিবসে দিবসে
ষষ্ঠি পূজা একর্তিসা কৈল একমাসে।
পূজা করি সোসাই ওঝা দিল বলিদান
ঘোড়ার দক্ষিণে বলি বামে ঢোলকান।"[১৬]

আর একটি বিষয় লক্ষ করার মতো, পশুদের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু সব পশুকে মারলেও সিংহকে মারেনি। কারণ তার মনে একটি লৌকিক বিশ্বাস কাজ করছিল যে দেবীর বাহন কে মারলে হয়তো অমঙ্গল হবে। সে জন্যই (অবশ্যই লোকায়ত বিশ্বাস) যে ঃ

"দেবীর বাহন বলি নাহি বধে বীর।"[১৭]

তারপর স্নান আহার শেষ করে শিকারের উদ্দেশ্যে বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে এমন কতকগুলি দৃশ্য দেখেছে লোকবিশ্বাসে যা মঙ্গল সূচক।

"দক্ষিনে গনিকাদ্বিজ বিকশিত সরসিজ
বাঁয়ে শিবা পূর্ণ ঘটে জল।
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি কেহ জ্বালে গৃহমনি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।
দেখিল রুচির তনু বৎসের সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনি।" [১৮]

লৌকিক দেবীচণ্ডীর প্রতিও কালকেতুর অগাধ বিশ্বাস। কলিঙ্গরাজকে যুদ্ধে কালকেতু পরাস্ত করল। কলিঙ্গরাজ ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার গুজরাট আক্রমন করলে যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী অবস্থায় কালকেতু কলিঙ্গরাজের সামনে অকপট ভাষায় স্বীকার করেছে ঃ

"গুজরাটে নিবাস নিবসি চণ্ডীপুর
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর।
আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী।"[১৯]

এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কালকেতু চরিত্রের মানসলোক নির্মিত হয়েছে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস সংস্কারের সমন্বয়ে। তাছাড়া ভাড়ুদত্তকে যে পদ্ধতিতে কালকেতু শাস্তি দিয়েছে তা ও নিতান্তই লৌকিক-

''হেরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
মনের সন্তোষে ক্ষুর আনে বোড়া- ধার।।
দড়ায়্যা হুকুম পায় নাপিতের সুত।
ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত।।
চামতা থাকিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুরদুর।।
দুরে হৈতে শুনিয়া ক্ষুরের চড়চড়ি।
নাক সাঁড়া দিয়া তার উপাড়িল দাড়ি।।
বসন ভিজিয়া পড়ে সোণিতের ধার।
ভাঁড়ু বলে খুড়া ক্ষেমা কর একবার।।
পাঁচ ঠাঞি ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি।
এক গালে দিল চুণ আর গালে কালি।।
আনিয়া ভাঁড়ুর শিরে কেহ ঢালে ঘোল।
পিছে পিছে কোন জন বাজাইছে ঢোল।।''[২০]

সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে কালকেতু একটি আদর্শ লৌকিক চরিত্র।

ফুল্লরা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম নারী চরিত্র এই ফুল্লরা। কবি তার মনোলোকও সৃষ্টি করেছেন লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কারের সমন্বয়ে। কাব্যে দেখি যে সইয়ের বাড়ি থেকে চালধার করে ফেরার সময় কিছু চিহ্ন তার চোখে পড়েছে। লোকায়ত বিশ্বাসে যা অমঙ্গল চিহ্ন রূপে স্বীকৃত।

''সই গৃহে চালুসের করিআ উধার
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইসে কুড়ি আর দুয়ার।
বাম বাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি
কুড়্যার দুয়ারে দেখে রাকা চন্দ্রমুখী।''[২১]

এই ফুল্লরার মনে প্রচুর দুঃখ। তাদের ভাঙাঘর তাতে পাতার ছাওনী। বৈশাখ মাসের বাতাসে ঘর ভেঙে যায়। উপরন্তু এই বৈশাখ মাসে লোকে নিরামিষ খায়। ফলে মাংসও বিক্রি হয়না। জৈষ্ঠমাসে প্রচণ্ড গরম তাই মাংসের পসরা নিয়ে বেরোতে পারেনা আষাঢ় মাসে মাংসের বদলে খুদ কুড়া কিছু পাওয়া যায় কিন্তু তা দিয়ে তাদের উদর পূর্তি হয়না। এরকম ভাবে পুরো বছর জুড়েই নানান সমস্যায় তারা জর্জরিত থাকে। তাই ফুল্লরা দুঃখ করে বলেছে ঃ

''দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
ঠেকিনু সম্বল চিন্তা ফান্দে।''[২২]

কিন্তু তবু সুখে দুঃখে সে স্বামীর সঙ্গে সমান অংশীদার। শত অভাব সত্ত্বেও তার নৈতিক মূল্যবোধ বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়নি। কিন্তু স্বামী যে স্বর্ণগোধিকা নিয়ে আসে সে যখন রূপসীমূর্তি ধারণ করে কালকেতুর ঘরে থাকতে চায় তখন ফুল্লরা তাকে ভালোকরে বুঝিয়েছে যে ঃ

"স্বামী বণিতার পতি স্বামী বণিতার গতি
স্বামী বণিতার সে বিধাতা
স্বামী যে পরমধন স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা।"[২১]

আর এই স্বামীই যখন কলিঙ্গরাজের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী হযেছে। তখন কোটালকে সে অনুনয় বিনয় করে বলেছে ঃ

"না মার না মার বীরে নিদআ কোটাল
গলার ছিঁড়িয়া দিনু সতেশ্বরিহার।
চুরি নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দি
ধন দিআ গেলা দুর্গা হেমন্তের ঝি।
গো -মহিষ লহ মোর অমূল্য ভাণ্ডার
নফর করিআ রাখ স্বামী আমার।"
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরে পরান
এক অসি ঘাতে আগে ফুল্লরারে হান।"[২৪]

একজন পত্নীর কাছে স্বামী যে কতটা! তা তার উক্তি থেকে অবশ্য বুঝে নেয়া যাচ্ছে, স্বামীর জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত, এমনকি নিজের জীবন পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এই হলো বাংলার মূর্ত্তিমতি বধূরা, এ নারী আজও বাংলার ঘরে-ঘরে কিন্তু দুর্লভ নয়।

খুল্লনা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিকখণ্ডের' ধনপতির আখ্যান অংশের অন্যতম নারী চরিত্র খুল্লনা। লৌকিক বিশ্বাস সংস্কারের দ্বারা তার মনোলোক গঠিত। সামাজিক সংস্কার বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা। দেবী চণ্ডীর প্রতি তার অগাধ আস্থা। তাই ধনপতি সদাগরের সিংহল যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীর মঙ্গলের জন্য সে চণ্ডী পূজা করেছে।

"দুরন্ত সিংহলে পতির জানিয়া গমন।
তখনে চণ্ডিকা পূজে হইয়া সাবধান।।
ব্রতের সম্ভারে রামা পূজে দশভূজা।
প্রত্যক্ষ হইয়া মাতা লৈলা তানপূজা।।"[২৫]

চণ্ডীর প্রতি তার এই যে অগাধ আস্থা তা এমনি এমনি হয়নি। ধনপতির অবর্তমানে লহনা তাকে ছাগল চরাতে বনে পাঠিয়ে দিত। একদিন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে সে স্বপ্ন দেখে যে তার সর্বসী ছাগল হারিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভাঙে, এবং সে দেখে সত্যিই তার সর্বসী ছাগল নেই। নিরূপায় খুল্লনা ভাবে বাড়ি গেলে লহনা তাকে তিরস্কৃত করবে। তাই

ছাগলের খুঁজে সে গভীর বনে প্রবেশ করলে দেখে কযেকজন মহিলা মিলে সেখানে কি একটা করছে। খুল্লনা তাদের কাছে গিয়ে সব খুলে বললে তারা তাকে চণ্ডীব্রত করতে বলে।

"আমরা ইন্দ্রেব সূতা সকল ভগিনী।
কবিতে চণ্ডীর পূজা এসেছি অবণী।।
পূজার উচিত স্থান এ ভারতভূমি।
বিপদ হইবে দূব ব্রত কব তুমি।।"[২৬]

এর থেকে বোঝাযায ঐ মহিলারা আসলে দেবকন্যা আর মা চণ্ডী আসলে হারানো প্রাপ্তির দেবতা। তাই তার বরেই খুল্লনা তার হারানো ছাগলকে ফিরে পেয়েছে, আর সেই থেকেই মা চণ্ডীর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস।

সমাজে প্রচলিত আচার-সংস্কার- বিশ্বাস তার চরিত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। এগুলো তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিতও করেছে। ধনপতির সিংহল যাত্রাকালে দেখা যায-

"যাত্রা করি বাহিব হইতে সদাগর
মধ্যনগরে বাদিয়া নাচায়ে বানব।।
তাহারে দেখিযা সাধু চলযে তৎকাল।
যোগিনী মাগযে ভিক্ষা করে লইয়া থাল।।
তাহাকে দেখিযা যাত্রা না করিল ভঙ্গ।
পন্থে যাইতে দেখে বামে কালভুজঙ্গ।।
বামদিক হতে শিবা দক্ষিণে সে যাযে।
তৈল লৈবা লৈবা তেলীয়ে বোলাযে।।"[২৭]

এখানে উল্লেখিত যে সব বিশ্বসের পরিচয় রয়েছে সে গুলো মূলত লোকজীবনে প্রচলিত অশুভ বিশ্বাস। ফলে খুল্লনার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। স্বামীকে সে অনুনয় করে

"খুল্লনায়ে বলে প্রভু শুনহ বচন।
এত অমঙ্গল দেখি না যাও পাটন।।"[২৮]

লহনার দুষ্ট বুদ্ধিতে খুল্লনা বনে ছাগল চরাতে যাওয়ায় ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে স্বজাতি বর্গ খুল্লনার সতীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছে। খুল্লনাকে তাই সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এই সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়া লোকসমাজেরই একটা ধারণা । খুল্লনার মনেও সে ধারণা বর্তমান ছিল, কারণ সে তো লোকসমাজেরই একজন।

তারপর স্কুলে শিক্ষক মহাশয় শ্রীমন্তের পিতৃ পরিচয় নিয়ে কটাক্ষ করলে, বাড়ী এসে মায়ের কাছে পিতৃ পরিচয় জানতে চাইলে খুল্লনাকে বলতে শুনি -

"বিধি মোরে কৈলরঙ্ক আনিতে চন্দন শঙ্খ
পিতা তোর গেলরে সিংহল।"[২৯]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে খুল্লনার মনোজগতে থাকা বিশ্বাসের পরিচয়ই খুঁজে পাওয়া যায়। পুত্র শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহল যাত্রার প্রস্তুতি নিলে খুল্লনার ব্যথাতুর মাতৃ হৃদয়ে উচ্চারিত হয়েছে-

"যখনে যাইবা তুহ্মি দুরন্ত সিংহল।
বেড়াইমু যোগিনী হইয়া পরিয়া কুণ্ডল।
তোমার জনক জান গেল সেই দেশ।।
সে সব স্মরিয়া মোর তনু হইল শেষ
হলাহল খাই মুঞি, পড়িমু আনলে।
তোর তরে বধ দিমু প্রবেশিয়া জলে।"[৩০]

শিশুর জন্য ময়ের এত আকুলতা ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যাবেনা। তাই সমালোচক যথার্থই বলেছেন ঃ

"খুল্লনাকে অবলম্বন করে কবি বাঙালী সমাজের মাতৃত্বের একটি পরম রমনীয় চিত্র অঙ্কন করেছেন।"[৩১]

বলাবহুল্য এই আকুলতা সংস্কারাছন্ন মাতৃ হৃদয়ের।

লহনা ঃ লহনা কিন্তু একটু স্বাতন্ত্র্যে ভরা। সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কারে তার মনোজগৎ নির্মিত। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব দুর্বল। তাই দুর্বলার কূটচালে সে পরিচালিত হয়েছে। ফুল্লরার মতো সেও সতীনকে নিজের জীবনে মেনে নিতে পারেনি। তাই খুল্লনার প্রতি সে অনেক অত্যাচার করেছে। কিন্তু সে অত্যাচার অন্য কোন কারণে নয়, তার একমাত্র কারণ খুল্লনা সুন্দরী এবং সে বিগত যৌবনা। তাই স্বামীর সোহাগ থেকে সে যেন বঞ্চিত না হয়। স্বামীর সোহাগ আদায়ের জন্য তাই সে তুক্ তাক্ ও মন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে। লোক সাহিত্যে এটাকে 'ম্যাজিক পাওয়ার'বলে। লহনা লীলাবতীর কাছ থেকে ধনপতিকে বশীকরণ করার সমস্ত ঐন্দ্রজালিক প্রথাকে মেনে নিয়েছে। লীলাবতীর কাছ থেকে তাই সে উপদেশ নিয়েছে।

"মোর বোলে লহনা কর অবধান
ঔষদ করিআ তোর সাধিব সম্মান
পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে
ঘৃতের প্রদীপ তথি দিবে প্রতিদিনে।
নিরামিষ্য অন্নখাবে তার পত্র পাড়ি
সাধু হব কিঙ্কর খুল্লনা হব চেড়ি।
পত্রিকা ভাসাইয়া আন্য হরিদ্রার মূল
জতনে আনিও শ্মশানের তিলফুল।
ইহা বাট্যা দিহ সাধু-খুল্লনার বসনে"[৩২]

শুধু স্বামীকে বশে রাখার জন্য তন্ত্র-মন্ত্র ঝাড়-ফুক করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি লহনা, মনে মনে এই পরিকল্পনাও ছিল যে কি করে স্বামীর সোহাগ থেকে খুল্লনাকে বঞ্চিত করা যায়। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রাকালে তাঁর মঙ্গলের জন্য খুল্লনা লুকিয়ে চণ্ডী পূজা করেছে। লহনা স্বামীর কাছে খুল্লনাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ধনপতিকে সেই পূজার সমস্ত খবর দিয়ে দেয়। পরম শৈব ধনপতি তা শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে পদাঘাতে চণ্ডীর ঘট ফেলে দিয়ে চলে গেল।

শুধু তাই নয় লীলাবতীর পরামর্শে সে খুল্লনার রূপনাশ করার জন্য তাকে দিয়ে ছাগল চরিয়েছে, তাকে ঢেঁকিশালে ঘুমোতে দিয়েছে, উদ্দেশ্য খুল্লনার রূপ যৌবন নষ্ট করা। লহনা

ভেবেছিল খুল্লনার রূপ নষ্ট হলে হয়ত স্বামী তাকে আর কাছে ডাকবেনা। কিন্তু পরবর্তি সময়ে চণ্ডীর দ্বারা স্বপ্নে আদিষ্টা হয়ে খুল্লনার প্রতি ভালো ব্যবহার করেছে আবার পরমুহূর্তেই দুর্বলার পরামর্শে তার সঙ্গে বিরূপ আচরণ করেছে। কিন্তু লহনা চরিত্রের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম দিক হলো তার মাতৃত্ব। তার নিজের কোন সন্তান নেই তবু খুল্লনার ছেলের প্রতি তার মাতৃত্বে এতটুকু খাদ্ ছিল না। সব মিলিয়ে চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের লহনা লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাসে পরিচালিত একটি সার্থক লৌকিক চরিত্র।

ধনপতিঃ ধনপতি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিক খণ্ডের' নায়ক। বণিক হলেও তার মনোলোকেও লোকবিশ্বাস, সংস্কার, এগুলো বদ্ধমূল ছিল। কাব্যে দেখি তার বাণিজ্য যাত্রা কালে ঃ

"বাহির হইতে সাধু বাজিল উছটা
নেতের আঁচলে লাগে সেয়াকুল কাঁটা।
যাত্রার সময়ে ডোম চিল উড়ে মাথে
কাঠুরিআ কাঠভার লৈয়া আসে পথে।
সুখানা চালাতে বস্যা কল বলযে কাউ
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আদখানি লাউ।
জরট কমট মাছ্ কৈবর্ত লৈয়া জায়
তৈল লঅ, লঅ বলি তেলীযা বোলায়।
চলিলেন সদাগর দুঃখে কুতূহলী
বামে ভুজঙ্গ দেখে দক্ষিণে শৃগালী।"[৩৩]

লোক বিশ্বাসানুসারে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি অমঙ্গল সূচক। তাই ধনপতি ভীষণ দুঃখিত হয়। মনে অনেক আশঙ্কা নিয়ে তাই সে বাণিজ্য যাত্রা করেছে। যদিও বাণিজ্য যাত্রার আগে গণক কে দিয়ে সে স্থির করিয়ে নিয়েছে লগ্ন। গণক বলেছে যে সদাগরের এবার সিংহল যাত্রা অশুভ । কারণ হিসেবে সে যা দেখাচ্ছে তা লোকায়ত বিশ্বাসেরই ফসল। এমনকি ভাগ্য গণনা বিষয়টিও লোকায়ত বিশ্বাসেরই অন্যতম উপাদান। গণক বলেছে ঃ

"এবার না যাইয় সাধু মোর বাক্য শুন।
নবগ্রহগণ তোরে হইছে বিমন।।
দিনকর বৈরী সাধু সম্পত্তি ঘরে কুজ।
অষ্টম রাশিতে তোর সোম তনুজ।।
যাত্রা নাহি সাধু তোহ্মার বৎসর অবধি।
বড় দুঃখ পাইবা এহাতে চল যদি।।"[৩৪]

কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সিংহল যাত্রা করেছে। যাত্রার সময় লোকায়ত বিশ্বাসে অশুভ বলে বিবেচিত এমন কিছু দৃশ্য ধনপতি দেখেছে যা ধনপতির মনেও বিদ্যমান। স্বভাবতই তার মন খারাপ হয়ে গেছে। তবুও -

"চলিলেন সদাগর দুঃখে কুতূহলী।"[৩৫]

এছাড়া ধনপতি চরিত্রের অন্য দিকও আছে। ধনপতি ভীষণ চতুর। তার চাতুর্যের পরিচয় আমরা পাই খুল্লনাকে বিয়ে করার জন্য যখন সে লহনাকে নানা কথায় তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

"রূপনাশ কৈলা প্রিয়া রন্ধনের শালে
চিন্তামনি নাশ কৈলা কাচের বদলে।"[৩৬]

তাই রান্নার জন্য সে লহনাকে একজন দাসী এনে দেবে বলেছে । 'রন্ধনের তরে তোমা আনিদেব দাসী'। কিন্তু তবু লহনা তাতে রাজি হয়নি অবশেষে একটি পাট-শাড়ী ও চুড়ি তৈরীর জন্য পাঁচ তোলা সোনা দেবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে লহনা রাজি হয়েছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে ধনপতির বণিক সুলভ চতুরতা ও কপটতা প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে লোকসমাজে নারীকে সন্তোষ্ট করার সহজ কৌশলে পরিচয়ও রয়েছে।

চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে এছাড়াও আরও কিছু অপ্রধান চরিত্র রয়েছে সে গুলোর মধ্যে শ্রীমন্ত ও দুর্বলার নাম উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকের মনোলোক গঠিত হয়েছে লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির সমন্বয়ে।

শ্রীমন্ত ধনপতি সদাগরের ছেলে, সাহসী ও বুদ্ধিমান। মাতা-পিতার প্রতি তার সমান ভক্তি শ্রদ্ধা, তার জন্মের পূর্বেই পিতা ধনপতি বাণিজ্য যাত্রা করেছে এবং সিংহল রাজ কর্তৃক বন্দী হয়েছে। তাই জন্মের পর সে পিতাকে দেখেনি। গুরু মশাই পিতৃ পরিচয় জানতে চাইলে সে কিছু বলতে পারে নি। পরবর্ত্তি সময়ে যখন সে জানতে পারলো যে তার বাবা বাণিজ্য যাত্রায় সিংহল গেছে। তখনই সে মনে মনে সিংহল যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছে। মা চণ্ডীর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস।

"ক্ষেমারূপ হইয়া মাতা কৈলা সুপ্রকাশ।
ক্ষেমিয়া সকল দোষ রাখ নিজ দাস।
দক্ষিণ মসানে এহি দেবীর স্তবন।
স্মরণে বিপদ খণ্ডে দুঃখ বিমোচন।"[৩৭]

মূলত এই দেবীকে স্মরণ করেই সে সিংহল যাত্রা করেছে। যাত্রারম্ভের সময় শ্রীমন্ত কিছু দৃশ্য দেখেছে, লোকিক বিশ্বাসে যা শুভের প্রতীক।

"বাহির হইয়া দেখে মঙ্গল সূচন
পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আসে সীমন্তিনীগন।।
বামেতে শ্রীকালি দেখে ধাএ যুতে যুতে।
সুরজ লইয়া আসে নটসুভে।।
মাহুত চালায়ে দেখে মত্ত করিবর।
সদ্য মৃগ মাংস আনে বেচিতে নগর।।
মালা লইয়া উপনিতি হৈল মালাকার।
আর্শীবাদ করে তানে দৈবজ্ঞকুমার।।
দধি লৈবা দধি লৈবা ডাকে গোয়ালিনী।
মধু লৈবা মধু লৈবা ডাকে মধুআনী।।

আগে আগে পবনে উড়াইলে যাএ রেণু।
ডাইনে পলটি দেখে বৎস সমেত ধেনু।।''[৩৮]

শুধু তাই নয় ঘর থেকে বেরিয়ে নৌকায় উঠার আগে শ্রীমন্ত আরো কিছু দেখতে পেয়েছে যা লোকায়ত বিশ্বাসে শুভ লক্ষণ বলেই পরিচিত।

''যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর।
নগরে উঠিতে দেখে মত্ত করিবর।।
পাটনে যাইতে সাধু দিব্য বিপ্র দেখে।
সীমন্তিনীগন দেখে পূর্ণ-ঘট কাঁখে।।
পাটনে চলিযা যাযে সদাগরের বালা।
নগরে উঠিতে খালি যুগায় পুষ্পের মালা।।
চলিয়া যাইতে সাধু ভ্রমরার ঘাটে।
গাভী প্রসবে বৎস দেখয়ে নিকটে।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত লইযা ডাকে চারিভিতে।
সদ্য-মাংস দেখে সাধু নৌকায চড়িতে।''[৩৯]

সভাবতই যাত্রার সময় এই সব শুভ লক্ষণ গুলো দেখে সে সিংহল যাত্রা করেছে। যাত্রাপথে কমলে কামিনীর দৃশ্য দেখে গেছে সে। তাই সিংহল রাজ সমীপে সে কথা বললে রাজা যখন সেই দৃশ্য দেখতে চাইলেন শ্রীমন্ত তা দেখাতে না পারায় তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রীমন্ত তখন চণ্ডীর স্তব করলে ভূত, প্রেতদের নিয়ে চণ্ডী রাজার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে হারিয়ে দেন। পরে চণ্ডীর কৃপায়ই শ্রীমন্ত সিংহল রাজকে কমলে কামিনীর দৃশ্য দেখাতে সক্ষম হন। ফলে বন্দী বাবাকে সেখান থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

শ্রীমন্তের মধ্যে আমরা লোককথার সেই নায়ককে খুঁজে পাচ্ছি যে অসাধ্য সাধন করেছে, লোককথায় সবসময় দেখি যে ছোটরাণীর ছেলেই অসাধ্য সাধন করে। এখানে খুল্লনাও ছোট এবং তার ছেলেই আসাধ্য সাধন করেছে। বলাবাহুল্য যা লোকসাহিত্যের Successfull Youngest Son/Daughter/Daughter in law motif কে মনে করিয়ে দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মমঙ্গল কাব্য ও লোককথা

'ধর্মমঙ্গল' আর্যেতর সংস্কৃতির স্মৃতিবহ। এই মঙ্গলকাব্যের আরাধ্য দেবতা ধর্মঠাকুর। ধর্মপূজা সম্পর্কে 'শূণ্যপুরাণ' এর ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'ত্রিপুররাজ ডোমরমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করে ডোমরাজা বা ডোম আচার্য্য নামে পরিচিত হন। তাঁর আরেক নাম 'ডোমপা'। এর অর্থ ডোমরমণীরপতি । এই ডোমপা ই তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ধর্ম পূজার প্রচলন করেন। প্রথমে ত্রিপুরে ও পরে তা রাঢ় বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অন্য একদল বিশেষজ্ঞের মতে ধর্মপূজা পশ্চিম বাংলার অনার্য অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলেই প্রথম শুরু হয়, এবং পরে তা রাঢ় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্ম ঠাকুরের পূজকদের মধ্যে ডোম, চাড়াল, ধোপা, বারুই, শুঁড়ি প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজে এদের ঘৃণার চোখে দেখা হত। এ সম্পর্কে কবি মুকুন্দের দুটি লাইন প্রাণধান যোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

> ''অতিনীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
> কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।''[১]

এই চোয়াড় রাই তাদের সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও ধ্যান ধারণার মাধ্যমে ধর্মঠাকুরের ভাবমূর্ত্তি সৃষ্টি করেছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কয়েকজন সার্থক কবিরা হলেন, ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম ও রূপরাম চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সকল কবিরা তাদের কাব্য রচনা করতে লোকসাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কবিরা সৃষ্টি-প্রকরণ সম্পর্কিত লোকপুরাণকে অনুসরণ করেই ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন । পূর্ববঙ্গের লোকপুরাণে বর্ণিত সৃষ্টি প্রকরণ তত্ত্বটি এরকম ঃ

> ''না ছিল স্বর্গমর্ত না ছিল পাতাল।
> জল মধ্যে ভাসে প্রভু সেই দীনদয়াল।।
> নাহি ছিল হুতাশন না আছিল পানি।
> নাহি ছিল গুরু-শিষ্য ভাটি আর উজানী।।
> নাহি ছিল চন্দ্র সূর্য্য না আছিল শিব।
> সর্পের মুখে না আছিল কাল কূট বিষ।।
> হুঙ্কারে না হইল সব স্থান নৈরাকার।

না আছিল জল স্থল ঘোব অন্ধকার।
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদি হইল মন।
শক্তি বিনে কি রূপেতে কবিবে সৃজন।।
নিদ্রা ভাঙ্গি মহাপ্রভু হইল চেতন।
চেতনা পাইযা দেখে ছাযার লক্ষণ।।
শোনিতে স্থাপিযা প্রভু দিল এক আবা।
শূণ্য মধ্যে জন্মিলেক লক্ষ লক্ষ তাবা।।
উদবে না বহে বীর্য মুখেতে আসিল।
সেই বীর্যে সূর্য দেব তখনে হইল।।
সেই বীর্যে চন্দ্র জন্ম হইল তখন।
জন্মিযা যে চন্দ্র দেব উঠিল গগন।।''[২]

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও অনুরূপ সৃষ্টি প্রকরণ তত্ত্বের বর্ণনা আছে। যেমন ঃ

''না ছিল জীব জন্তু প্রলয বিষয কিন্তু
এক ব্রহ্ম আছেন গোঁসাই।।''[৩]

এই যে ধারণা তা সার্বজনীন লোক অভিপ্রায থেকে সৃষ্ট।

Resuscitation বা পুনর্জীবন লাভ লোক কথার একটি অভিপ্রায। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যেই তা বর্তমান। Thompson এব 'The Falk tale' গ্রন্থে এই বিষযটিকে এভাবে বর্ণনা করা হযেছে ঃ

"The parts of the dismentored Corpes are
brought together and revised".[৪]

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও এরকম প্রচুর পুনর্জীবন লাভের ঘটনা বর্তমান। প্রথমত রাণী রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় লৌহশলাকায় ঝাপ দিযে প্রাণত্যাগ করলে ধর্ম সন্তুষ্ট হযে তাকে পুনর্জীবন দান করেন ।

''শাল হৈতে কোলে তারে তুলিলা ঠাকুর।
মুছিল শালের চিহ্ন ঢালিলা সিন্দুব।।
চাঁপাযের ঘাটে তারে করাইল স্নান।
মঞ্জলি পঞ্চভূত রাণী পাইল প্রাণ।।
পদ্ম হস্ত বুলাইতে হলো সচেতন।
প্রাণ দিয়ে নিমিষে লুকাল নিরঞ্জন ।।''[৫]

দ্বিতীয়ত জামতিতে বারইনারী নয়ানীর প্রেম প্রত্যাখান করলে ভ্রষ্টানারী ছলচাতুরি করে লাউ সেনকে কারাবাস করায় পুত্র হত্যার দায়ে। অবশেষে ধর্মঠাকুরের কৃপায় মৃত পুত্র পুনরায় জীবন ফিরে পেলে কারামুক্ত হলো লাউ সেন, কাব্যে পাই ঃ

''করিয়া এতেক স্তুতি মৃত শিশু শিরে।
অর্ঘ্যদান দিতে প্রাণ আইল শরীরে।।

গাযে হস্তে বুলাইতে তপস্যাব বলে।
উঠে শিশু লোটায সেনেব পদতলে।।"[৬]

ইছাই ঘোষেব সাথে যুদ্ধে লাউ সেনের সেনাপতি কালুডোম নিহত হলে সেনের আকুল প্রার্থনায ধর্মঠাকুর কালুডোমকে পুনর্জীবন দান করেন। কাব্যে পাই ঃ

"এত বলি কালুব বদনে দিলাজল
প্রাণ পেয্যা উঠে কালু ডোমেব নন্দন।।"[৭]

শুধু ধর্মঠাকুব নন, দেবী চণ্ডীব কৃপাযও পুনর্জীবন লাভের দৃষ্টান্ত আছে ধর্ম মঙ্গল কাব্যে । 'ইছাই বধ' পালায দেখি যে লাউ সেনের সঙ্গে যুদ্ধে ইছাইযেব মুণ্ড ধড় চ্যুত হলেও সে পুনবায জীবিত হযে উঠেছে চণ্ডীব কৃপায।

"মহাবীব ইছাই উঠিল প্রাণ পায্যা।
অভযাচবণ বন্দে অবণী লোটায্যা।।"[৮]

লাউসেনকেও পুনর্জীবন দান করেছেন ধর্ম ঠাকুর। পশ্চিমে সূর্যোদয করানোর অবাস্তব কাজ মহামদ তাকে করতে দিলে তিনি সম্মত হননি। তাই পরিণামে তাকে কারাগারে বন্দী করে বাখা হয। অবশেষে কর্ণসেনের প্রতিশ্রুতিতে মুক্ত হলেন লাউসেন। কিন্তু পশ্চিমে সূর্যোদয কবানো নিযে ভাবনায পড়লেন তিনি। অবশেষে কোন ভাবেই অভীষ্ট পূরণ না হওযায নিজের দেহকে ন'টি খণ্ড করে ধর্মপূজার অর্ঘ্য দিলে মুগ্ধ হযে ধর্মঠাকুর লাউসেনকে পুনর্জীবন দান করেন।

Successful youngest son (Daughter or Daughter-in-law) motif বাংলার লোক কথায বহুল প্রচলিত। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'The falk tales of Bengal' গ্রন্থের 'The origin of Robies' গল্পে দেখি এক রাজার চার ছেলে। ছোট ছেলে বড় আদরের। অন্য তিন ভাই তাই হিংসের জ্বালায জ্বলে পুড়ে মা আর ছোট ভাইকে আলাদা করে দিল। একদিন নৌকায করে মা ও ছোট ছেলে নদীতে ভেসে পড়ল। রাজপুত্র ছযটা চুনী নদীর জল থেকে তুলল। তারপর তারা চলে গেল অন্য এক রাজার রাজ্যে। সেখানে চুনী দিয়ে তাকে গুলি খেলতে দেখে রাজকন্যা তার বাবার কাছে তা চাইল। এক হাজার টাকার বিনিময়ে রাজপুত্র সেই চুনী রাজাকে দিয়ে দিল। তারপর সে আরো চুনী আনতে সমুদ্রের তলায চলে গেল । সেখানে সে দেখে এক যাদু-প্রাসাদে একজন বসে ধ্যান করছে, আর তাকের উপর একটি মেয়ে শুয়ে আছে, তার ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করা। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় মেয়ে বেঁচে উঠল। ধ্যানকরা লোকের ধ্যান ভাঙ্গার আগেই তারা চুপি চুপি পালাল। তারপর দুই রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখে দিন কাটাতে লাগল। এখানে দেখি রাজার কনিষ্ঠ পুত্রই অসাধ্য সাধন করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখি যে কর্ণসেনের ছয় ছেলে মারা যাবার পর লাউসেনের জন্ম। তাই লাউসেন হলো কনিষ্ঠ এবং সেই অসাধ্য সাধন করে গেছে কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং এইটুকু ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে এই ধারণা মঙ্গল কবিরা লোককথা থেকে পেয়েছেন।

লোককথায় Supernatural birth motif নামে এক প্রকার লোক অভিপ্রায় রয়েছে। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত ঠাকুর দাদার ঝুলির 'মধুমালা' গল্পে দেখি এক রাজ্যের রাজা আঁটকুঁড়ে, তার কোন ছেলে মেয়ে নেই । বিধাতা পুরুষ সাধুর বেশে এসে গাছ থেকে এক নিঃশ্বাসে সোনার 'যুগল ফল' আনতে বললেন। কিন্তু রাজা ব্যর্থ হলেন। শেষে স্বর্ণপাখীর মাংস খেয়ে রাজা সন্তান লাভ করলেন। ঠিক তেমনি ভাবে দেখি যে ধর্মমঙ্গল কাব্যেও নিঃসন্তান কর্ণসেন পুত্র সন্তান লাভ করেছেন অনেক কষ্টে। রাণী রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে ধর্ম ঠাকুর তাকে পুণর্জীবন দান করার সাথে সাথে পুত্রবতী হওয়ার আশীর্বাদও দিলেন। ধর্মঠাকুরের আশীবদেই রঞ্জবতী পুত্র হিসাবে লাউসেনকে পেলেন। তাই তার জন্মকে Supernatural birth motif নামে অভিহিত করা যায়। সুতরাং এখানেও মনে হয় যে মঙ্গল কবিরা লোককথা থেকেই এসব ধারণা গুলো পেয়েছেন ।

Magic Power বা Magic Wisdom ও লোককথার একটি বহুপরিচিত অভিপ্রায়। Rev. Lal Bihari Dey'র The Falk Tales of Bengal গ্রন্থের 'ঘুমন্তপুরী' গল্পে দেখি ঃ

রূপবান রাজপুত্র একা দেশ ভ্রমনে গেলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক রাজপুরীতে গেলেন। সেখানে সবই আছে কিন্তু কেউ নড়াচড়া করছে না। কেউ কোন কথা বলছে না। এই রাজপুরীরই একটি কোঠায় পদ্মফুলের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে এক রাজকন্যা। সে যেন অনেক বছর ধরেই ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ রাজপুত্র দেখতে পেলো রাজকন্যার মাথার পাশে একটি সোনার কাঠি ও পায়ের কাছে একটি রূপোর কাঠি রাখা আছে। রাজপুত্র সাহস করে সোনার কাঠি রাজকন্যার মাথায় ছোঁয়াল, সাথে সাথেই রাজকন্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাথে বাড়ির অন্য সবাইও জেগে উঠল। রাজা তখন রাজপুত্রকে বললেন 'তুমি আমাদের মরণ ঘুম থেকে বাঁচিয়ে তোলেছ' তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তারপর রাজকন্যার সাথে রাজপুত্রের বিয়ে হলো। এদিকে রাজপুত্রের বাবা ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল। পরে রাজপুত্র বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে বাবার অন্ধত্ব দূর করল। এখানে বলতে অসুবিধে নেই যে এই সোনার কাঠিটি আসলে যাদু কাঠি। যাদুর সাহায্যেই রাজপুত্র এই অসাধ্য সাধন করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখি যে কামরূপ আক্রমণের উদ্দেশ্যে লাউসেন ব্রহ্মপুত্র তীরে এসে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেনযে ব্রহ্মপুত্রের জল কানায় কানায় পূর্ণ। জল না কমা পর্যন্ত কিছুতেই কামরূপ আক্রমণ করা যাবে না। অথচ ব্রহ্মপুত্রের জল এত তাড়াতাড়ি কমবেও না। তখন ভেবে চিন্তে লাউসেন একটা উপায় বের করলেন। লাউসেন জানতেনযে গৌড়েশ্বরের মায়ের কাছে একটি কাটারিও জপমালা আছে, যার সাহায্যে জল শুকিয়ে ফেলা ও কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মন্দির থেকে দূর করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে দেবী কামাখ্যা মন্দিরে থাকলে কারো পক্ষে কামরূপ জয় করা অসম্ভব, এরকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। ফলে লাউসেন মূলত যাদুশক্তির দ্বারা দেবীকে সে মন্দির থেকে সরিয়ে ফেলেন। ফলত কাটারিও জপমালার সাহায্যে লাউসেন কামরূপ জয় করেন। অর্থাৎ এখানেও যাদু শক্তিই কাজ করেছে ।

"দেউস দুযার দেশে দেবীর সম্মুখ।
করজাপ্য দেখাইতে ঈশ্বরী হেঁটমুখ।।
দুযার চাপিয়ে বসে দ্বীপিচর্ম্ম পেড়ে।
মালা দেখি দেউল ভেঙ্গে দেবী গেল ছেরে।।
ভাঙ্গিয়া পড়িতে চূড়া চমৎকাব পড়ে ।
প্রসাদ পড়িল বড় কাঙুরের গড়ে।।"[৯]

এছাড়া রঞ্জাপুত্র লাউসেনকে চুরি করার সময় সবাইকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ইঁদুরের মন্ত্রপুত মাটি ছাড়িযে দেওয়া হয ময়না নগরে। কাব্যে পাই ঃ

"বর পেযে অভয়ে আনিল ইন্দুব মাটী।
মন্ত্র পড়ি জাগাযে ছোঁযাল সিঁদ কাঠি।।
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
মযনা নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর।।"[১০]

ইঁদুরের মাটি মন্ত্রপুত করে ঘুম পাড়ানোর পদ্ধতি লোক বিশ্বাস থেকেই জাত। লোক কথায় মন্ত্র-তন্ত্র-তুক তাকের উপস্থিতি অনেক বেশি। ঠাকুর দাদার ঝুলির 'কাঞ্চনমালা' গল্পে যাদু শক্তির অধিকারিনী মালিনী মন্ত্র বলে রাত্রির গতি স্তব্ধ করে দেয়,

"কুলা ধূলা আঙ্গট্ পাত তে-পথ পথে বিছাইযাআস্ত
মান-পাতা বোন্-ঝির মাথায় ধরিযা তিন শীষ দুর্ব্বা
ছড়াইযা মালিনী মন্ত্র ডাকিল। মন্ত্রে বাত আর পোহায
না।"[১১]

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বলাই যেতে পারে যে মঙ্গল কবিরা মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুক এগুলোর ধারণা লোককথা থেকেই হযত গ্রহণ করেছেন।

Transformation motif ও লোককথারই একটি গুরুত্বপূণ অভিপ্রায। রেভারেণ্ড ললবিহারী দে'র 'The Falk Tales of Bengal' গ্রন্থের একটি গল্পে দেখি যে দুই গরীব ভাই বোন ছাগল চরিয়ে খায় । দুজনেই দেখতে অপূর্ব সুন্দর। বিশেষ করে বোনটি। রাজার বাড়ির ফুল তুলতো বোনটি, তার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজপুত্র তাকে বিয়ে করল। কিন্তু বাধ সাধলেন শাশুড়ি। তিনি বৌকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারলেন না। তাই রোজ তিনি বউকে সাপ রান্না করে দিতেন খাওয়ার জন্যে। এমনি করে বৌ একদিন সাপ হয়ে গেলো। সাপ হয়ে সে একদিন এক বাধের ধারে চলে গেল। ভাই থাকতো বাঁধের উপর আর সে থাকতো বাঁধের নীচে জলে। কিছুদিন পর সাপের এক ছেলে হল । ছেলে থাকতো ভাইয়ের সাথে। এভাবেই কষ্টে তাদের দিন কাটতে লাগলো। একদিন রাজপুত্র খোঁজ পেয়ে সাপের খোলস থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করলো। লোককথায় এরকম অনেক রূপ পরিবর্তন করার গল্প রয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখি যে ইছাই ঘোষের সেনাপতি লোহাটা বজ্জর কালুডোমের হাতে নিহত হলে সে লোহাটার কাটামুণ্ড পাঠিয়ে দিল মহামদের কাছে, আর মহামদ এই মুণ্ডটিকে নিজের কাজে ব্যবহার করল। লোহাটার মাথাকে লাউসেনের মাথা সাজিয়ে ময়নায় পাঠিয়ে

দিল। লাউসেনের মৃত্যু সংবাদে ময়নায় হাহাকার উঠলে ধর্ম চিলের রূপ ধারণ করে সেই মুণ্ড নিয়ে কলিঙ্গার কাছে সব তথ্য প্রকাশ করে দিলেন।

Talking Bird motif লোককথার একটি পরিচিত অভিপ্রায়। দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' গল্প সংগ্রহের 'নীলকমল লালকমল' গল্পে এরকম কথা বলা পাখির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গল্পে আছে এক রাজা তাঁর দুই রাণী। কিন্তু ছোট রাণী যে মানুষরূপী রাক্ষসী তা কেউই জানো, রাজাও না। যথাসময়ে তাদের দুই সন্তান হলে নাম রাখলেন অজিত আর কুসুম। দুই ভাইয়ে খুব মিল। রাক্ষসীর তা পছন্দ হলনা, তাই একদিন সতীন পুত্র কুসুমকে গভীর রাতে সবার অলক্ষে খেয়ে ফেলল। কিন্তু অজিত সেটা দেখে ফেললে নিজের পুত্র অজিতকেও খেয়ে ফেলল। দুই ছেলেকে খাওয়ার পর রাক্ষসী মুখ থেকে পুনরায় তাদেরকে বের করে আনলো, না মানুষ রূপে নয়, একজনকে সোনার বল ও অন্যজনকে লোহর বল রূপে। তারপর তাদের কে বাঁশ গাছের নীচে মাটি খুঁড়ে পুতে রাখলো । একদিন এক কৃষক জমি খুঁড়তে গিয়ে এগুলো পেল। পেয়েই সে বল দুটোকে মাটিতে ফেলে দিলে দুই বল থেকে দুই রাজ পুত্র বেরিয়ে এলো। লাল বল অর্থাৎ সোনার বল থেকে যে বেরিয়ে এল তাঁর নাম লালকমল এবং নীল বল অর্থাৎ লোহর বল থেকে যে বেরিয়ে এল তাঁর নাম নীলকমল। বল থেকে বেরিয়েই তারা দ্রুত সেই রাজ্য ছেড়ে চলে গেল । যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে তারা এক বটগাছের নীচে বিশ্রাম নিল । হঠাৎ তারা শুনতে পেল গাছের উপর থেকে কাদের কথা ভেসে আসছে। একজন স্ত্রী যেন অন্য একজনকে বলছে, 'আহা এমন দয়াল কা'রা, দুফোঁটা রক্ত দিয়া আমার বাচ্চাদের চোখ ফুটায়'। তখন নীচে থেকে নীলকমল লালকমল রক্ত দিতে রাজি হলে গাছ থেকে নেমে এল এক বেঙ্গমাপাখি। সে নীলকমল ও লালকমলের রক্তের সাহায্যে নিজ বাচ্চাদের চোখ ফুটিয়ে তুলল। এই ব্যঙ্গমা-বেঙ্গমীর সাহায্যেই পরবর্তি সময়ে তারা রাজার রাক্ষসী স্ত্রীর জীয়নকাঠি, মরণকাঠি স্বরূপ ভীমরুল-ভীমরুলীকে মেরে অর্থাৎ রাক্ষসীকে বিনাশ করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যেও এরকম কথা বলা পাখির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। কাব্যের 'পশ্চিম উদয়পালায়' দেখা যায় যে রাজ্যের খবর, মাতা-পিতা, পুত্রের খবর পাওয়ার জন্য যখন লাউসেন ব্যকুল তখন শুক পাখি বলছে-

> "সারী শুক বলে রাজা কর অবগতি
> আমি তব পিতাপুত্র সোদর সারথি।।
> লঘুগতি বারতা আনিয়া আমি দিব। -
> তোমার লবনে বন্দী যত কাল জীব।"[১২]

লোককথায় অনেক সময় লক্ষ করা যায় যে পশুরা ত্রাতা ও রক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের হনুমান এমনি এক চরিত্র যে নিজের বিচার বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে লাউসেনকে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করেছে ও বিপদমুক্ত করেছে। লোককথায় একে বলে 'অভিজ্ঞ পশু অভিপ্রায়' ।

চরিত্র চিত্রনে লোক উপাদান

লাউসেন ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন। তাঁর জন্ম মূলত ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে। ধর্মঠাকুরের প্রতি তাই তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কাব্যে দেখি যে লাউসেন ধর্মের কৃপায় নানারকম অসাধ্য সাধন করেছে। ধর্মঠাকুর তাকে সবরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, এমনকি তাঁকে পুনর্জীবন দান করেছেন। কামদলবাঘ বধ, লোহারগণ্ডারের মস্তক ছেদন, ইছাই বধ থেকে শুরু করে হাকন্দতপস্যা লাভের মাধ্যমে তাঁর ধর্মঠাকুরের প্রতি বিশ্বাসের সত্যতা নিরূপন করা যায়। কাঙুর যাত্রার সময়ও তার ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যে পাই ঃ

"ধর্ম্মে ধ্যান করি অশ্বে আরোহিলা রায়।"[১৩]

শুধু তাই নয় বীর হিসাবেও তার খ্যাতি জগৎ জোড়া। এখানে একটি সংশয় থাকা খুবই স্বাভাবিক, যে চরিত্র সম্পূর্ণভাবে দেবতার অনুগ্রহে পুষ্ট, দেবতা যাকে সবরকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, সেই চরিত্রের মধ্যে বীরত্বের আদর্শ থাকাটা প্রশ্নাতীত নয় কিন্তু আমরা যদি আমাদের পৌরাণিক কাহিনি গুলোর দিকে মনোনিবেশ করি তাহলে দেখবো যে সেখানে বর্ণিত প্রায় সব বীর চরিত্রই দেবতার অনুগ্রহ পুষ্ট। রামায়ণে রামচন্দ্র রাবণকে স্বাভাবিক ভাবে মারতে পারেননি। রাবণকে মারতে গিয়ে রামচন্দ্রকে অকাল বোধন করতে হয়েছে। তারপর সেই দৈবী শক্তির সাহায্যে রামচন্দ্র রাবণ বধ করেছিলেন। শুধু রামচন্দ্র কেন মহাভারতের কর্ণবীর। এই বীরত্বের মূলে ছিল তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল। লাউসেনকে ধর্মঠাকুর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন সত্য, কিন্তু বিপদে পড়ার আগে তিনি কিছু করেন নি। নিজের বুদ্ধি কৌশলে ও ধর্মের প্রতি অচল ভক্তি তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে অপরিমেয় শক্তি যুগিয়েছে। গৌড় যাত্রার পথে কামদলবাঘ হত্যা ও বণ্যহাতী বধের মাধ্যমে তার এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দৈব আনুকুল্য বাদ দিয়ে দিলে লাউসেনের মধ্যে আমরা এক মানবীয় চরিত্রের বিকাশ লক্ষ করি। দেশব্যাপী প্রবল বর্ষণ ও মহাপ্লাবন শুরু হলে ধর্মঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে তিনি দেশের মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছে। দেশবাসীর জন্য তার এই যে ত্যাগ তার প্রমাণ হাকন্দ তপস্যা।

"ধূপধুনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার।
পূজা করে লাউসেন ঠাকুর খর তার।।
ভারত ভূমেতে যবে একদণ্ড রাতি।
গাত্র বসাইল সেন হীরাধার কাতি।।
মহামাংস কাট্যা দেই দণ্ডের উপর।
যূথীপুষ্প হয়্যা পড়ে ধর্মের নিয়ড়।।
সব মাংস কট্যা দিল অস্থি হৈল সার।
গলে কাতি দিল তবে রাজার কুমার।।
গলে কাল দণ্ড দিয়া বলে রামরাম।
আপনার মাথ্যা কাট্যা দিল বলিদান।।"[১৪]

এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকটিত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে মানব সমাজের জন্য তার তপস্যা কৌম সমাজের যৌথ জীবনাচারের বৈশিষ্ট্যকেও পরিস্ফুট করছে।

লাউসেন চরিত্রের মনোলোক নির্মাণেও লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার উপাদান হিসাবে কাজ করেছে, যুদ্ধযাত্রার আগে সে -

''পথে যত অমঙ্গল পদ্ধতিয়া দেখে।
কলস্বরে পক্ষ ডালে কাল পেঁচা ডাকে ।।
খাতা খাতা শৃগাল দক্ষিণে যায় মড়া।
কাল ডাকে মাথায় শঙ্কাল মানে বেড়া।।''[১৫]

বা-

''শিঙ্গাদার সঘনে শিঙ্গায় দেই ফুক।
বজ্রপানি যেমন বরিষে হুতভুক।
যাত্রাকালে অমঙ্গল জয় পত্রি ডাকে ।
কান্দে কত শৃগাল কুকুর উর্ধ্বমুখে।
পথে দেখ্যা বিরোধ বিকল হল্য বীর।
কান্দিতে কান্দিতে গেল কালী মন্দির।''[১৬]

এখানে বলা বাহুল্য যে উপরে উল্লেখিত প্রতিটি দৃশ্যই অমঙ্গল সূচক। কাল পেঁচা ডাকলে অর্থহানির লক্ষণ আর এক সাথে শৃগাল কুকুরের কান্না নিতান্তই অমঙ্গল জনিত। তাই এই দৃশ্য গুলো দেখে লাউসেনের মন খারাপ হয়ে গেলে আমাদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়না যে তার মনের প্রতিটি পরতে পরতে লোকায়ত বিশ্বাস, সংস্কার জড়িয়ে আছে। আর এর ফলেই জামতি নগরের দুষ্টা নারী নয়ানীর সৌন্দর্য্য ফাঁদে লাউসেন আবদ্ধ হয়নি, এমন কী গোলাহাট রাজ্যের সুন্দরী গণিকা সুরিক্ষাও লাউসেনকে নিজের ভোগ লালসার কারাপাশে বন্দী করতে পারেনি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাউসেনই যেন কাহিনিকে টেনে নিয়ে গেছে। তার বীরত্ব দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা বোধ সমস্ত কিছু মিলিয়ে তাকে যেন রূপকথার নায়কের মতই মনে হয়। আবার যেন রূপকথার নায়কের আড়ালে তার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যবোধও পাঠকের সামনে উম্মোচিত হয়,আর সে হয়ে ওঠে সার্থক লৌকিক চরিত্র।

রঞ্জাবতী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান নারী চরিত্র রঞ্জাবতী। তিনি স্বর্গের শাপভ্রষ্ট অপ্সরা অম্বাবতী। গৌড়রাজের শ্যালিকা ও কর্ণসেনের পত্নী। শালেভর পালায় দেবতার অনুগ্রহ ছেড়ে দিলে তাঁর চরিত্রে কোন অলৌকিক ও অপ্রাকৃত কাহিনির আরোপ নাই। তিনি একাধারে স্নেহশীলা মাতা ও পতি পরায়না নারী। বিয়ের পর স্বামীর ঘরের এসে পরিবার পরিজনের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হলে তিনি স্বামীকে জোর করে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানে ভাই মহামদ তাঁকে অপমান করলে, স্বামীর জন্য তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ভাইকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন ঃ

"আজ হতে ওপথে আপনি দিনু কাঁটা।"[১৭]

আবার পুত্র লাউসেন ও কর্পূর সেন গৌড় যাত্রার আকাঙ্খা প্রকাশ করলে তিনি বিচ্ছেদ বেদনায় অধীর হয়ে উঠেন। পুত্র লাউসেন যুদ্ধে যাবার আগে তাঁকে অনেক প্রবোধ দিল, বলল মায়ের আর্শীবাদে সে জয়লাভ করবেই। তখন রঞ্জাবতী লাউসেনকে যে কথা গুলো বলেছেন তা একমাত্র পুত্রের বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর এক আদর্শ মা ই বলতে পারে। পুত্র যুদ্ধে চলে যাবে তাই পুত্র বিরহে কাতর মা পুত্রকে একটি অনুরোধ করেছেন ঃ

"কালি অতি শুভদিন গৌড়ে তুমি যাবে।
অভাগীর বন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে।।"[১৮]

যার পুত্র পরদিন যুদ্ধে যাবে সে তো অভাগী বটেই। কবি মাতৃহৃদযের এই অপরিসীম যন্ত্রনাকে একটি ছোট্ট বিশেষণে প্রকাশ করে তার অন্তরদ্বার খুলে দিয়েছেন।

"কালিনী মাযের প্রাণে যত ছিল মনে।
রন্ধন করিল রাণী পুত্র যাবে রণে।।"[১৯]

'কালিনী' এই ছোট্ট শব্দের মধ্য দিয়া কবি মাতৃ হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অপরিসীম বেদনাকে বাস্তব রূপ দান করেছেন। শুধু তাই নয় রাস্তায় যেতে যেতে তাদের উপর যাতে কোন ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনীর কোন প্রভাব না পড়ে সেই জন্য নানা মন্ত্র পাঠও করেছেন তিনি।

"ডাকিনী যোগিনী পাছে পথে দেয় পীড়া।
মস্তকের কেশ বাঁধে দিল মন্ত্র পড্যা।।
লাউসেন কর্পূর বিদায় হয সুখে।
গগন মার্গে গমন করিল গৌড়মুখে।।"[২০]

এই চিরন্তনী জননী মূর্তি রঞ্জাবতী চরিত্রের অন্যতম দিক। তার মনোভূমিও লোকায়ত বিশ্বাসেই গঠিত। মন্ত্র পড়া, ভূত প্রেতে বিশ্বাস এসবের মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হয় যে রঞ্জাবতী একটি স্বার্থক লৌকিক চরিত্র।

গৌড়েশ্বর ঃ গৌড়েশ্বর ধর্মমঙ্গল কাব্যের অপ্রধান চরিত্র। লাউসেন ও মহামদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা ও লাউসেনের চরিত্র বিকাশে পটভূমিকা হিসাবে কাজ করেছে চরিত্রটি। রঞ্জাবতীর সাথে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিয়ে দিয়ে তিনি স্বয়ং এই দ্বন্দ্বের বীজ বপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে দুটি সত্ত্বা সর্বদা কাজ করেছে। একদিকে লাউসেনের প্রতি তিনি দুর্বল ও স্নেহশীল আবার অন্যদিকে মন্ত্রী মহামদের কথাও তাকে শুনতে হয়। লাউসেন যখন অশেষ বিক্রম সহকারে রাজার পাটহস্তী বধ করলেন। তখন লাউসেনের বীরত্বে খুশী হয়ে তিনি তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আবার মহামদের অত্যাচারে গৌড়ে দুর্দশা দেখা দিলে তিনি মহামদকে কারারুদ্ধও করেছেন। পরে অবশ্য মহামদের কথার যাদুতে ভূলে গিয়ে তিনি পুনরায় তাকে বিশ্বাস করেছেন।

গৌড় রাজের চরিত্রের একটি দুর্বলতাও ছিল। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"অন্য যে পাত্তর হত পেত খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।।"[২১]

কিন্তু এই দুর্বলতা সত্ত্বেও গৌড়রাজ একেবারে ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন না। কবিগন তাঁর মনোভূমি গঠিত করেছেন লোকায়ত বিশ্বাস সংস্কারের সমন্বয়ে। 'কানাড়ার সয়ম্বর পালা'য় মহারাজ যখন সয়ম্বর সভায় যাত্রা করেছেন তখন কিছু দৃশ্য দেখেছেন যা কুলক্ষণের প্রতীক বলেই লোক সমাজের বিশ্বাস।

> ''অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্ম চিল।
> শকুনি গৃধিনী আগে করিছে কিল্ কিল্।।
> কিচিকিচি কাল পেঁচা ডাকে কাছে কাছে।
> কোনেতে কচ্ছপ দেখে কপিগন গাছে।।
> বামে কাল ভুজঙ্গ দক্ষিণে দেখে শিবা।
> কেহ বলে নাজানি কপালে আছে কিবা ।।''[২২]

এবং এই অমঙ্গল চিহ্নের প্রভাবও পড়ে ছিল রাজার জীবনে। সয়ম্বর সভায় রাজা লোহার গণ্ডারের মস্তক খণ্ডনে ব্যর্থ হন, কিন্তু তারই অনুগত লাউসেন তা অনায়াসে করে দেখাল।

কালুডোম ঃ কালুডোম ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি উজ্জ্বল চরিত্র। হস্তী বধ করে গৌড় থেকে ফেরার পথে তার সাথে লাউসেনের দেখা। কালু বস্তুতই 'লোক' । তার চেহারার যে বর্ণনা আমরা কাব্যে পাই -

> ''যমের কিঙ্কর যেন ডোমের নন্দন।
> কাল মোটা লোম গোঁফ ঘোর দরশন।।''[২৩]

শুধু তাই নয় রাজার আদেশে লাউসেনের সাথে যাবার সময় যে সকল বস্তু সে সঙ্গে নিয়েছিলো তা নিজ জাতি কর্মের অনুরূপ।

> ''কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
> ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেরা ছাতা ছাতি।।
> পাত বেত বোমা বান্ধি হাঁকাইল বরা।
> কুক্কুট পায়রা হাসে সাজিল বাজরা।।''[২৪]

লাউসেনের সাথে নিজ দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় তাদের যাত্রার যে বিবরণ ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় তা হলো ঃ

> ''সাকা মুখা দু বীর ঘোড়ার আগে ধায়।
> তের ডোম তারা সব আগে পাশে ধায়।।
> পড়িয়া রহিল কুড়্যা পত্রের ছাউনি।
> পশ্চাৎ চলিল লখ্যা যাতে ডুমনি।।
> ধাইল ডোমের শিশু হইয়া মিশাল।
> তাড়িয়া চলিল কালু শুকরের পাল।।''[২৫]

এর মধ্য দিয়ে কালুডোমের নিজ জাতি, বৃত্তি ও দেশের প্রতি গভীর মমত্ব বোধেরই সুর ধ্বনিত।

কালু বীর। তার প্রবল বীরত্বের মধ্যেও একটি চারিত্রিক দুর্বলতা আছে । তা হলো তার অতিরিক্ত পানের আসক্তি। কানড়ার বিবাহ পালায় ঃ

"ঘটি ঘটি ঘোঁটা সিদ্ধি গিযে পোস্ত মদ।
ভাজা ভুজা পেয়ে বলে পেনু ইন্দ্র পদ।।"[২৬]

কিন্তু তাসত্ত্বেও সমকালীন নৈতিক মূল্যবোধ তার চরিত্রের মধ্য দিযা প্রস্ফুটিত হয়েছে স্পষ্ট ভাবে। আর এজন্যই বিশ্বাস ঘাতক কাম্বার কথায় বিশ্বাস করে সে প্রতারিত হয়েছে। কাম্বা ডোম সম্পর্কে কালুর ভাই। সে চক্রান্ত করে একদিন কালুকে বলেছে যে সে যা চাইবে কালুকি তা দেবে? সহজ সরল কালু ভেবেছে ভাই আর কি চাইতে পারে, তাই সে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হযে গেছে। কাম্বা এবার কালুর কাছে তার মাথা চেয়ে বসল কাম্বা ভালোভাবেই জানতো যে কালু কথার খেলাপ করেনা। সেজন্য সে কপটতার আশ্রয় নিয়েছে, কাম্বার প্রার্থনায প্রথমে কালু বিচলিত হলেও তার বিবেক সচেতন ছিল। সত্য রক্ষা না করলে তার ফল যদি লাউসেনকে আঘাত করে তাহলে কালুর কাছে তা অসহনীয় হয়ে যাবে। তাই সে কাম্বাকে বলেছে ঃ

"কিকরিব কোথা হতে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে যেন মহারাজে।।
এ পাপে নাহয পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয।।
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন।।"[২৭]

কালুডোম সম্পর্কে সমালোচকও তাই যথার্থই বলেছেন যে ঃ

> "কালুডোমের চরিত্রে বীরত্ব ও প্রভুভক্তি ছাড়াও একটি অসাধারণ মর্যাদা সম্পন্ন বিশেষত্ব প্রকাশ পেযেছে, যা শেষ পর্যন্ত তার অপমৃত্যুর কারণ হযেছিল। কালু প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করার জন্য প্রাণ ত্যাগ করতেও পারে।"[২৮]

এই সমস্ত গুণাবলীর জন্যই কালু আদর্শ লৌকিক চরিত্রের পর্য্যায়ে উন্নীত।

লখা ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের লখা চরিত্র কবির এক মহৎ সৃষ্টি। এই বীরাঙ্গনার মধ্যে নিষ্ঠা, স্নেহশীলতা, কর্তব্যবোধ সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও তারসাথে অসাধারণ ধৈর্য ও বিবেচনা বোধ এই সবকিছুর সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় মহিমান্বিত চরিত্র রূপে লখা স্মরণীয়। কালু তার স্ত্রী লাখার পরিচয় দিতে গিয়ে লাউসেনকে বলেছে ঃ

"গৃহিনী সনকা লখে সমরসিংহিনী।"[২৯]

ড. উমাসেন তাই যথার্থই বলেছেন ঃ

"বীরত্ব, নিষ্ঠা, স্নেহ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্তব্য বোধে লখা অদ্বিতীয়া।"[৩০]

লখা কিন্তু নিজেকে বীরাঙ্গনা কখনো বলেনি। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলেছে ঃ

"বীরের বণিতা আমি লখে মোর নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।"[৩১]

এর থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে স্বামীর প্রতি সে কতটুকু শ্রদ্ধাশীল। তাছাড়া রাজার আদেশে লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় করতে চলে গেলে ময়নার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন কালুকে। ঠিক এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে মহামদ ময়নায় এসে লখাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে, কালুকে রাজা আর তাকে রাণী করবে বলে । তখন লখাকে বলতে শুনা যায়-

''ডোম হল আপন ভাগিনা হল পর।
এই বুদ্ধে এতকাল রাজার পাত্তর।।''[৩২]

তারপর তাদের বাক্য বিনিময় চরম পর্য্যায়ে পৌছে গেলে লখা মহামদকে বলেছে ঃ

''জাতি রাঢ় আমিরে করমে রাঢ়তুঁ।''[৩৩]

এই একটি কথার মাধ্যমে তার চরিত্র উদ্ঘাটিত। মহামদের সব চক্রান্তকেই লখা ব্যর্থ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় নিদ্রা মন্ত্রে যখন ময়না নগরের সবাই নিদ্রিত তখন সে কাউকে জাগাতে চেষ্টা না করে একাই রণসজ্জা করে যুদ্ধ করে ফিরে এসে কালুকে জাগাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কালু যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সে এক এক করে নিজ পুত্র সাকা ও শুকাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধে দুজনই নিহত হয়েছে। যুদ্ধে দুই পুত্রের মৃত্যু হলে পুত্র হারা মায়ের হৃদয় নিঙড়ানো হাহাকার সেদিন শুনেছে গোটা ময়নার মানুষ । তার মাতৃ হৃদয় উৎসারিত অশ্রু ধারায় প্লাবিত হয়েছে গোটা মানব কুল।

''নয়নে বিশ্রাম নীর নহে একতিল।
শোকের উপরি শোক বুকে বসে শিল।।''[৩৪]

তার সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন ঃ

''লক্ষী ডোমনী শুধু বীর নয়, মাতার স্নেহে,
পতি ভক্তিতে এবং পালক রাজাদের প্রতি
আনুগত্যে এক অসাধারণ রমনী।''[৩৫]

তাই বাংলা সাহিত্যে লখাই চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্টে স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল।

মহামদ ঃ মহামদ ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। লাউসেন যদি ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক হয়, তা হলে মহামদ এই কাব্যের খলনায়ক। এই চরিত্র চিত্রনে কবিরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে হলেও কাব্যে দুজনেই দুজনের শত্রু। মহামদের সাথে শত্রুতার জন্যই লাউসেন কাব্যে এত পরিস্ফুট। সে এক একটি চক্রান্ত করেছে লাউসেনের বিরুদ্ধে, আর ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় লাউসেন সেই চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাব্যে মহামদ লাউসেনের অনেক আগে থেকেই উপস্থিত এবং লাউসেনের স্বর্গারোহন পর্যন্ত তার কর্মস্রোত অব্যাহত রয়েছে। বলতে গেলে সে ই কাব্যের কেন্দ্র বিন্দু, তাকে কেন্দ্র করেই কাব্যের দ্বন্দ এবং ঘটনা সংঘাত অনিবার্য বেগে পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে।

মহামদের লাউসেনের বিরুদ্ধে ক্রোধ মোটেই যুক্তিহীন নয়। গৌড়রাজের নিঃস্ব সামন্ত কর্ণসেনের সঙ্গে মহামদের প্রাণাধিক বোন রঞ্জাবতীর বিয়েকে কেন্দ্র করেই কর্ণসেন-

রঞ্জাবতী ও মহামদের বিরোধের পটভূমি তৈরী হয়েছে। পরবর্ত্তি সময়ে রঞ্জাবতীর পুত্র জন্ম নিলে জন্ম লগ্ন থেকেই তাকে বিনষ্ট করার জন্য সদা প্রস্তুত থেকেছে মহামদ। শিশু লাউসেনকে চুরি করার জন্য ইন্দ্রজাল কোটালকে নিয়োগ করেছে। ইন্দ্রজাল কোটাল সেখানে গিয়ে যাদু মন্ত্র দিয়ে গোটা ময়নানগরকে ঘুম পাড়িয়ে লাউসেন কে চুরি করার জন্য মতলব এঁটেছে। এই মতলব মহামদেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। বলাবাহুল্য ইঁদুরের মাটি মন্ত্রপূত করে ঘুম পাড়ানোর পদ্ধতি লোকবিশ্বাস থেকেই জাত। যাই হোক ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন রক্ষা পেল। এতে মহামদের ক্রোধ আরও বেড়ে গেছে। এরপর ক্রমান্বয়ে সে ছক কষেছে লাউসেনকে হত্যা করার জন্যে। শারঙ্গ ধবলকে অর্থ দেওয়া থেকে শুরু করে, রাজার পাটহস্তী বধ, ইছাই ঘোষের সাথে যুদ্ধ, সমস্ত চক্রান্ত থেকেই বীরের মত লাউসেন বেরিয়ে গেছে।

মহামদ কত বড় শযতান তা তার একটি ঘটনা পর্য্যালোচনা করলেই বুঝা যাবে। 'হস্তী বধপালায' লাউসেন কর্পূর সেনকে চুরির অপবাদে বন্দী করার অভিপ্রাযে তারা যে গাছের নীচে শুযেছিল সেখানে পাটহস্তী বেঁধে রেখে রাজাকে গিযে বলেছে ঃ

''সমুখে বসিল মহাপাত্র মহাশয।
অনুবন্ধ বচন বাজাকে কিছু কয।।
আমাব বচন রাজা শুন মন দিযা।
বলিব বৃত্তান্ত সব বিরলে বসিয়া।।
আজ হতে নাই তোমার বাজদণ্ড ছাতি।
চোবে নিল তোমার মানিক পাটহাথি ।।
পাটহস্তী পাটবানী একুই সমান ।
হেনহস্তী চুরি গেল নাহিক কল্যাণ।।''[৩৬]

কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই লাউসেন নিজের বুদ্ধি, শক্তি ও বীর্যবত্তা দিয়ে বিজয়ী হয়েছে। কাব্যের প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত মহামদ নিষ্ঠুর, খল-প্রতারক হিসেবে চিত্রিত। যদিও তার এই সকল নিষ্ঠুর চক্রান্তের মূলে আছে ছোট বোনের প্রতি অপত্য স্নেহ । কিন্তু তবু সে যে ধরণের নিষ্ঠুর কাজ করেছে, তাতে পাঠকের এতটুকু সহানুভূতি তার প্রত্যাশার বাইরে।

এছাড়াও অনেক অপ্রধান চরিত্র রয়েছে-ধর্মমঙ্গল কাব্যে যাদের চরিত্র চিত্রণে অনেক লোক উপাদানের সন্নিবেশ ঘটেছে। 'অনুমৃতা পালা'য় লাউসেনের কাটা মায়ামুণ্ড দেখে রাণীরা আমের ডাল ভেঙ্গেছে। এটাও প্রচলিতলোক বিশ্বাস। আমের ডাল ভাঙার মধ্য দিয়ে সতী-সাধ্বি স্ত্রীরা বুঝিয়ে দেয় যে তারা সহমরণে যেতে প্রস্তুত।

''এত বলি মুণ্ড দিল কলিঙ্গার আগে।
রাজার বচন শুনি মনে ভয় লাগে ।।
আম ডাল ভাঙ্গিল রাউত চারি জন।''[৩৭]

'জাগরণ পালা'য় দেখি যে ঃ

"কানাড়া শুনিতে পায় ঘোড়ার হেঁসর।
বলিবারে লাগিল ধুমসি বরাবর।।
ঘোড়ায় হেঁসনি কেন শুনিল অপায়।
কপালে ঘটিল কিবা বলা নাঞি যায়।।"[৩৮]

তাছাড়া 'গোলাহাট পালা'য় সুরিক্ষার রন্ধন প্রণালীও লোকভাবনা জাত ঃ

"ভেরেণ্ডার ঢেঁকিতে ভাঙ্গিল উড়ি ধান।
ভগবতী আপনি সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান।।
চালনি করিয়া জল আনিল ভবানী।
কর্পূর লাউসেন দেখ্যা মনে চিন্তাগুণি।।
কর্পূরের কাছে বস্যা করিতে রন্ধন।
লাউসেন মনে করে দেব নিরঞ্জন।।
উড়িধানে আতব তণ্ডুল সমাধিল।
আঙ হাড়ি সরা লয্যা রন্ধনে বসিল।।"[৩৯]

এমনি ভাবে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই লোক উপাদানের উপস্থিতি কোন না কোন ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তার অবশ্য একটা সঙ্গত কারণও আছে, কারণটি হলো মঙ্গল কাব্যের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই লৌকিক উপাদানের ভিত্তি ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিবায়ন

শিবায়ন ও লোককথা

'শিবায়ন' মঙ্গলকাব্য ধারায় অনেক পরবর্তি সময়ের সংযোজন। কাব্যটি 'শিবমঙ্গল' নামেও খ্যাত। রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'শিবায়ন' এর শ্রেষ্ঠ কবি। তাছাড়া রামকৃষ্ণরায়, শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজকালিদাস, মৃগলুব্ধ প্রভৃতি কবিরাও 'শিবায়ন' রচনায় যথেষ্ঠ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পৌরাণিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে রচিত কাব্যটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গণেশ বন্দনা থেকে শুরু করে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মধ্য দিয়ে দক্ষরাজের যজ্ঞের আয়োজন, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, মদনভস্ম প্রভৃতি অধ্যায়ে কবিরা পুরাণ কাহিনির বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শিবদুর্গার গৃহস্থালি বর্ণনায় কবিরা আপাদমস্তক লৌকিক। কাহিনিটি অনেকটা এরকম ঃ

দেবতারা একদিন এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। হঠাৎ প্রজাপতি দক্ষ দেবসভা পরিদর্শনে সেখানে উপস্থিত হলে শিব ছাড়া অন্যান্য দেবতারা দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন । শিব অবশ্য এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন নারায়ণ ছাড়া অন্য কাউকে সম্মান দেখালে সে স্বল্পায়ু হয়। দক্ষ কিছুতেই তা মেনে নিতে পারলেন না। জামাতা শিবের প্রতি অনেকটা রুষ্ট হয়েই তিনি বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী ফিরে খুব তাড়াতাড়ি তিনি এক যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং তাতে শিব ছাড়া সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন। নারদমুনি যথাসময়েই শিব-শিবাণীকে যজ্ঞের খবর দিয়ে গেলেন। যজ্ঞের খবর শুনে শিব মর্মাহত হলেন। পিতা আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা শুনে বিনা নিমন্ত্রণেই সতী যজ্ঞ দর্শন করতে প্রস্তুত হলেন। বাপের বাড়ী যাবার জন্য সতী শিবের অনুমতি প্রার্থনা করলে বিবাদ আশঙ্কায় শিব সতীকে বাপের বাড়ী যাবার অনুমতি দিলেন না। কিন্তু সতী বিনা অনুমতিতেই বাপের বাড়ী চলে গেলেন কারণ পিতা দক্ষরাজের কাছে তার জিজ্ঞাস্য যে যজ্ঞানুষ্ঠানে শিব আমন্ত্রিত নন্ কেন। যজ্ঞশালায় সতীকে দেখেই দক্ষরাজ শিবনিন্দা শুরু করেন। পতিপরায়না সতী স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে যোগ বলে দেহত্যাগ করেন।

এদিকে কৈলাসে অবস্থানরত শিব নন্দীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। শিবের অনুচরগণ ও শিবজটা থেকে সৃষ্ট বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করার সাথে সাথে দক্ষরাজের মুণ্ড ছেদনও করেন। পরে সমবেত দেবগণের স্তুতিতে শিব ছাগমুণ্ড কেটে দক্ষরাজের কবন্ধে যোজনা করতে দেবতাদেরকে উপদেশ দিলেন। আর তারপর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শিব প্রলয়ংকারী নৃত্য করতে করতে ভারতভ্রমণে

বেড়িয়ে পড়েন । অবশেষে দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করলে শিবশ্মশানে হাড়মালা পরে সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম মেখে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। আর সতী গিরিরাজ হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে উমা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মের সংস্কার বশত এই জন্মেও উমা শিবকেই প্রাণেশ্বর জ্ঞানে পূজা করতে শুরু করেন। গিরিরাজ উমার আন্তরিক অভিলাষ জেনে শিবের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর উমা শিবের সাথে কৈলাসে নিজের সংসারে চলে যান। এতটুক পর্যন্ত কাহিনি রচনায় কবিরা পুরাণের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তারপর উমা ও শিবের গৃহস্থালি বর্ণনায় কবিরা পুরোপুরি লৌকিক। সেখানে শিবের দারিদ্রে ভরা সংসারের চিত্র অংকন করা হয়েছে। ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে তণ্ডুল সংগ্রহ করে আনেন শিব, আর ধৈর্যশীলা উমা খুব যত্নের সাথে অন্ন ও নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না করে স্বামী ও পুত্র গণকে পরিতোষের সাথে ভোজন করান। কিন্তু ভিক্ষুকের ঘরে এভাবে দিন চলেনা। ধীরে ধীরে ভিক্ষালব্ধ সমস্ত সম্বল শেষ হয়ে আসছিল, তাই উমা শিবকে চাষ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু অলস শিব তাতে বিন্দু মাত্র উৎসাহ দেখালেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল ব্যবসা করার। পুঁজির অভাবে তা হয়ে উঠেনি, তাই অবশেষে চাষাবাদ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন শিব। মাঘ মাসের শেষের দিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। কুবেরের নিকট থেকে বীজ সংগ্রহ করে ভাগ্নে ভীমকে সঙ্গে নিয়ে শিব চাষাবাদ শুরু করলেন। যথা সময়ে প্রচুর ফসল ফলল। শিব-গৌরীর পরিবারের অভার দূর হলো। কিন্তু মর্ত্যলোকে গিয়ে শিব চাষাবাদে এমন মত্ত হয়ে পড়লেন যে কৈলাসের কথা তিনি প্রায় ভুলেই গেলেন। সেখানে শিবের কিছু কুচনী সঙ্গিনীও জুটেছে। গৌরী শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অগত্যা একদিন গৌরী শিবকে ছলনা করার জন্য বাগ্‌দিনী রূপে দেখাদিলেন। বাগ্‌দিনীর রূপে শিব অতিশয় কামার্ত হয়ে পড়েন, এবং তার পিছু পিছু ধাবিত হন। প্রথমত বাগ্‌দিনী তাকে নিরস্ত করেন। তাতে শিব ক্ষ্যান্ত না হয়ে ধানক্ষেতের জল সেঁচে বাগ্দিনীর মাছ ধরার পথ সুগম করে দেন। বাগ্দিনীকে আরো বেশী খুশী করার জন্য শিব তাকে আংটিও উপহার দেন। অবশেষে শিবকে আলিঙ্গন দেওয়ার সময় এলে ছদ্মবেশিনী গৌরী শিবের সাথে বচন বিদগ্ধতায় জড়িয়ে পড়েন। পরে গায়ের কাদা পরিষ্কার করার অযুহাতে কৈলাসে চলে যান।

দীর্ঘ সময় চলে যাবার পরও যখন বাগ্‌দিনী ফিরে এলনা তখন শিব বুঝতে পারলেন যে তিনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন । তাই পার্বতীর জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কৈলাস যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে নতুন এক বিপদের সম্মুখীন হলেন শিব। বাগ্‌দিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে আংটি উপহার দেবার জন্য গৌরী শিবকে ঘরে প্রবেশ করতে বারণ করেন। তখন নারদমুনি সেখানে উপস্থিত হলে পার্বতী নারদমুনিকে শিবের সমস্ত কীর্তিকাহিনি জানালেন। অবশেষে নারদমুনির পরামর্শে পার্বতী শিবের কাছে একজোড়া শঙ্খ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু শিব পার্বতীর সেই ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে পারলেন না। তাই পার্বতী অভিমান করে বাপের বাড়ী চলে গেলেন। এবারও নারদেরই পরামর্শে শিব শাঁখারির ছদ্ম বেশে গিরিরাজ পুরে উপস্থিত হয়ে নিজ হাতে গৌরীকে শাঁখা পরালেন। পরে উভয়ের মিলন হয় এবং তারা কৈলাসে চলে আসেন।

শিব-গৌরীর এই যে কাহিনি কবিরা তাদের কাব্যে তুলে ধরেছেন তার ভিত্তিভূমি হলো বিভিন্ন লৌকিক ছড়া, গান ও শিব বিষয়ক নানা গালগল্প যা মৌখিক ভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। শ্রী বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের গান' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এরকম শিব বিষয়ক ছড়া পাওয়া যায়-

''চণ্ডী বলে শুন গোঁসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
তোমার সঙ্গে আত্ত করিলে লাগিবে ঝগড়া।।
চারছেইলার মাও হৈলাম তোর দ্যাবের ঘরে।
দয়া করি চাবখান শাঁখা না পিন্ধাইস্ মোরে।।
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে অন্ন আন্ধি দ্যাও তারে।
আমার হাত মুড়া গোঁসাই তা নজ্জানাগেতোরে।।
শিব বলে শুন চণ্ডী দক্ষ রাজার বেটি।
শাঁখা দিবাব না পাইম আমি জাক বাপের বাড়ী।।''[১]

এখানে গৌরীর শঙ্খ পরার বাসনা ও শিব কর্তৃক তা পূর্ণ করার অক্ষমতাই প্রকাশ পেয়েছে। রামাই পণ্ডিতের 'শূণ্যপুরাণ' এ শিবের চাষ-আবাদের বিষয়টি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভিক্ষা লব্ধ তণ্ডুলে সংসার চালানো খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। তাই গৌরী শিবকে চাষাবাদ করতে অনুরোধ করেন -

''আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস।।
পুখরি কাঁদাএ লইব ভুম খানি।
আরসা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি।।
আর সব কিসান কাঁদিব সাথে হাতি দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ।।
ঘরে অন্ন থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব।
কার্পাস চসহ প্রভু পরিব কাপড়।
কতনা পরিব গোসাঞি কেওদা বাঘর ছড়।।
তিল সরিষা চাষ কর গোসাঞি বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোসাঞি বিভূতি গুলা গাএ।।
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোসাঞি পঞ্চমর্তর আস।।
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধম্ম পূজার বেলা।।''[২]

এছাড়া 'গোরক্ষ বিজয়' কাব্যে একটি প্রাচীন শিবের গানের কতকগুলি পদ পাওয়া গেছে, তাতে শিবের কুচনী পাড়াতে যাতায়াতের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

''ভাঙ খাইবে ধুতুবা খাইবে খাইবে শতাববি।
দিবাবাত্রি থাকবে ভুইন কুচনীবাব বাডী।।
ষোলশ কুচনীব মধ্যে একলা ভুলা নাথ।
আপেক্ষা না মিটবে তব কামিনীব সাত।।

বলদেব কান্ধে উঠবে পিলবে বাঘেব ছাল।
কুচনীব পাডাতে থাক্যা কাটাইও কাল।।''[৩]

উপবে উল্লিখিত বিভিন্ন ছডাব মধ্যে যে খণ্ডখণ্ড চিত্র পাওযা যায, 'শিবাযন' কাব্যে এগুলিব উল্লেখ বযেছে।

তাছাডা 'শিবাযন' কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাব মধ্য দিযাও প্রমাণিত হয যে কাব্য বচনায কবিবা লোকসাহিত্যেব কাছে কতটুকু ঋণী।'শিবাযন' কাব্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বেব বর্ণনা আছে তা পৃথিবীব বিভিন্ন প্রান্তেব মানুষেব মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টি বিষযক নানান অভিপ্রাযেব মতই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাব লোকসমাজ আদিমকাল থেকে যে পুবাকাহিনিব ঐতিহ্যকে বহন কবে চলেছে, মঙ্গলকাব্য গুলোতে সেই লোকাযত ধাবা ও অভিপ্রায গুলোকে খুঁজে পাওযা যায। সৃষ্টিতত্ত্বেব বর্ণনা এগুলোব মধ্যে একটি। 'শিবাযন' কাব্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বেব বর্ণনা আছে তা এইবকম ঃ

''সৃষ্টিব প্রথম কালে মহাবিষ্ণু মহাজলে
ভাসিযা কৌতুক হইল মনে।
সুশিক্ষাব অভিলাষে সৃজন পালন আশে
তিন মূর্ত্তি হইলা আপনে।।
বজোগুনে সৃষ্টি কর্ম্মা দক্ষিণাঙ্গে হইল ব্রহ্মা
বামাঙ্গে বাহিব হইলা হবি।
যত গুণে হৈল তবে সকল পালক ভাবে
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধাবী।
মহাকদ্র মধ্যভাগে সংহাবেব ভাব লাগে
তমোগুনে মহাতেজ মনয।
পুরুষেব জন্ম জান্যা আদ্যাশক্তি সুখমান্যা
তেনহি হইলেন মূর্ত্তিত্রয।।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী শিবা তিনে তিন পাল্য শেভা
এক ব্রাহ্মা কার্য্য হেতু তিন।
ইহাতে যে ভেদ কবে ভাল নাঞি বাসি তাবে
বৃথামবে সে জ্ঞানহীন।
যে কিছু সকল ভগবান
তিন কার্য্য তিন জনে বাখিযা কৌতুকমনে
সেহিখানে হৈলা অন্তর্দ্ধান।

প্রভু আজ্ঞা পায্যা বিধি সৃজিল পৃথিবী আদি
মহাযোগে মহাপঞ্চভূত।
দ্বিজ রামেশ্বর কন সৃষ্টি করে ত্রিভুজন
শৌনকাদি শুনে কৈলে সূত।।''[৪]

এই ভাবনা সার্বজনীন লোক অভিপ্রায় থেকে সৃষ্ট।

দেবতাদের রূপ বদল একটি বিশিষ্ট লোক অভিপ্রায়। লোক সাহিত্যে যাকে transformation motif বলে। 'শিবায়ন' কাব্যেও এই রকম রূপবদলের উদাহরণ আছে। শিবকে ছলনা করার জন্য গোরীর বাগ্‌দিনী রূপ ধারণ ও গৌরীকে ছলনা করার জন্য শিবের শাঁখারির রূপ ধারণ ও শিবের মদনমোহনরূপ ধারণের মধ্য দিয়া লোক সাহিত্যে বর্ণিত transformation motif এর কথাই মনে পড়ে।

দেবতাদের অলৌকিক মহিমার বর্ণনাও লোক সাহিত্যেরই একটি অভিপ্রায। 'শিবাযন' কাব্যে 'দক্ষের ছাগমুণ্ডধারণ' অংশে বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষরাজের মুণ্ডছেদন হলে দেবতাদের অনুরোধে শিবের নির্দেশে দক্ষরাজের মাথায ছাগমুণ্ড স্থাপনের মধ্য দিযা লোক সাহিত্যে বর্ণিত দেবতার অলৌকিক মহিমার কথা মনে করিয়ে দেয়। জি এইচ ডামণ্ট এর 'বেঙ্গলি ফোক্‌লোর ফ্রম দিনাজপুর' গ্রন্থে বর্ণিত একটি লোক কথায় পাই যে এক পরিবারের সাত ভাই তারা মাঠে কাজ করত। একদিন তেষ্টার জল আনতে গিয়ে বড় ছয় ভাই আর ফিরল না। তাদের খোঁজ করতে গিয়ে ছোট ভাই সেখানে গিয়ে দেখলো যে সেখানে রয়েছে একটা ছাগল। ছাগলটা আসলে একটা মায়াবী রাক্ষসী। তাকে দেখা মাত্রই ছাগল সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে তার পিছু পিছু আসতে লাগল। সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন সে দেশের রাজা। তিনি মেয়েটির রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পরই তার প্ররোচনায় রাজা প্রথম রাণীর চোখ দুটো তুলে তাকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। বনে রাণীর এক ছেলে হলো। ধীরে ধীরে ছেলে বড় হল। বড় হয়ে মায়ের মুখ থেকে তার বাবার সমস্ত কথা শুনে সে পরিচয় গোপন করে রাজার কাছে এল। রাক্ষসী মা কিন্তু তাকে দেখেই চিনতে পারল। তাই ছলনা করে সে তাকে বারবার দূরে পাঠায় দুর্লভ বস্তু আনার জন্য। অবশেষে একদিন তাকে সে রাক্ষসদের দেশে পাঠাল। ভাবল রাজপুত্র সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারবেনা। এদিকে রাজপুত্র নিজের বুদ্ধি বলে তার রাক্ষসী মায়ের প্রাণপাখী নিয়ে এসে তাকে মেরে ফেলল। আর লেবুর মধ্যে লুকিয়ে রাখা তার মায়ের চোখ ফিরিয়ে এনে তাঁকে ভাল করল।

এই গল্প থেকে লোকসাহিত্যের দুটা motif কে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত - রূপবদল ও দ্বিতীয়ত-অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনা। রাক্ষসীর ছাগল থেকে মানুষর হওয়ার মধ্য দিয়ে রূপবদল বা transformation motif এবং লেবুর মধ্যে সংরক্ষিত চোখ পুর্নস্থাপন করার মধ্য দিয়ে অলৌকিকতার প্রকাশই লক্ষ্যণীয়। মঙ্গলকাব্য রচনা করার অনেক আগে থেকেই এগুলো সমাজে প্রচলিত ছিল । সুতরাং একথা বলা যায় যে এই ধারণা মঙ্গল কবিরা লোক সাহিত্য থেকেই নিয়েছেন বলে মনে হয়।

এছাড়া 'শিবায়ন' কাব্যে বর্ণিত লোক প্রযুক্তি ও লোকভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়েও বুঝা যায় যে মঙ্গল কবিরা হযত লোকসাহিত্য থেকে এগুলো ঋণ নিয়েছেন।

লোক প্রযুক্তি ঃ জোয়ালী, কোদাল, পাশী, ঢেঁকি, উঙানি, হাল চাষাবাদের এই যন্ত্রগুলি লোকসংস্কৃতির পরম্পরাগত ঐতিহ্য। 'শিবায়ন কাব্যে' শিবের চাষাবাদ অংশে এই যন্ত্রগুলির উল্লেখ রয়েছে।

হালঃ হাল জমি কর্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমাজে পশুচালিত হালের প্রচলন ছিল। বিশেষ করে বলদে টানা হালই বেশি ব্যবহৃত হত। তবে মহিষে টানা হালের প্রচলনও ছিল। শিবায়ন কাব্যে শিবের চাষ উপলক্ষে হালের উল্লেখ করা হয়েছে।

'হৈল হাল প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।'[৫]

ঢেঁকি ঃ ঢেঁকি গ্রাম বাংলায় প্রচলিত মনুষ্য চালিত যন্ত্র। ধান ভানার কাজে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। ঢেঁকিতে ধান ভানার চিত্র অনেক লোকসঙ্গীতে পাওয়া যায়। শুধু সঙ্গীতে নয় প্রবাদেও তা প্রতিফলিত। একটি জনপ্রিয় বাংলা প্রবাদে বিষয়টি সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা হল 'ধান ভানতে শিবের গীত'। বাংলায় এমন এক সময় ছিল যখন অনেক মেয়েরা এক সাথে মিলেমিশে ঢেঁকিতে ধান ভানার কাজ করিত। এই যন্ত্রটি লোক জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। 'শিবায়ণ কাব্যে'ও এর উল্লেখ রয়েছে -

'নারদের ঢেঁকি অন্যা ধান্য ভানে ভূত।'[৬]

মই ঃ লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার পর খণ্ড খণ্ড মাটিকে ভেঙ্গে সমান করার জন্য মইয়ের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'শিবায়ণ কাব্যে' দেখা যায় যে-

''চৈত্র মাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।
মাঠ কর‍্যা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ
উচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিন দিগভ্রম।।''[৭]

এগুলো ছাড়া কোদাল, জোয়ালী, পাশী, উঙানি লোকসমাজে ব্যবহৃত এই যন্ত্র গুলিকে প্রাধান্য দিয়ে রামেশ্বর তাঁর কাব্যকে লোক জীবনের কাছে বাস্তব সম্মত করে তুলতে চেয়েছেন।

লোক ভাষা ঃ কাঁকাল্যে, কোঁত, পুছিল, থলি, শন, ধাক্কা, মার‍্যা, ডর, মেল্যা, মুড়া, ঝোঁট্যা, পাড়াগাঞে, চৌদিশে, খড়, কর‍্যা, মলি বাছা ইত্যাদি লোকমুখে প্রচলিত শব্দ গুলির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায় শিবায়ন কাব্যে। সংস্কৃত বিলাস বহুল শব্দের পাশাপাশি শব্দগুলি খুব বাস্তবতার সাথে ব্যবহার করেছেন রামেশ্বর তাঁর কাব্যে। ভাগ্নে নারদের কথা শুনে শিবের দিগম্বর হয়ে যাওয়া এবং তা দেখে শাশুড়ি মেনকার হতবাক হয়ে বিলাপ অংশে রামেশ্বর এই রকম লোক শব্দের ব্যবহার করেছেন -

'' ছি ছি ছি ছি কি বলিব তারে
খেপা বুড়া দিগম্বর *ধাক্কা মার‍্যা* বাহির কর
আইবড় ঝি থাকুক মোর ঘরে।।
বাপ মায়ের বয়স *পায়্যা* বিভা করিবেন লাজ *খায়্যা*
অস্যাছেন *ঘুট্যা* পাশ *মাখ্যা*।।'' [৮]

তাছাড়া -

''পা মেল্যা পর্ব্বত প্রিয়া কোলে কর‍্যা ঝি।
এমন বরে বিভা দিব এমন সাধ কি।।''[৯]

বা -

''আই আই কি লাজ লাজ হায় হায়।
বর্ব্বর বাঘার বুড়ায় বেটী দিতে চায়।।
আই বড় বেটী মোর বাচ্যা থাকুক ঘরে।
এমন বিহায় কাজ নাই আচাভুয়া বরে।।''[১০]

আবার -

''লেঙ্গটা হইয়া রয় শাশুড়ীর কাছে।
এমন পাগল কেবা ত্রিভুবনে আছে।।
আই মাগো জ্বলায়ে জামাই মারে ঠেলা।
গলায দড়ি দিযা মরুক শালার বেটা শালা।।''[১১]

চরিত্র চিত্রণে লোক উপাদান ঃ

'শিবায়ন' কাব্যে লৌকিক চরিত্র চিত্রণে কবিরা অনিন্দসুন্দর বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে লৌকিক শিব চরিত্র অঙ্কনে তাঁরা একেবারে বাস্তবধর্মী। শিব এই কাব্যের প্রধান চরিত্র। লোকায়ত বিশ্বাস সংস্কার কাব্যটিকে আপাদমস্তক জড়িয়ে রেখেছে। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হলে শিব শুভদিন দেখে 'হল প্রবাহ' শুরু করেন ঃ

''মনে জান্যা মাঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘ শেষে মেঘ বরষিলা।।
দিনসাত বরষিয়া দিলেন ঈশানে।
হৈল হাল প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে।।''[১২]

শুভক্ষণ দেখে 'হল প্রবাহ' শুরুর মধ্য দিয়ে শুভ ও অশুভ বিচারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যা লোক সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত। শুভক্ষণ দেখে 'শিবের হল প্রবাহে'র মধ্যে লোক সমাজের 'Tabu' সংক্রান্ত ধারণারই প্রচ্ছন্ন প্রকাশকে দেখেছেন কবি রামেশ্বর। তাই দিনক্ষণ না দেখে চাষাবাদ শুরু করলে কৃষক যে শেষ পর্যন্ত লক্ষী ছাড়া হয় তা তিনি আমাদের জানিয়েছেন ঃ

''হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্যা মো।
কালে কালে হৈল হাল কামাঞের ঘো।।
সেই সেই কালে যার হয় হল যোগ।
ধরাশস্য হবে ধান্যে হবে রোগ।।
বৃষ কাদে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষী ছাড়া।।''[১৩]

শুভদিন দেখে শিব 'হল প্রবাহ' যে ভাবে শুরু করেন ঠিক তেমনি ভাবে কৃষিকাজ সম্পাদনও করেন শুভদিন দেখেঃ

"ডাক সংক্রান্তি দিনে ক্ষেতে পুতে নল।
কার্ত্তিকের কত দিনে কট্যা দিল জল।।
ধরণী সুধন্যা হৈল ধান্য আল্য ফুল্যা।
ভোলানাথ রহিলেন ভবানীকে ভুল্যা।।"[১৪]

'ডাক সংক্রান্তি' হলো আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই উপলক্ষে 'ও হো' পর্ব পালন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কতকগুলি মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদন করা হয়। যেমন ঃ

(১) গায়ে নিমপাতা ও হলুদ মাখতে হয়।
(২) হাত, পা সহ গোটা শরীর আগুনের তাপে সেঁকে নিতে হয়।
(৩) স্নানের পর সূর্য প্রণাম করা হয়।
(৪) তালের শাস ও পিঠে খাওয়া হয়।

শিব কৃষির দেবতা। কৃষকের সমস্ত গুণ অভিজ্ঞতা সংস্কার তাঁর মধ্যে বর্তমান। 'শিবায়ন' কাব্যে তাই তার একটাই পরিচয় তিনি দরিদ্র কৃষক। কৃষক জীবন ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত অনেক তথ্য তাই শিব চরিত্রের সঙ্গে আবর্তিত। ভৃত্য ভীম লাঙ্গলদেয় আর শিব সবুজ ফসলের প্রত্যাশায় নিড়ান হাতে তুলে নেন। মশা, মাছি, ডাঁশের কামড়ও সহ্য করেন। আবার সুযোগ পেলেই কুচনী পাড়ার বৌদের সঙ্গে রঙ্গ তামাশায় মেতে উঠেন। এই সমস্ত কিছুই একজন সাধারণ কৃষকের বৈশিষ্ট হিসেবে পরিচিত। 'শিবায়নে'র কবিরা এই 'হতশ্রী কৃষক পরিবারের শ্রম ও নিষ্ঠার মধ্যে সঙ্গতি ও শ্রী ফিরে পাওয়ার বাস্তব কাহিনিটি শুনিয়েছেন।" তাই শিব সম্পর্কে করা শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্যটি যথার্থ বলেই মনে হয়ঃ

"মঙ্গল কাব্যের শিব বাংলাদেশের লোক কল্পনা থেকে উদ্ভূত দরিদ্র গৃহস্থ, ভিক্ষা জীবী নেশাখোর চরিত্রে শিথিল।"[১৫]

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই শিব যে গ্রাম বাংলার লোকসমাজেরই একজন দক্ষ কৃষক।

সপ্তম অধ্যায়

লৌকিক ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য

লৌকিক ধর্ম ও মঙ্গলকাব্য নিযে আলোচনার গভীরে যাওযাব আগে 'ধর্ম' নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। 'ধর্ম বলতে সাধারণত বোঝায় যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। জীবনকে যাহা ধারণ করিয়া আছে, কিংবা জীবন যাহা ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম।'[১] এখানে বলে রাখা প্রযোজন ধর্মের পাশ্চাত্য সংজ্ঞার সাথে ভারতীয় সংজ্ঞার পার্থক্য আছে। কারণ পাশ্চাত্য মনীষিগন ধর্মের যে সংজ্ঞা দিযেছেন তা ভারতীয সংজ্ঞার মত এত ব্যাপক নয। পাশ্চাত্য বাসীরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন তা প্রাচ্যেব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । পাশ্চাত্য মতে ধর্ম জীবনের বাইরের অঙ্গ, কিন্তু প্রাচ্য মতে তা জীবনের অবলম্বন। ধর্ম ছাড়া সমষ্টির কোন মূল্য নেই। বিবেকানন্দ ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটি প্রধান সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছেন। (১) মৌলতত্ত্বের সন্ধানও উপলব্ধি। (২) জড়ের উপর চেতনার আধিপত্য লাভ (৩) মানুষের অর্ন্তনিহিত দেবত্বের প্রকাশ। এই ত্রিসিদ্ধান্তের প্রথমটি অর্থাৎ মৌলতত্ত্বের সন্ধান ও উপলব্ধি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দার্শনিকেরা মৌল সৃষ্টি তত্ত্বকে ঈশ্বর, আল্লা, গড, ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ এই মৌলতত্ত্বের সন্ধানও উপলব্ধির পথে ধর্মীয় প্রমাণ ব্যবস্থা তথা সাধনার কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঃ

> ''বৈজ্ঞানিকেরা বস্তুর গভীরে ঢুকে অনু-পরমাণুর খোঁজ করে বস্তুটির গভীরতর সত্তাকে আবিষ্কার করেন। সাধারণ মানুষ যাকে 'কাঠ' বলে বৈজ্ঞানিকেরা তার গভীরে গিয়ে কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের কম্পাউণ্ডকে আবিষ্কার করেন। এখানে 'কাঠ' নিম্নতর সত্য কার্বন যৌগ উচ্চতর সত্য। মনোবিজ্ঞানী মানুষের বাহ্যিক আচরণ দেখেই তৃপ্ত নন, মনের গভীরে গিয়ে অবচেতন স্তরের মধ্যে তিনি মানুষটির গভীরতর সত্তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন উচ্চতর সত্যকে বোঝার জন্য। এভাবে বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে বাইরের রূপটাই শেষ সত্য নয়, বস্তুর গভীরে ঢুকতে হয় উচ্চতর সত্যকে জানার জন্য।''[২]

ঠিক এরকম কথাই বলেছিলেন বৈদিক ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে --

''হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।''[৩]

অর্থাৎ সোনালী আবরণ দিয়ে সত্য ঢাকা রয়েছে। এই উচ্চতম সত্যকে বা মৌলতত্ত্বকে জানার পথই হলো ধর্ম।

আমাদের প্রাচ্যদেশে ধর্মের দুটো ভাগ আছে যেমন ঃ (১) লোক ধর্ম ও (২) মার্গ ধর্ম।

লোক ধর্ম গড়ে ওঠে মানুষেব যৌথ প্রযাসে, আব মার্গ ধর্ম গড়ে ওঠে ব্যক্তি বিশেষ ও তাঁব বাণীকে কেন্দ্র কবে। লৌকিক ধর্ম সাধাবণ মানুষেব আশা-আকাঙ্খা ও ধ্যান ধাবণাব প্রতিমূর্ত্তি। যুগ যুগান্তব ধবে এই ধর্ম গড়ে উঠেছে লোকেব বিশ্বাস ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে আশ্রয কবে অশিক্ষিত অসহায গ্রামীন মানুষেব হাত ধবে। বাংলাদেশে এমন একটা সময ছিল যখন অন্ত্যজবা ব্রাহ্মন্য ধর্মেব অনুশাসনে উচ্চবর্ণেব পাশে স্থান পায নি, ববং পেযেছে ঘৃনা আব অবজ্ঞা। ফলে স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্য ধর্মেব প্রতি তাদেব একটা বিদ্বেষভাব জন্ম নিযেছে। খুবস্বাভাবিক ভাবেই তাবাও আশ্রয খুঁজছিল অন্য কোনো দেবদেবীব যাবা কিনা তাদেব অভয দেবেন। ধীবে ধীবে তাই তাবা নানান আবাধ্য দেব-দেবীব কল্পনা কবেছে। এবই ফল স্বরূপ সমাজে বিভিন্ন গৌণ ধর্মেব উদ্ভব হযেছে। অনেকেবই ধাবনা চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নব বৈষ্ণববাদ লোকধর্মেব প্রবর্তকদেব উৎসাহ যুগিযেছিল। তাব সেই স্বতঃস্ফুর্ত উচ্চাবণ 'চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হবিভক্তি পবাযণ', বাংলাব জাতীয জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি কবেছিলো। শুধু তাই নয মন্দিবে বা গৃহস্থেব ঘবে দেব মূর্তি স্থাপন কবে বৈদিক উচ্চাবণেব মাধ্যমে যে পূজা বিধি সমাজে প্রচলিত ছিল, তাতে ব্রহ্মণেবই একাধিপত্য ছিল। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মসাধনায বৈদিক মন্ত্রেব পবিবর্তে মুখ্য হযে উঠল হবিনাম সংকীর্তন। দলবদ্ধভাবে সবাই ভগবানেব নামগান কবতে কবতে নগব পবিক্রমা কবছে। সেখানে ধনী দবিদ্রেব ব্যবধান নেই, নেই জাত পাতেব বেড়াজাল। উচ্চনীচ নির্বিশেষে সবাই সেখানে সমানভাবে অংশ গ্রহণ কবছে। ফলে হবিনাম সংকীর্তনেব মাধ্যমে সমাজে সার্বিকভাবে একটা সংঘবদ্ধতা দেখা দিযেছিল। লোকধর্মেব প্রবর্তকেবাও এ থেকে প্রেবণা লাভ কবেছিলেন। শুধু চৈতন্য দেবেব আদর্শই নয, সুফিবা তাদেবকে দিযেছিল নতুন ভাবনাব সন্ধান, ইসলামধর্ম দিযেছিল মূর্তিবাদেব বিরুদ্ধ যুক্তি, আব ইহ জীবনেব বিফলতা বিষযে তাদেব ভিতবে ভিতবে কাজ কবেছিল বৌদ্ধ চিন্তাব বীজ। সব কিছুব সমন্বযে তাদেব কাছে মানুষই বড়হযে দেখা দিযেছিল। অসহায মানুষকে অন্যাযেব হাত থেকে বক্ষা কবা , ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে নিবৃত্ত কবা ও ভিন্ন ধর্মে আগ্রহ প্রকাশ কবা থেকে বিবত কবাও ছিল তাদেব মুখ্য উদ্দেশ্য। মনুেষে মানুষে ভেদাভেদ বর্জন কবে মানুষকেই সত্যতত্ত্ব জেনে তাব অন্বেষন, এটাই হলো লোকধর্মেব সবচেযে বড আস্থাব জাযগা। লোকধর্ম সর্ম্পকে আলোচনা কবতে গিযে সমালোচক বলেছেন ঃ-

''লোকধর্ম অভিজাত ধর্মেব পাশেপাশে গড়ে ওঠে। এব প্রাণবীজ থাকে লৌকিক জীবনে ও লোকাযত যাপনে। আমাদেব দেশে বেদ-ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্র অনুশাসিত যে অভিজাত ধর্ম তাব সমান্তবাল কিংবা প্রতিবাদে নানা যুগেই নানা লৌকিক ধর্ম গড়ে উঠেছে, যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম কিন্তু পবে তা আবাব অভিজাত ধর্মেব আকাব ও মান্যতা পেযেছে। বাংলায শ্রীচৈতন্যেব বৈষ্ণব ধর্মেব মধ্যে একটা বিদ্রোহ ও শাস্ত্রেব প্রবলতাকে কাটিযা ওঠাব চেষ্টা ছিল। তাঁব প্রযাণেব পব এই বৈষ্ণব ধর্মকে অবলম্বন কবে নানা লোকাযত গৌণ ধর্ম উৎসাবিত হযেছিল। শুধু সহজিযা বৈষ্ণব ধর্মেব প্রভাব নয তাব সঙ্গে হযতো খুঁজে পাওযা যাবে নাথপন্থেব সাধনা, পাওযা যাবে তন্ত্র ও যোগ, সুফি তত্ত্ব এবং আবও নানা লোকাযত সূত্র। সাধাবণভাবে আঠাবো শতকেই বাংলাব

লোকধর্মগুলি সূচিত হযেছিল। সহজিযা, কর্তাভজা, বাউল, ফকিবীমত, সাহেবধনী, বলবামী,খুশীবিশ্বাসী, লালনপন্থা ইত্যাদি নানা নামে আমাদেব বাংলাব লৌকিক ধর্মগুলিকে চিহ্নিত কবা হযেছে। খোঁজ কবলে দেখা যাবে পনেব শতকে দক্ষিণভাবত থেকে পশ্চিম মধ্যভাবতকে ছুঁযে উত্তবভাবতে যে ভক্তি আন্দোলন ব্যাপকতালাভ কবেছিল তাও এক ধবনেব লোকধর্ম। নানক, কবীব, সুবদাস, মীবাবাঈ, দাদু, বজ্জব ইত্যাদিব গানে লোকধর্মেব একটা উৎস খুঁজে পাওযা যায। লোকধর্মেব মধ্যে থাকে স্বচ্ছ মানবতাবোধ, নিম্নজীবনেব শিকডপুষ্ট যাব প্রাণবস, গানে গানে যা পবিমূর্ত। নাগবিক বেনেসাঁস এবং প্রতীচ্য প্রভাবেব বাইবে আমাদেব এই বাংলাদেশে প্রসাবিত জনসমাজে ধর্ম ধাবণাব একটি অন্তশ্চেতনাময শাস্ত্রবিবোধী উৎস আছে, মুক্ত ভাবনাব বাতাযন আছে, মানবিক বিশ্বাসেব ভিত আছে। লালন ফকিবেব মত অনেক সাধক ও গীতিকাব ছিলেন শাস্ত্র বিবোধী। অর্থাৎ ধর্মেব নামে কুহক, শাস্ত্রেব নামে পুবোহিত বা মোল্লাতন্ত্র, উপাসনাব নামে মন্দিব মসজিদকে বডকবে তোলা, ঈশ্ববেব নামে মূর্তিগঠন এইসব লৌকিক সাধকেব মনে ধবেনি। ধর্মেব ছলে নানা বাহ্য বিষয থেকে নিষ্ক্রমণেব একটা পথ তাঁবা সৃষ্টি কবেছিলেন লোকধর্মকে আশ্রয কবে।''[৪]

লৌকিক ধর্মেব স্বরূপ সন্ধানেব পব মঙ্গলকাব্য গুলোতে লৌকিক ধর্মেব প্রতিফলন বা প্রতিবিম্বন নিযে আলোচনা কবছি। মুসলমানদেব বাংলা বিজযেব পূর্বে বাঙালি সমাজ ধর্মেব দিক থেকে বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদাযে বিভক্ত ছিল। তাদেব মধ্যে বৌদ্ধ জৈন-বৈদিক-পৌবাণিক-নাথ-যোগি প্রভৃতি। কিন্তু মুসলমানদেব বাংলা বিজযেব পব এইসব উপাসক সম্প্রদাযকে তাবা একত্রে 'হিন্দু' নামে চিহ্নিত কবে। যদিও প্রত্যেক উপাসক গোষ্ঠীব মানুষেব চিন্তা চেতনা, বিশ্বাস-সংস্কাব, ও আচাব-আচবণে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র ছিল। তবু শাসক মুসলমানদেব কাছে তাদেব পবিচয ছিল 'হিন্দু' বলে। ঐতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদাব বলেছেনঃ-

''মুসলমানেবা ভাবত অধিকাব কবাব পব বিজিত ভাবতবাসীকে এই নামে অভিহিত কবে এবং এদেশেব অধিবাসীদেব সকলেবই ধর্মকে 'হিন্দু' এই সাধাবণ সংজ্ঞা দেয।''[৫]

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা আর্য-অনার্যেব বাস ভূমি ছিল। বাংলাব অনার্য অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রথমে অবৈদিক-জৈন-আজীবিক ও বৌদ্ধ এবং তাবপবে বৈদিক পৌবাণিক ধর্মেব অনুপ্রবেশ ঘটে। পববর্তি সমযে গুপ্ত, পাল ও সেন আমলে এইসব ধর্মেব সঙ্গে আর্যেতব ধর্মেব মিশ্রণ এবং নানরূপ আবর্তন-বিবর্তনেব ফলে সেন আমলে লোকজীবনেব উচ্চতম পর্য্যাযে পৌবাণিক ধর্ম আব নিম্নতম পর্য্যাযে অনার্য প্রভাবিত লৌকিক ধর্মেব চর্চা অব্যাহত থাকে কিন্তু তুর্কিদেব বাংলা বিজযেব পব অর্থাৎ বাংলায মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠাব পব ইসলাম ধর্মেব ব্যাপক প্রসাবেব মুখে হিন্দুব ধর্ম ও সমাজ চবম বিপর্যযেব মুখে পডে যায। সেই বিপর্যয থেকে পবিত্রাণ লাভেব আশায বাংলার উচ্চ নীচ নির্বিশেষে ঐক্য বদ্ধ হয। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত উচ্চবর্ণেব মানুষ যাবা সমাজেব সাধাবণ মানুষ থেকে নিজেদেব স্বতন্ত্র মনে কবতেন তাবাই নিম্নবর্ণেব মানুষেব হাতে হাত মিলিযেনেন ধর্ম রক্ষাব তাগিদে। ফলে নিম্নবর্ণেব আবাধ্য

দেবতারা অনায়াসেই স্থান করে নেন উচ্চবর্ণের দেবতার পাশে। উচ্চবর্ণের লোকেরাই নিম্নবর্ণের আরাধ্য মনসা-চণ্ডী-ধর্ম-শিব-শীতলা-ষষ্ঠী প্রভৃতি দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য রচনা করলেন। ফলে মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের লোকজীবনে লৌকিক দেবদেবীর জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়।

বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলিকে প্রভাব ও প্রাচুর্যের দিক থেকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ-

(১) **প্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ** এই পর্য্যায়ে পড়ছে মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্য।

(২) **মধ্যম স্তরের জনপ্রিয় মঙ্গল কাব্যঃ** এই পর্য্যায়ে পড়ছে কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও শিবায়ণকাব্য।

(৩) **গৌণ মঙ্গলকাব্য ঃ** এই শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যের দেবতারা একান্ত ভাবেই আঞ্চলিক। তাদের নিয়ে রচিত কাব্যের সংখ্যাও খুব বেশী নয়, এবং কাব্যগুণের দিক দিয়াও এগুলো ততটা উৎকৃষ্ঠ নয়। তবে এসকল কাব্যের আরাধ্য দেবতাদের কেউ কেউ সমগ্র দেশে পূজিত হতেন, আজও হয়ে থাকেন। শীতলা-ষষ্ঠীর মত দেবীরা ছোটখাট পাঁচালী জাতীয় কাব্যের আশ্রয় হয়ে থেকেছেন সত্য কিন্তু সমগ্র দেশের মানুষের ভক্তি-বিশ্বাস-ভয়-আরাধনা এদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এইসব দেবতারা মনুষের বাস্তব জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাজারো সমস্যা, তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার উদ্দেশ্যেই এদের পূজা করা হত। ভক্তির মাধ্যমে মুক্তি লাভ এদের কাঙ্ক্ষিত ছিল না। এ সর্ম্পকে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য ঃ

> "মানুষ রোগ থেকে বাঁচার জন্য, ধনজন লাভের জন্য, শিকারে, ব্যবসায়ে, কৃষিতে সাফল্য লাভের জন্য এমনকি রাজা হবার জন্য এইসব দেবদেবীর পূজা করেছে এবং এইসব প্রয়োজনের উৎসে উপযোগী দেবতার কল্পনাও করে নিয়েছে। আদিতে এক এক দেবতা এক এক ধরণের উপযোগিতা নিয়ে দেখা দিলেও ক্রমে নানা ধরণের প্রয়োজন নির্বাহের দায় দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছে।"[৬]

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সাধারণ পরিচয় এবং এরা ভক্তের মঙ্গলের জন্য যা যা করতে পারেন সেগুলোর সূত্রাকারে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

(১) **দেবী মনসা ঃ**

(ক) তিনি সর্পকূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

(খ) অনার্য সমাজ সম্ভূতা 'মঞ্চামা' থেকে তার উদ্ভব।

(গ) দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোনও পুরাণে তাঁর উল্লেখ নেই।

(ঘ)পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত কিংবা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাঁর উল্লেখ থাকলেও সেগুলি অর্বাচীন রচনা।

(ঙ) মনসা সর্পভয় দূর করেন।

(চ) তাঁর কথা মান্য না করলে তিনি সর্পাঘাতে মৃত্যুও আনেন।

(ছ) তিনি সন্তান হওয়ার বর দান করেন।

(জ) মৃতকে পুনর্জীবনও তিনি দান করেন।

(ঝ) তাঁকে তুষ্ট করলে বাণিজ্যে সাফল্য আসে, কিন্তু কোনভাবে তাঁকে অসম্মান করলে তিনি ধনে জনে নিঃশেষ করেন।

(২) **দেবীচণ্ডী** ঃ-

(ক) বীরহোড়দের মৃগয়ার দেবীহলেন চণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা।

(খ) চণ্ডী শব্দটির গঠন থেকে অনুমিত হয় দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা থেকে তা উদ্ভূত।

(গ) চণ্ডীমঙ্গলে যে দুটি কাহিনির উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তার প্রথমটিতে চণ্ডীকে পাই পশুদের রক্ষাকর্ত্রী রূপে ও দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ ধনপতি সদাগরের কাহিনিতে দেবী চণ্ডীকে পাই দুইভাবে - হারানো প্রাপ্তির দেবী রূপে ও কমলে কামিনী বা ঐন্দ্রজালিক বিভূতি সৃষ্টিকারিণীরূপে।

(ঘ) দেবী চণ্ডীর কৃপার উপরই শিকারে সাফল্য-অসাফাল্য নির্ভর করে।

(ঙ) তিনি ধনদাত্রীও। তাঁর কৃপায় ব্যাধ কালকেতু রাজা হয়েছে।

(চ) দেবী মনসার মত তিনিও সন্তান হবার বরদান করেন।

(৩) **ধর্মঠাকুর** ঃ-

(ক) ধর্মঠাকুর রাঢ় অঞ্চলের ডোমদের দেবতা।

(খ) তাঁর কোন মূর্ত্তি নেই, পাথরকেই দেবতা বলে পূজা করা হয়।

(গ) সু বৃষ্টির আনার জন্য ও মৃত বৎসার সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পূজা করা হয়।

(৪) **শিবঠাকুর** (শিবায়ণ) ঃ-

(ক) পুরাণের দেবাদিদেব মহাদেবের সাথে তাঁকে এক করে দেখার প্রচেষ্টা করলেও তিনি আসলে কৃষিজীবি মানুষের আরাধ্য দেবতা।

(খ) তিনি উর্বরা শক্তির দেবতাও।

এই সকল দেব দেবীর উৎস সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়গুলোতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এদের অনেকেই পূজা লাভের জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। এদের মধ্যে সর্বদাই একটা Revengeful attitude কাজ করে। মনসা মঙ্গলকাব্যের মনসার মধ্যে এর প্রভাব লক্ষণীয়। চাঁদ সদাগর তাঁর পূজা করতে সম্মত না হওয়ায় প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় চাঁদ সদাগরের জীবনে যে বিপর্যয়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন তা শুনলে সেই দেবী সম্পর্কে ভয়ের উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনুরূপ ভাবে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও দেখি যে দেবী চণ্ডীর ঘট পা দিয়ে ফেলে দেওয়ায় চণ্ডীও প্রতিষোধ নিয়েছিলেন। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা মনসা ও চণ্ডীর কৃপায় মুক্তি লাভ করেছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে মঙ্গল কাব্যের দেব দেবীর শক্তি প্রদর্শন করার পেছনে একটা উদ্দ্যেশ কাজ করেছে। তা হল তাঁদের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই দেবদেবীরা তাঁদের উদ্দ্যেশে অনেকটা সফল, কারণ মানুষ তাঁদের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তাঁদের প্রতি নতি স্বীকার না করলে বিপদ হতে

পারে।বস্তুত নিরাপদ জীবন যাপনের আকাঙ্খা থেকেই মানুষ তাদের আরাধনা করেছে। কারণ মধ্যযুগের অসহায় মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করত, যে কোন বিপদ থেকে পরিত্রান লাভ করতে পারে শুধু মাত্র দেবতার কৃপায়। প্রত্যেক দেবতার প্রকৃতি যেমন ভিন্ন,তেমনি ভিন্ন পদ্ধতিতেই সেবককে তারা অভয়দান করেন। মনসা সাপের দেবী, নাগমাতা। দেবসমাজে তিনি অপাঙক্তেয় কারণ তাঁর কোন মাতৃ পরিচয় নেই। শিব শতচেষ্টা করেও তাকে দেব সমাজে স্থান করে দিত পারেন নি। ফলে সাঁতালি পর্বতেই মনসা বাস করতে থাকেন। মনুষ্য সমাজে যেমন নগরের বাইরে অন্ত্যজদের বাস, মনসাকেও তেমনি নগরের বাইরে স্বতন্ত্র পল্লীতে ভগ্নী নেতাকে নিয়ে বাস করতে দেখাযায়, চর্যাপদে যেমন আছে নগরের বাইরে ডোম্বির কুড়েঘর । মনসা ও যেন ঠিক তেমনি। আর নেতা মন্ত্র-তন্ত্রে যতই দক্ষ হোক না কেন বর্ণ ও বৃত্তিতে সে রজক। এখানেও দেবী মনসার সাথে অন্ত্যজ সংস্পর্শ যেন আভাসিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মনুষ্য সমাজে দেবী মনসার পূজা সীমাবদ্ধছিল শুধুমাত্র জেলে ও কৃষকদের মধ্যে। পরে অবশ্য উচ্চবর্ণের মেয়ে মহলে তাঁর পূজার প্রচলন ঘটে। কিন্তু সমাজে যারা উপরের শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত তাদের কাছে মনসার দেবত্ত মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিলনা। চাঁদ সদাগর তাই প্রথমে মনসার পূজা করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু সমাজের উঁচু শ্রেণীতে যারা অধিষ্ঠিত তাঁরা মনসার পূজা না করলে তা সমাজে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য হবে না। ফলে চাঁদ সদাগরের কাছে তাঁর মর্যাদা লাভ হয়ে উঠে অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু শৈব চাঁদ সদাগর, শিবঠাকুর ছাড়া অন্য দেবী, বিশেষ করে লৌকিক দেবী মনসাকে কোন ভাবেই পূজো করতে রাজি নয়। ফলে উভয়ের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ-সংঘাত। চাঁদ সদাগর শিব ও ভবানীর উপাসক। তাই অনার্য স্তর থেকে আসা শক্তি দেবী মনসার সাথে এর কৌলিন্যগত পার্থক্য আছে। কিন্তু কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় যে নানা সংঘাতে বিপর্যস্ত চাঁদ সদাগর মনসার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন আর শিবের কন্যা রূপে মনসা আর্য দেব মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

দেবী চণ্ডীর উৎস নিয়ে পূর্বের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক নিহার রঞ্জন রায় বলেছেন যে তুর্কি বিজয়ের অনেক আগেথেকেই বাংলাদেশে শাক্ত ধর্ম খুব প্রবল ছিল। দেবী দুর্গা গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে 'অষ্টভুজা' 'দশভুজা' পূজিত ছিলেন। তার সাথে চণ্ডী নামটিও হয়ত জড়িয়ে পড়েছিল। কারণ তাঁকে যে চণ্ডী নামে অভিহিত করা হত তার নিদর্শনও আছে। কিন্তু তুর্কি বিজয়ের পরবর্তি সময়ে ধর্ম-দ্বন্দ ও মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় দেবী চণ্ডীর অনেক রূপান্তর ঘটেছে। এই দেবীর উৎস সম্পর্কে অনেকে অনেক রকম যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন, এবং তাদের যুক্তি যথেষ্ট বাস্তব সম্মত। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত দেবী চণ্ডীর উৎসে লৌকিক ধর্ম বিশ্বাস এবং মেয়েলি ব্রতকথা গভীরভাবে সক্রিয়। বাংলার লোকজীবনে বিশেষকরে মেয়ে মহলে দেবী চণ্ডীকে নিয়ে অনেক রকম ব্রত প্রচলিত ছিল। যেমন- ওলাইচণ্ডী, ঢোলাইচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, ঘোরচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, রুড়াইচণ্ডী প্রভৃতি। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' এই ব্রতকথা গুলোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।
তাই সমালোচক যথার্থই বলেছেন ঃ-

"চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে চণ্ডীকে পাচ্ছি তাকে এক কথায় বহুরূপী বলা চলে।" [১]

তবুও একথা বলা যাবে না যে মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীপুরাণে বর্ণিত অসুববিনাশিনী দেবী চণ্ডী থেকে এরা অভিন্ন।

ধর্মঠাকুব রাঢ বাংলাব লৌকিক দেবতা। তাব পূজা বাঢ বাংলাব একটি প্রচীন লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান। অনুমান করা হয যে তুর্কি বিজযের অনেক আগে থেকেই ধর্ম পূজা বাংলার লোক সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীব আগে ধর্মঠাকুবকে নিযে কোন লিখিত সাহিত্য বচিত হযনি। তবে তাঁকে নিযে অনেক কাহিনি মৌখিক গান বা পাঁচালি আকাবে সমাজে প্রচলিত ছিল। ধর্ম ঠাকুবকে নিযে বচিত পূজা বিধি বা মঙ্গল কাব্য যা ই লিখিত আকাবে সমাজে প্রচলিত ছিল, সে সবগুলোই চৈতন্যদেবের আর্বিভাবেব পব বচিত। ধর্ম ঠাকুরকে নিযে অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ কবেছেন। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশ চন্দ্রসেনের মতে ধর্ম হলেন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা', কিন্তু সুকুমার সেন, নীহার রঞ্জন রায, আশুতোষ ভট্টচার্য মহাশযেরা ধর্ম ঠাকুব কে বৌদ্ধ দেবতা বলে স্বীকার কবতে পারেন নি। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে কবেন ঃ-

> ''অতি প্রচীন কাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গেব অন্তর্গত বাঢ বলিযা পবিচিত অঞ্চলে ডোম নামক জাতি সুসংহত সমাজবদ্ধ হইযা বাস কবিত। তাহাবা এক অতি প্রচীন পদ্ধতিতে সূর্যদেবতাব উপাসনা কবিত, তাহাদেব মতে সূর্যদেবতা শ্বেতবর্ণ বলিযা পবিকল্পিত হইত এবং সেই দেবতাকে তাহাবা শ্বেতবর্ণেব পশু বলি দিযা তুষ্ট কবিত। ইনি তাহাদেব সর্বোত্তম দেবতা (Supreme God) ছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপন্ কবিযা সেই দেবতাব মধ্যে নিজেদেব ধর্মেব কিছু কিছু উপাদান মিশ্রিত কবিযা দিযা তাঁহাকে নিজেদেব বলিযা গ্রহণ কবিলেন। তাহাদেব পবিকল্পনায এই দেবতাব মৌলিক আদিম উপাদান গুলি সম্পূর্ণ পবিত্যক্ত হইল না। এই ভাবে ডোম জাতিব সর্বোত্তম দেবতা সূর্য, বৌদ্ধ নিবঞ্জন ও হিন্দু বিষ্ণুব সঙ্গে অভিন্ন বলিযা কল্পিত হইলেন।''[৮]

এছাড়াও বিভিন্ন দেবতার সাথে ধর্ম ঠাকুরকে এক করে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায ধর্মমঙ্গল কাব্যে। ধর্ম পূজায় কোন মূর্তি নেই। একখণ্ড পাথরকে ধর্মদেবতার কল্পনায পূজা করা হয। এর থেকে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে আদিম প্রস্তর উপাসনার সাথে ধর্মপূজা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ধর্মঠাকুরকে মৃতবৎসার সন্তানদাতা হিসেবেও কল্পনা করা হয়েছে। কাব্যে রঞ্জাবতী তাঁর কৃপায়ই পুত্রলাভ করেছেন। এর থেকে আদিম প্রজনন শক্তি র পূজার সাথেও ধর্ম পূজাকে এক করে দেখার প্রবনতা লক্ষ করা যায। ধর্ম ঠাকুর গ্রাম্য দেবতা। তার পূজা মূলত গ্রামেই হয়ে থাকে। তাই মনে হয যে তার পূজার কল্পনার সাথে নানা গ্রাম দেবতাও মিশে গেছেন। তুর্কি বিজয়ের অনেক আগে থেকেই বাংলায ডোমসৈন্য দের বিজয় গৌরব ইতিহাস ছিল। পরবর্তি সময়ে লোকের মুখেমুখে তাদের এই বীরত্বের ইতিহাস প্রচারিত হয়েছিল। একটি ছড়ায় আছে - 'আগডোম, বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।'এখানে ডোম বীরদের রনসজ্জার কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও দেখি যে লাউসেনের যুদ্ধ পালায় তার পক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল সেনাপতিরা ছিলেন তারা জাতিতে ডোম। তাই অনেকে কল্পনা করেছেন যে ধর্ম ঠাকুরের কল্পনার পিছনে ডোমদের

কোন রণদেবতার ইঙ্গিত থাকা অস্বাভাবিক নয়। ধর্মঠাকুরকে নিয়ে এতসব মিশ্রণ সত্ত্বেও তিনি মনসা- চণ্ডীদের মতো পৌরাণিক দেবতা বলে গৃহীত হননি। আর তাঁর পূজাও রাঢ় বাংলার বাইরে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। কোথাও কোথাও ধর্মঠাকুর যদিবা বিষ্ণুর সাথে মিলে মিশে এক হয়েছেন, সেখানে তাঁর পূজক কিন্তু ডোম নয়, ব্রাহ্মন। ডোম ছাড়া ধর্ম ঠাকুরের পূজকদের মধ্যে কৈবর্ত, শুঁড়ি, বাগদি ও ধোপার নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্ম ঠাকুরের পূজা বৈদিক ব্রাহ্মন্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ধর্ম পূজার পুরোহিতরা তাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখেন একটি পাদুকা বা পদুকার মালা যা ধর্মঠাকুরের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। পূজার উপকরণে আছে প্রচুর পিঠেপুলি আর মদ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

''মদ্যেব পুষ্করিনী দেব পিষ্টের জাঙ্গাল।''[৯]

ধর্ম ঠাকুরের পূজা মন্দিরে হয় না, হয় 'থানে' বা মণ্ডপে'। মধ্যযুগে বাংলাদেশে একরকম অনেক মণ্ডপ ছিল। যেখানে ধর্ম কর্ম থেকে শুরু করে গ্রামীন সভা সমিতিও অনুষ্ঠিত হতো। মধ্যযুগ পেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরেও বাংলার সমাজে এই মণ্ডপ বা 'থান' গুলোর প্রচলন ছিল। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায রচিত 'গনদেবতা' উপন্যাসেও এরকম মণ্ডপের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের কোন মূর্ত্তি নেই। কিন্তু কোন কোন কবির রচনায ধর্মঠাকুরের মূর্ত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন ঃ-

''ধবল অঙ্গের জুতি ধবল আসনে স্থিতি
ধবল বরনে বাড়ী ঘর।
ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনিলোভা
আলী স্কৈল পরম সুন্দব।''[১০]

সে যাইহোক মূলতযে পাথরকে ধর্ম ঠাকুর রূপে পূজা করা হয় তার উপরে 'পাদুকা চিহ্ন' আঁকা থাকে। অনেকেরই মতে এটি অনার্য পরিচয়বাহী। তাছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যে কানাড়া লাউসেন দ্বন্দের ক্ষেত্রে শিব ও ধর্মকে এক করে ফেলা হয়েছে।শুধু তাই নয় শিবের গাজনের মত ধর্মেরও গাজন গাওয়া হয়। সুতরাং আলোচনার শেষে এটুকু বলা যায় যে মনসা- চণ্ডীর মত পৌরানিক অভিধা না পেলেও ধর্মঠাকুর কখনো সূর্য, কখনো বিষ্ণু আবার কখনো শিবঠাকুরের সাঁথে মিলে মিশে বাঙালির ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে এক অভিনব স্থান লাভ করেছেন।

শিব মূলত বৈদিক দেবতা। সেখানে তিনি শিব ও রুদ্র এই দুই নামেই পরিচিত। শিব রূপে তিনি রক্ষক আর রুদ্র রূপে সংহারক। এই রূপে তিনি সৃষ্টিতে মুহূর্তের মধ্যেই প্রলয় করাতে পারেন। পরবর্তি সময়ে আর্য- অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে এই শিবের নানা রূপ প্রকাশ পায়। বৈদিক রুদ্র দেবতার সাথে অনার্য সংস্কারজাত নানা দেবতার বৈশিষ্ট্য মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। সমালোচক তাই বলেছেনঃ-

''বৈদিক রুদ্র প্রচণ্ড প্রলয় শক্তির দেবতা। তবে দেবমণ্ডলীর মধ্যে তার স্থান যে সর্বাগ্রে ছিল এমন নয়। পৌরানিক দেব পরিমণ্ডলের তিনি শান্ত হয়েছেন, কখনো প্রলয়ড নৃত্যে পটরাজ রূপে কল্পিত হলেও তিনি যোগ কল্পে সন্তুষ্ট আশুতোষ। শিবরূপে ভক্তদের কাছে পূজিত হয়েছেন। তাঁর ধ্যানমগ্ন রূপের পরিকল্পনা খুব প্রচীন। শিব-পার্ব্বতীর

যুগ্মরূপ যেমন অতিপ্রচীন কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে তেমনি ধ্যাননিরত যোগী মূর্তিও অতীত কাল থেকে প্রস্তর উৎকীর্ণ প্রতিমা রূপে মরে পূজিত হয়েছে। এই ধ্যান স্তব্ধ মূর্তিটি ধ্যানী বুদ্ধের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল বলে অনেক পুরা তাত্ত্বিক পণ্ডিত মনে করেন।''[১১]

এছাড়াও রামায়ন মহাভারতের মত পুরাণ গুলিতেও শিব সু-প্রতিষ্ঠিত। শিবপুরাণ, শাক্ত পুরাণেও শিবের মহিমা প্রচারক অনেক কাহিনি পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' কাব্যে যোগী শিব ও গৃহস্থের আদর্শ দেবতা পার্বতীর সাথে যুগনদ্ধ শিবের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার মহিমা উচ্চকোটিতে বিশেষভাবে স্বীকৃত। এছাড়া অন্যান্য পুরাণ গুলিতে শিবের যে মহিমা কীর্তিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে আর্য দেবমন্ডলীর শীর্ষে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাথেই শিবের অবস্থান। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে শিবচরিত্রের মধ্যে কতকগুলি অনার্য অন্ত্যজ স্তরের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ঃ-

১) শিব শ্মশান বাসী।

২) তাঁর সর্বাঙ্গ ভস্মে আচ্ছাদিত।

৩) সাপ তাঁর ভূষণ।

৪) বাঘছাল তাঁর পরিধেয়।

৫) ভূত প্রেত তার নিত্য সঙ্গী,যাদের সাহায্যে তিনি দক্ষ যজ্ঞ নষ্ট করেছেন।

৬) তিনি প্রচণ্ড কামুক। ঋষিবধূদের তিনি প্রলুব্ধ করেন। শুধু তাই নয় কখনো কখনো তিনি নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু এর পাশাপাশি বিরুদ্ধ যুক্তিও উপস্থাপিত করা হয়েছে। যেমন ঃ-

১) শিব সর্বত্যাগী বলেই শ্মশানবাসী।

২) মহাপ্রলয়ের দেবতা বলেই তিনি ভুতনাথ।

৩) তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর নগ্নতা ও কামাচারে কোন দোষ নেই।

এই সব ব্যখ্যা থেকেই প্রমানিত হয় যে শুধুমাত্র আর্য উৎস নয়, এছাড়াও অন্য নানা উৎস থেকে শিব আর্যমণ্ডলীতে স্থান করে নিয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য পাহাড় পুরের ফলকে থাকা শৈব ধর্মের নানা চিহ্নের কথা বলেছেন। কিন্তু শিব পূজা প্রসার লাভ করেছে তুর্কি বিজয়ের পরবর্তি সময়ে। এই সময় শিবকে নিয়ে লিখিত বিভিন্ন কাব্যে শিবকে পাওয়া যায় বিভিন্ন রূপে। সেই সকল সাহিত্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য, নাথ সাহিত্য ও শাক্ত গীতিকাগুলি প্রধান। মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পৌরাণিক ও লোকিক শিবের মিশ্রণ লক্ষনীয়। যা পূর্বের অধ্যায় গুলোতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 'শিবায়ণ' কাব্যে শিবের পৌরাণিক রূপ খুঁজে পাওয়া যায়না। এখানে তিনি ভাগচাষী, তাই সরাসরি কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। ফলে এই শিব দরিদ্রও বটে।

নাথ সাহিত্যের দুটি কাহিনি 'গোরক্ষ বিজয়' ও 'গোপীচন্দ্রের গানে' শিবকে পাওয়া যায় ভিন্ন রূপে। এখানে তিনি যোগীদের কায়া সাধনের মাহাত্ম্য এবং বিন্দুধারনের তত্ত্ব তথা নারী সংসর্গ ত্যাগের বিমুখতার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি আদি নাথ, অর্থাৎ

নাথদের আদিগুরু এই নাথ পন্থীদের চূড়ান্ত লক্ষ হলো শিবত্ব প্রাপ্তি। তাদের মতে শিবত্ব হলো সবধরনের বিকারবিহীন ক্ষয়হীন অমরত্বের আদর্শায়িত একটা কাল্পনিক রূপ। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন -

"বিবিধ লৌকিক ও আঞ্চলিক মানবিক বৈশিষ্ট্যে এবং বিভিন্ন কৌম সমাজে প্রচলিত লৌকিক আচার আচরনের তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের পূঞ্জীভূত বিগ্রহ এই শিব পৌরাণিক যুগে দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে আর্য দেব মণ্ডলীতে নিজের স্থান করে নিয়েছিল।"[১২]

শিব উপসনার সাথে দ্রবিড়দের লিঙ্গ পূজার মিল রয়েছে। এই লিঙ্গপূজা আসলে প্রজনন শক্তির পূজা, ভারতের পৌরানিকযুগের কোন একটা স্তরে এই লিঙ্গ পূজা শিবপূজার সাথে সম্পৃক্ত হয়। বিষ্ণুকে যেমন শালগ্রাম শিলার মাধ্যমে পূজা করাহয়। শিবকেও তেমনি লিঙ্গ প্রতীকে পূজা করা হয়। বিষ্ণু যেমন শাল গ্রাম শিলারূপে 'অখণ্ড মণ্ডলা কারাং' - অসীমের দ্যোতনা আনেন শিবও তেমনি লিঙ্গ প্রতীকে জনবৃদ্ধির সাথে সাথে যাবতীয় মানবিক ও সামাজিক প্রয়োজন বহুগুণিত করার প্রতীক রূপে গৃহীত হয়ে থাকেন। কথিত আছে শিব পর্বতী নরনারীর যুগ্ম রূপের আদি প্রতিমা। তাই যোনি পৃষ্ঠে প্রবিষ্ট লিঙ্গের পূজা শিব-পার্বতীর যুগ্ম রূপের প্রতীক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত।

বাংলাদেশে শিবপূজার প্রচার তুর্কি বিজয়ের অনেক আগেই হয়েছিল। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে গৌড় রাজ শশাঙ্কের প্রচলিত মুদ্রায় মহাদেব এবং নন্দী বা বৃষের প্রতিচ্ছবি ছিল। আদর্শায়িত একটা কাল্পনিক রূপ। এযেন অনেকটা মহাযনী বৌদ্ধদের বুদ্ধত্ব লাভের মতই। এছাড়া শাক্তপদাবলীর বিভিন্ন গানে ও সমাজে প্রচলিত শিব বিষয়ক বিভিন্ন মৌখিক গাল গল্প ও ছড়াতে ও শিবের উপস্থিতি লক্ষ করার মত । এই সবকিছুর সমন্বয়েই শিবকে নিয়ে বংলায় এক স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। মঙ্গল দেবদেবীর পূজার্চনার নিয়ম কানুনও বাঙালি পুরোহিত তন্ত্রের মতই। পুরোহিতরা অনার্য দেবদেবীর ক্ষেত্রে একটি ব্রাহ্মণ্যরীতির প্রলেপ দিয়ে দেন। যার ফলে তাদের পূজার জন্য সংস্কৃত মন্ত্রও সৃষ্টি করে নেওয়া হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের পাশাপাশি তাদের পূজারও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শুরুতেই আদি পুরুষ ব্রহ্মার বন্দনা, গণেশের মহিমা কীর্ত্তন, সরস্বতীর মহিমা প্রকাশ ,আদ্যাশক্তি লক্ষী প্রভৃতি দেবতার সাথে চৈতন্য বন্দনাও স্থান পেয়েছে। বিজয়গুপ্ত তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে নানা পৌরাণিক দেবদেবী ও তাদের বাহনের বন্দনা করেছেন।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এভাবেই পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ ও বিবরণ কাব্য মধ্যে স্থান করে নিয়েছে । তাছাড়া বহু কাব্যে 'চৌতিশা' স্তব যুক্ত হয়েছে। আর তাতে আরাধ্য দেবতার স্তোত্র থাকছে 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত অক্ষর মিলিয়ে। আর কবিরা বিভিন্ন সুযোগে কাব্য মধ্যে ভক্তিভাবমূলক নানা বর্ণনা তুলে ধরেছেন। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে উদ্ধৃত একটি বিবরণ থেকে মনসার স্তব ঃ

"নমস্তে আস্তিক মাতা তক্ষকের জননী।
নমস্তে ব্রাহ্মণী দেবী জরৎকারু রমণী।।

নমস্তে বিষহবী সর্ব্ব দুঃখ নাশিনী।
নমস্তে জগতমাতা ভবভয় নাশিনী।।''[১৩]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উদ্ধৃত দেবী চণ্ডীব স্তব ঃ

''ত্রিগুনা ত্রিবীজা তাবা ত্রৈলোক্য-তাবিনী।
ত্রিশক্তি রূপিণী তুমি কুবঙ্গ নযনী।।
ত্ববিতে তাবিযা তোল তাপিত তনয।
তোমাবিনে ত্রাণকর্ত্তা আব কেহ নয।।''[১৪]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে উদ্ধৃত ধর্মঠাকুবেব স্তব ঃ

''ওঁ শ্বেতবর্ণ শ্বেতমালাং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকং
শ্বেতামনং শ্বেতরূপং নিবঞ্জন নমোস্ততে।।''[১৫]

তাই সমালোচক যথার্থই

''এভাবেই মঙ্গলকাব্যগুলি হিন্দু ধর্মীয সর্বজন গ্রাহ্য একটি বিশ্বাস ও আচাবেব বাতাববণ তৈবী কবেছে। বাঙালীব সমকালীন জীবনেব প্রতিফলন যেমন সেখানে ঘটেছে তেমনি এই বিপুল বিস্তৃত মঙ্গল নামে আখ্যাত সাহিত্য কর্মগুলি বাঙালীব নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাসকে সুনিদৃষ্ট আকাব দিতে সাহায্য কবেছে।''[১৬]

উপসংহার

বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলো এমন এক সময় রচিত হযেছিলো,যখন বাংলার জাতীয় জীবনে চলছিলো হাজার সমস্যা। একদিকে তুর্কি বিজযের ফলে সৃষ্ট হওযা বিশৃঙ্খলা যা বাঙালি জীবনের ভিতটাকেই নাড়িয়ে দিযেছিল। ধর্ম-জাত-প্রাণ-শিল্পকলা সবকিছুতে দেখা দিয়েছিলো সংকটের ঘনঘটা। তুর্কিরা হিন্দুদের মন্দির, বৌদ্ধদের বৌদ্ধবিহার ভেঙে যেমন মসজিদ তৈরী করছিল তেমনিভাবে মানুষকে ধরে ধরে ধর্মান্তরিতকরণও চলছিল। ফলে দিশেহারা বাঙালি আত্মরক্ষার জন্য পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল আর অন্যদিকে ছিল বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের হাজার সমস্যা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা। এই দুয়ের টানাপোড়েনে বাঙালি সমাজের উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ হওযার প্রযোজনীয়তা বোধ করেন। বলাবাহুল্য যে বাঙালি সমাজে তখন জাতপাতের প্রবল সমস্যা ছিল। তুর্কি আক্রমনের পূর্বে সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায সমাজে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য ছিল। এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্ণধাররা সাধারণ মানুষদের কাছে টানার চেষ্টা করেননি। অপরদিকে সমাজের অন্ত্যজরাও ব্রাহ্মণদের কাছে আসেনি, আসতে চাইলেও ব্রাহ্মণদের প্রতাপে তা হয়ে উঠেনি। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্কি আক্রমণ সেই শূণ্যতাকে অনেকটা ভরিয়ে দিয়েছিল। ফলে সমাজের দুই মেরুতে যাদের অবস্থান ছিল তারা ক্রমশ কাছে আসার চিন্তাধারা শুরুকরে। কিন্তু খুব সহজে তা হয়ে উঠার নয়। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের দেবতার মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করা হয়। আর এই সম্পর্কের কারনেই লৌকিক স্তর থেকে উঠে আসা দেব দেবীরা আর্য আভিজাত্য লাভ করলেন। পরে এই সকল দেবদেবীর আদেশেই তাদের মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য লিখা শুর হয়। আর সমাজের উচ্চ নীচ নির্বিশেষে এই সকল দেব দেবীর কাছে আত্মসমর্পন করে। যদিও উচ্চ সমাজে তারা খুব সহজে গ্রহনযোগ্য হতে পারেননি। তারজন্য তাদেরকে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়েছে। অবশেষে উচ্চ সমাজ তাদেরকে দেবতা বলে স্বীকার করেছে, অবশ্যই অনেকটা বাধ্য হয়ে। এই সকল দেবতারা তাদের পূজা প্রচারের জন্য এক একজন যোগ্য প্রচারককে বেছে নিয়েছেন। যারা সাধারণ মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও মূলত তারা শাপভ্রষ্ট দেবতা। তাই দেবতার মাহাত্ম্য তাদের মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে কোন ধরনের অঘটন তাদের পক্ষে ঘটান খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। ফলে এরা কখনই খল চরিত্র হয়ে ওঠেনি। তাই উষা- অনিরুদ্ধ, নীলাম্বর - ছায়া, নলকুবেররা সমাজের যে স্তরেই অবস্থান করুকনাকেন কোন পাপ কার্যে তারা লিপ্ত হয়নি।

ক্রমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার জন্যও তারা এদের শরণ নিয়েছেন। রোগমুক্তি, ধনলাভ, সন্তানাকাঙ্ক্ষা, কৃষিতে সাফল্য সবকিছুর জন্যই তারা এইসব দেবতার শরণাপন্ন হয়েছেন। আর এইসব দেবতারা তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভের জন্য বরদান করেছেন।

আমাদের এই অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই সকল সাধারন মানুষের রীতি-নীতি, আচার - আচরণ, প্রথা- পদ্ধতি, উৎসব- অনুষ্ঠান, বিশ্বাস - সংস্কার নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কারণ মঙ্গলকাব্য এমন একটি সাহিত্যধারা যার মধ্যে বাঙালি জীবনের খুঁটিনাটি পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দর্পনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যেভাবে নিজেদের অবয়ব দর্শন করি, ঠিক তেমনিভাবে মঙ্গলকাব্যেও মধ্যযুগের বাংলাদেশের লোকজীবনের সজীব রূপটি ধরাপড়ে। যদিও মঙ্গলকাব্য দেব মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। দেবতাই এখানে মুখ্য। তবুও এই দেব চরিত্রগুলোকে আবর্তন করে তাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য মানুষ চরিত্র। দেব মাহাত্ম্য প্রচার করতে হবে এদের কাছে। মঙ্গল কাব্যে প্রতিবিম্বিত এই যে সমাজ তা কোন নাগরিক সমাজ নয়, অক্ষর পরিচয় হীন গ্রামীন সমাজ। এই সহজ সরল লোকমানসের সংস্কার, আচার- ব্যবহার, কৃষ্টি সব নিয়ে মঙ্গলকাব্যের বেশীরভাগ চরিত্রই হয়ে উঠেছে একেবারে লৌকিক। মনসামঙ্গল কাব্যের ঝালু - মালুর পাশে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু - ফুল্লরা, ধর্মমঙ্গল কাব্যের কালু- লখা শিবায়ন কাব্যের ভীম চরিত্র তাই একেবারেই বেমানান নয়।

প্রতিটি মঙ্গল কাব্যের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, ও উৎস গত দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দেবীমনসা নাগমাতা, তাই তার সাথে সাপের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। সুতরাং তার সাথে মানুষের ভয় - ভীতি জড়িয়ে আছে। জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরেই তিনি উপেক্ষিতা, দেবসমাজে দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাকে মনুষ্য সমাজের উচ্চবর্ণের পূজা লাভ করতে হবে। কিন্তু তা ছিল খুব কঠিন। কারন উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিল শিবের উপাসক। তারা অনার্য দেবতা মনসাকে সহজে দেবতা বলে মেনে নেবেনা। মনসা তাই প্রথমে রাখাল, জেলে, কৃষকদের কাছ থেকে পূজা আদায় করেন। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের পূজা আদায় করতে মনসাকে কষ্ট পেতে হয়নি, কারণ গ্রাম জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে সর্প ভয় বিরাজ করে। সেই ভয় থেকে মুক্তি লাভের জন্য দুর্বলচিত্ত অন্ত্যজ মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দৈববিশ্বাসকে আশ্রয় করে বাঁচতে চায়। শুধু সর্পভয় থেকে মুক্তিলাভই নয় মনসার কৃপায় তারা দারিদ্র্যকেও অতিক্রম করতে পেরেছে। মনসার পরবর্তি পদক্ষেপ সমাজের উচ্চবর্গের পূজা লাভ ফলে স্বাভাবিক ভাবে চাঁদসদাগরের কাছেই মনসা কে আসতে হয়েছে। কারণ ধনে মানে চাঁদসদাগর তখন সমাজে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। চাঁদ যদি মনসার পূজো করে তাহলে মনসা অতিসহজেই সমাজের সকলের আরাধ্যা হতে পারবেন। কিন্তু এখানে অর্থাৎ চাঁদসদাগরের কাছে এতসহজে মনসার প্রতিষ্ঠা লাভ

সম্ভব নয় কারণ চাঁদের সর্প ভয় নেই তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী। তাই সাপরা তাঁকে ভয় পায়। আর তিনি দরিদ্রও নন। তাই মনসাকে ছল-চাতুরী করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে হয়েছে। তাঁর সাত ছেলেকে ছলনার আশ্রয় নিয়ে হত্যা করেছেন মনসা। শুধু তা ই নয়, বাণিজ্যতরী'সপ্তডিঙা মধুকর' সাগরের অতল তলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এমনি ভাবে চাঁদসদাগরকে চাপে ফেলেও পূজা আদায় করিতে পারেননি মনসা। অবশেষে বেহুলার মাধ্যমে চাঁদের হারানো সবকিছু ফিরিয়ে দিলে বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগর মনসার পূজো করেছেন।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র দেবী চণ্ডী আর্য-অনার্য দেবতার সম্মিলিত রূপেই কাব্যে উপস্থিত। মনসার মত উচ্চবর্গের পূজা আদায়ে তাঁকে ততটা কষ্ট করতে হয়নি। 'আখেটিক খণ্ডে' তিনি পশুর দেবতা। তাই কালকেতু ফুল্লরা দেবীর কৃপায় তাদের সমাজে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। দেবীর কৃপায় একজন সাধারণ মানুষের রাজা হয়ে ওঠার কাহিনিই এখানে বলা হয়েছে। 'বণিক খণ্ডে' র সাথে 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের কাহিনিগত দিক দিয়ে কিছু সাদৃশ্য আছে। 'মনসামঙ্গল কাব্যে' চাঁদ সদাগর পদাঘাতে দেবীর ঘট ফেলে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। পরিণামে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'ও ধনপতি সদাগর পা দিযে দেবীর ঘট ফেলে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। পরিণামে তাঁকেও অকুল সমুদ্রে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। 'মনসা মঙ্গলের' মতো ধনপতিকেও অবশেষে দেবী কৃপা করে হারানো সব কিছুই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠা লাভের পর।

ধর্মঠাকুর অনার্যদের দেবতা। তাঁর পূজাপদ্ধতির মধ্যে অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। ধর্মঠাকুরের পূজোর জন্য সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকলেও সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকরাই তাঁর প্রকৃত পূজক। তাকে কখনো বিষ্ণু কখনো শিব আবার কখনো সূর্যদেবতার সাথে এক করে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদেব মধ্যে। ধর্মঠাকুরকে এদের সাথে এক করে দেখলেও মনসা-চণ্ডী শিবদের মত তিনি পৌরাণিক আভিজাত্য লাভ করতে পারেননি। আর তাঁর পূজাও রাঢ় বাংলার বাইরে খুব একটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। তিনি একান্তই ডোমদের দেবতা। তারা তাদের একান্ত নিজস্ব চিন্তা-চেতনা দিয়েই ধর্মঠাকুরকে সৃষ্টি করেছে। তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে তাদের কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

'শিবায়ণকাব্যে'র আরাধ্য দেবতা শিবও অনার্য দেবতা। এই কাব্যের কাহিনি গ্রন্থন অন্যান্য মঙ্গল কাব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শিব গৌরীর গার্হস্থ জীবন দারিদ্র্য, শিবের ভিক্ষাবৃত্তি, চাষাবাদ, চণ্ডীর বাগ্‌দিনী হয়ে শিবের সাথে ছলনা এসব কিছুর মধ্য দিয়ে সেই সময়ের সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলের মতো কোন প্রচারকের মাধ্যমে তার পূজা প্রচার হয়নি। কারণ তাদের মত দেবতা হয়ে তিনি থাকেননি। নিজেই কৃষক হয়ে হাল-বলদ নিয়ে চাষের কাজে নেমে পড়েছেন।

এইভাবে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে লক্ষ করা যায় স্বর্গলোকের দেবতারা যেন মর্ত্যলোকের মানব জীবনের সাথে পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ। মর্ত্যলোকের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য-বেদনার সাথে তারা একাত্ম হয়ে গেছেন। আর কবিরা তাঁদের কলমের ছোঁয়ায়, তাঁদের সদাজাগ্রত পর্যবেক্ষন শক্তি ও বাস্তববোধে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র দিক দেবতার মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমাদের অভিসন্দর্ভে সমাজের সেই দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।